তানসেন-বীরবলী-কথা

রমা সেন

শ্রীপ্রকাশ ভবন
৬৯ সূর্য্যসেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
রাসপূর্ণিমা,
নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক ঃ
চিত্তজিৎ দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ
মনোজ বিশ্বাস

মুদ্রণে ঃ
সুভাষ সরকার
অরোরা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় দাদাভাই-কে (শ্রীঅরুণ চৌধুরী)

আমার কথা

সঙ্গীত সম্রাট 'তানসেন' ও 'রঙ্গরাজ 'বীরবল' নামে একদা সম্রাট আকবরের দরবার যে দুইটি রত্ন বিশেষভাবে আলোকিত করেছিল, আজ সেই অমর দু'টি প্রতিভা নিয়েই আমার এ কাহিনী। এঁদের জীবনকথা সংগ্রহ করতে গিয়ে যে গ্রন্থগুলি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে সেগুলো হল :

ভারতীয় সঙ্গীতের কথা (প্রভাতকুমার গোস্বামী)
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস (বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী),
অমর চিত্রকথায় তানসেন বীরবলের কাহিনী
শতজীবনী (চণ্ডীচরণ-বসাক), বীরবলের রসরঙ্গ (প্রবোধকুমার সান্যাল)
ইতিহাসের ইতিহাস (গোলাম আহমাদ মোর্ত্তজা) প্রভৃতি।

এই সকল গ্রন্থের লেখকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কাহিনী শুরু করছি।

—রমা সেন

সঙ্গীত সম্রাট তানসেন

গোয়ালিয়রের কাছে বিরাট শহরে মুকুন্দরাম মিশ্রের বাড়ীতে আজ বিরাট উৎসব। সুদীর্ঘকাল পরে তাঁদের ঘরে যে সন্তান এসেছে, তার আজ এক বৎসর পূর্ণ হল। তাও কন্যাসন্তান নয়, পুত্র সন্তান। সেই সন্তানের আগমনকে কেন্দ্র করে আজ বাড়ীতে এ উৎসবের আয়োজন।

অন্দর মহলেও যেন আনন্দের জোয়ার লেগেছে। মুকুন্দরামের বোন প্রভাবতী যেন সমস্ত আসরটি একেবারে মাতিয়ে রেখেছে। তার কত আনন্দ। এতকাল বাদে সে তার বৌদির মুখে হাসি দেখতে পাবে। দাদা পুরুষমানুষ, তারপর গানবাজনা নিয়ে দিনরাত মগ্ন থাকেন। কত জায়গায়, কত আসরে তাঁকে গাইতে যেতে হয়। বেচারী বৌদি শুধু নীরবে চোখের জল ফেলেন। দাদার অবস্থা মোটামুটি ভালই। কিছু জমি আছে। আছে কিছু গাই-গরু, সেসব দেখাশোনার জন্য লোকও নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু সবই তাঁর কাছে শূন্য মনে হয়। সেই দাদা-বৌদির কোল আলো করে এসেছে এ-শিশু। রূপ যেন ফেটে পড়ছে।

—আমি কিন্তু এর নাম দিলাম রামতনু। দোলায় দোল দিতে দিতে বলে প্রভা। এ উৎসবে যোগ দেবার জন্য স্বামী রামদাগরকে নিয়ে তিনদিন আগেই চলে এসেছে সে এখানে। নইলে সব দিক দাদা-বৌদি সামলাবেন কি করে?

দেরাজ থেকে টাকা বার করছিলেন মিশ্র-পত্নী প্রিয়া। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মুকুন্দরাম। টাকার ব্যাপারেই এ সময় অন্দর মহলে এসেছিলেন তিনি।

ননদের নামকরণ শুনে হাসি হাসি মুখে বলেন—নামটা সত্যি সুন্দর। কিন্তু এতবড় নাম ধরে ডাকব কেমন করে? তাই ওকে ডাকব তান্না বলে।

—আমি কিন্তু ওর নাম দিলাম 'তানসেন'। অ-নে-ক দিন ধরেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম পুত্র সন্তান হলে এ নাম রাখব।

—সত্যি কিন্তু বড় সুন্দর নাম। সমবেত মহিলারা বলে ওঠেন একসঙ্গে।

—সে কথা অস্বীকার করছি না। বলে ওঠে প্রভা।

—আমারও সেই মত। তবে সেটা থাক ওর পোশাকি নাম হয়ে। আমি কিন্তু 'তান্‌না'ই বলব ওকে। বলেন প্রিয়া।

—বেশ! তাহলে আমিও ওকে 'রামতনু'ই বলব। বলেন প্রভা।

—আমি ওকে 'রত্নাকর' বলব। বলেন মধুমতী, প্রিয়ার ভগিনী।

সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। অথচ যার নামকরণ নিয়ে সকলে এত ব্যস্ত। সে কিন্তু দোলায় দোল খেতে খেতে কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছে সে? মিষ্টি হাসিটি তার অধরে লেগে রয়েছে। পুত্রের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন মুকুন্দরাম।

—পরে যত খুশী দেখো দাদা। এখন যে কাজের জন্য টাকা নিতে এসে-ছিলে, সে কাজে যাও।

প্রভার কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে মুকুন্দরামের। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

—আমার 'তানসেন' কিন্তু বড় হলে মস্ত গাইয়ে হবে। দেখবে, আমার এ নাম দেওয়া ব্যর্থ হবে না।

—কেমন করে জানলে?

—এই ওর ছোট অবস্থা থেকেই দেখেছি। আমি গাইলে কেমন মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। যখনি কাঁদত এই ছিল চুপ করাবার যন্ত্র।

—প্রত্যেকেই বাচ্চা অবস্থায় গান শুনতে ভালবাসে।

—না গো না, তা নয়। আমি যখন শেষরাতে রেওয়াজ করি, ধাই-মার কাছ থেকে উঠে চুপ করে আমার ঘরের পেছনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গীত শেষ হয়ে যায়। ওর মনে কিন্তু তার রেশ থেকে যায়।

—তা ছেলেকে গান শেখালেই পার!

—হ্যাঁ সে কথা চিন্তা করছিলাম। পাঁচ পূর্ণ হয়ে ছ'য়ে পড়েছে ও। এখন থেকেই ওকে তালিম দেব।

—আর ওর লেখাপড়া ?

—কেন পণ্ডিত মশাই-এর কাছে পড়বার ব্যবস্থা ত করে দিয়েছি ! রোজই ত ও পাঠশালায় যাচ্ছে।

—হ্যাঁ কিন্তু যা দুষ্টু হয়ে উঠছে দিন দিন। এরপর গান নিয়ে মেতে উঠলে আর পড়াশোনাই হবে না।

—বেশ তবে আরো দুটি বছর যাক।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে কথা হচ্ছিল স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। আজ পুত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা তাদের।

—একটা কথা বলব ? বলেন প্রিয়া।

—বল। সারাদিনের পর এটাই ত কথা বলার উপযুক্ত সময়। সত্যি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এত ব্যস্ত থাকি নিজের কাজে যে তোমাকে সঙ্গ দিতে পারিনা।

—সেজন্য পাঁচ ছয় বছর আগে খুবই নিঃসঙ্গ মনে হত। এখন তো তান্‌নার পেছনে ছুটোছুটি করেই সময় কেটে যায়। সংসারে কাজে আর কতটুকু সময় ব্যয় হয় ?

—সত্যি তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী। তাই তোমাকে ঘরে আনবার পর এমন বাড় বাড়ন্ত হয়েছে আমার সংসার। এবার বল কি যেন বলতে চাইছিলে ? সোহাগ ভরে পত্নীকে কাছে টেনে নেন মুকুন্দরাম।

—এই বলছিলাম তান্‌নার কথা। সত্যি বড় দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। আজ পণ্ডিতমশাই এসেছিলেন। বল্লেন খুবই বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু পড়াশোনায় মন নেই। আমাদের রাখাল রাজীব এর সঙ্গে খুব ভাব ওর। রাজীব যখন গরুগুলোকে নিয়ে জঙ্গলে যায় তখনই অবশ্য তান্‌না যায় না। প্রতিদিনই পণ্ডিতমশাই-এর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। আর পাঠশালা যখন ছুটি হয়, তখন আবার সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসে।

—তাহলে শুধু একা তান্‌না নয়, ওর আরো কয়েকটি সঙ্গীও পণ্ডিত মহাশয়ের চোখে ধুলো দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—কিন্তু কেন ? কিসের আকর্ষণে ?

—কতবার আজ ছেলেকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কিছুতেই সাড়া দিল না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মেরেছি দু'ঘা।

—মা হয়ে ছেলেকে মেরেছ, শাসন করেছ, তার জন্য কী হয়েছে? কিন্তু আমি ভাবছি জঙ্গলে যায় কিসের জন্য? রাজীবকে কিছু জিজ্ঞাসা করনি?

—না। বেশ কাল সকালে আমি নিজেই তানসেনকে জিজ্ঞাসা করব। দরকার হলে রাজীবকেও ডেকে পাঠাব। অনেক রাত হল। এবার একটু ঘুমোও। বলে পাশ ফিরে শুলেন মুকুন্দরাম। কিন্তু প্রিয়ার চোখে ঘুম নেই। ভীষণ কষ্ট হয় ছেলেটার জন্য। আজ রাগ করে তার গায়ে হাত তুলেছেন। কিন্তু শাসন না করে শুধু প্রশ্রয় দিলে ছেলে যে নষ্ট হয়ে যাবে। কত আশা তার তান্নাকে নিয়ে। চুপি চুপি শয্যা ছেড়ে উঠলেন প্রিয়া। তারপর অলিন্দ পার হয়ে এলেন এদিকের কক্ষে। জানলা খোলা ছিল। ঘরের মধ্যেও চাঁদের আলো পড়েছে।

আসবার সময়ই শুনেছিলেন অস্পষ্ট গানের আওয়াজ! এখানে এসে যা দেখলেন, বিস্মিত হয়ে গেলেন। ছয় বছরের তান্না চোখ বন্ধ করে গালিচার ওপর বসে গাইছে আর তার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে ধাই-মা হেমনলিনী। ওইটুকু বালক! অথচ কী অপূর্বই না গানের গলা ওর। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা না থাকলে এই বয়সে এমন সুন্দর গাইবে কি করে?

কতক্ষণ যে ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, নিজেই জানেন না। সঙ্গীতের এক জগতে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ কাঁধের ওপর কার স্পর্শে চেতনা ফিরে এল। চমকে উঠলেন। দেখলেন স্বয়ং মুকুন্দরাম। পাছে ঘরের ভেতর থেকে কারো নজর বাইরে যায় সেজন্য এতক্ষণ তিনি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে না থেকে বসেছিলেন। কিন্তু স্বামী কখন পেছন পেছন উঠে এসেছেন।

—একি তুমি? চমকে কথা কয়টি বলেন প্রিয়া। ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলেন মুকুন্দরাম। তারপর ইশারায় ঘরে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। শুধু নির্দেশ নয়, নিজে হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে আসেন তাঁকে।

—খুব অবাক হয়েছ আমাকে ওখানে দেখে, তাই না?

—সত্যি তাই। স্বামীর পাশে শুতে শুতে বলেন তিনি।

—আমি ত দেখলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ!

—হ্যাঁ একটু তন্দ্রা এসেছিল ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ পাশে দেখলাম তুমি নেই। ভাবলাম প্রয়োজনে বাইরে গেছ। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেও যখন এলেনা তখন চিন্তিত হয়ে বাইরে এলাম। একটু এগিয়ে যেতেই গানের সুর কানে এল। তারপর চিন্তার সমাধান হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে বসে বসে আমিও গান শুনেছি অনেকক্ষণ ধরে। এরপর গলা উঁচু করে লক্ষ্য করলাম তোমায়, তান্‌নাকে কোলে নিয়ে তার ধাই-মা শুইয়ে দিল। বেচারা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আর আমিও তোমার হাত ধরে এ ঘরে নিয়ে এলাম। অনেক রাত হল প্রিয়া, এবার ঘুমোবার চেষ্টা কর।

—তানসেন, সত্যি কথা বল্‌লে আমি একটুও রাগ করব না। বল যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক উত্তর দেবে?

—দেব বাবা।

—তুমি নাকি পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছ? রোজ রোজ নাকি জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছ? সেখানে কেন যাও তুমি? ছেলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—উত্তর দাও তান্‌না। তোমার বাবা ত বললেনই, সত্যি কথা বল্‌লে রাগ করবেননা। সস্নেহে বলেন প্রিয়া।

—মারবে না ত কালকের মত?

—না রে না। সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

—পশু-পাখির ডাক নকল করবার জন্যই জঙ্গলে যাই। আর জঙ্গলে যাবার জন্যই পড়াশোনায় ফাঁকি দেই।

ছেলের সত্য শুনে মুগ্ধ হলেন মুকুন্দরাম ও তাঁর স্ত্রী।

—কিন্তু পশু-পাখির ডাক নকল করবার এত সখ কেন তোমার? আর এজন্য লেখাপড়াকে অবহেলা করছ? প্রশ্ন করেন মুকুন্দরাম।

—বাঃ! ওই সময় জঙ্গলে না গেলে ওদের ডাক শিখব কেমন করে?

সন্ধ্যের পর ওখানে গেলে তোমরা যে রাগ করবে। আমিত রাত্রিবেলা পড়াশোনা করি। শুনবে বাবা, সিংহ কেমন করে ডাকে? বলে সিংহের ডাক ডাকে। শুধু সিংহ নয়। বাঘ, হরিণ ও আরো নানা ধরণের পশু পাখীর ডাক ডাকতে থাকে। এত আশ্চর্য অনুকরণের ক্ষমতা দেখে মুকুন্দরাম ও তাঁর স্ত্রী বিস্মিত হয়ে যান।

—বাবাঠাকুর, ও খুব সুন্দর গাইতেও পারে। ওর বন্ধুরা প্রত্যেক দিন ওর গান শুনতে জঙ্গলে যায়। একটার পর একটা গান করে আর আমরা সকলে সে-গান শুনি। এবার কথা বলে রাজীব।

—তুমি গান শিখতে চাও তানসেন? এবার প্রশ্ন করেন মুকুন্দরাম।

—তুমি শেখাবে বাবা?

—হ্যাঁ নিশ্চয় শেখাবেন। ওগো, তুমি কাল থেকেই সে ব্যবস্থা কর। এবার কথা বলেন প্রিয়া।

স্ত্রীর দিকে তাকান মুকুন্দরাম। তারপর বলেন, তোমার আপত্তি নেই ত?

—বিন্দুমাত্র না।

—বেশ তবে কাল ভোর থেকে তুমি চলে যাবে আমার কাছে। আমি যে ঘরে বসে রেওয়াজ করি. সে ঘরেই চলে যাবে তুমি।

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ছোট্ট তানসেনের সুন্দর মুখখানি।

—এবার আর জঙ্গলে যাবে নাত? প্রশ্ন করেন প্রিয়া।

—হ্যাঁ মা যাব। তুমি রাগ করনা।

—আমি পাঠশালায় যাব না। সকালে গান শিখব। আর দুপুর বেলায় জঙ্গলে যাব। রাত্রিবেলা পড়া করব।

—তা কি করে হবে? বলেন মুকুন্দরাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে। রাত্রিবেলা নয়, পণ্ডিতমশাই সকালে এখানেই আসবেন। তান্না গান শেখার পর তাঁর কাছে পড়বে। তারপর জঙ্গলে যাবে। ওগো, তুমি সে ব্যবস্থাই কর। এবার স্বামীর উদ্দেশ্যে কথা কয়টি বলেন প্রিয়া।

আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরে তান্না। সত্যি মা, তুমি কি ভাল। তোমার মত এত ভাল মা আর কারো নেই।

—ছিঃ বাবা! ও কথা বলে না। প্রত্যেকের মা-ই তার কাছে ভাল।

—ঠিক আছে আজ এখন পড়তে বোস। কাল থেকে সব ব্যবস্থা হবে। রাজীব, এবার তুমি তোমার কাজে যাও। আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বলেন মুকুন্দরাম। তান্না ও রাজীব ঘর ছেড়ে চলে যায়।

—এটা তুমি কি করলে? এবার স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন মুকুন্দরাম।

—ভুলে যেওনা মহম্মদ গাউসের কথা। তাঁর কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ছেলের ইচ্ছায় আমরা বাধা দেব না।

—হঁ্যা হঁ্যা ঠিক কথা। এবার মুকুন্দরামের মনের গহ্বরে মহম্মদ গাউসের ছবি ভেসে ওঠে। আজ তাঁর জন্যই তাঁর শূন্য ঘর ভরে গেছে।

—আমরা পুরুষ মানুষেরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। কিন্তু মায়ের জাত তোমরা। তাই চিরদিন চিরকাল সব স্মরণ থাকে তোমাদের। আর আমি আপত্তি করব না।

—তুমি অসন্তুষ্ট হওনি ত?

—না গো না। এবার আমি একটু বার হব।

—বোস একটু। তোমার জলখাবার নিয়ে আসি।

ঘর ছেড়ে বার হয়ে যান প্রিয়া। আর প্রশান্তিতে সমগ্র মুখখানি ভরে ওঠে মুকুন্দরামের।

একি। সিংহের ডাক শুনতে পেলাম কেন? তবে কি ধারে কাছে সিংহ আছে? তাহলে এ স্থানে বসে ত বিশ্রাম নেওয়া ঠিক হবে না।

—আমার বড় ভয় করছে। শেষে কি সিংহের হাতেই প্রাণ যাবে?

—গেলে সকলের যাবে, তোমাকে একা তার মুখে ফেলে দেওয়া হবে না।

আবার সিংহের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।

—হায় রাম! বাঁচাও বাঁচাও।

—এত অস্থির হয়োনা রামলাল। ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে।

—আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে স্বামীজী। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে আসি। বলে রঘুবীর।

—আমাকেও অনুমতি দিন। আমিও ওর সঙ্গে যাই। বলে সীতাপতি।

—আমি কিন্তু যাব না স্বামীজী। প্রায় কেঁদে ফেলে রামলাল।

—না-না তোমাকে যেতে হবে না। আমার কাছে বোস তুমি।

কথা হচ্ছিল প্রখ্যাত সঙ্গীতকার স্বামী হরিদাস ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে। একদিন শিষ্যদের নিয়ে বিহাটের মধ্য দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। পরিশ্রান্ত হয়ে বনের মধ্যে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় সিংহের ডাক কানে আসাতেই সকলে চমকে ওঠে।

—আশ্চর্য! আওয়াজটা আসছে খুব কাছ থেকেই। কিন্তু সিংহ ত দেখছি না। সীতাপতিকে বলে রঘুবীর।

—হ্যাঁ তাই। একটু সাবধানে এগোতে হবে।

আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে সেদিক লক্ষ্য করে এগোতে থাকে রঘুবীর আর সীতাপতি।

—রঘুবীর! দাঁড়াও, এগিও না। আর্তনাদ করে ওঠে সীতাপতি।

—কেন কি ব্যাপার?

—ওই ঝোপের আড়ালে কি যেন নড়ছে।

—কই! না তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিজের চোখে দেখলাম একটা কি যেন উঁকি দিল।

—সত্যি?

—আমি নিজের চোখে দেখেছি রঘুবীর।

—বেশ! আর এগোবনা। এখান থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করি।

একমিনিট দুমিনিট চলে গেল। কোন সাড়া নেই।

—আরে আরে একি! আমাকে অনুসরণ কর সীতাপতি। সিংহের সন্ধান পেয়ে গেছি।

দৌড়ে ছুটে গেল রঘুবীর। অনুসরণ করে সীতাপতি।

দু'জনে মিলে টেনে বার করে তানসেনকে। বেচারা বুঝতেই পারেনি রঘুবীর আর সীতাপতি ওই ঝোপের দিকে অমনভাবে তাকিয়ে থাকবে। তাই সকলে কি করছে দেখবার জন্যই মাথাটা তুলেছিল আগের মত, কিন্তু ধরা পড়ে গেল।

—এই হচ্ছে সেই সিংহ স্বামীজী। ছোকরা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সিংহের ডাক ডাকছিল।

সস্নেহে স্বামীজী বারো বৎসরের এই সুন্দর বালকের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

—বোস বাবা আমার পাশে। কোন ভয় নেই তোমার।

—একে শাস্তি দিন স্বামীজী। উঃ! কি ভয়টাই পেয়েছিলাম। বলে রামলাল। ফিক্ করে হেসে ফেলে তানুনা। ভারী মিষ্টি হাসি।

—তোমার নাম কী বাবা? সস্নেহে প্রশ্ন করে স্বামী হরিদাস।

—তানসেন।

—এত সুন্দর করে সিংহের ডাক নকল করতে শিখলে কেমন করে?

—আমি এই বনের সমস্ত জীবজন্তুর ডাক নকল করতে পারি। শুনবেন?

—দুষ্টু অথচ আশ্চর্য প্রতিভাবান বালক! যদি এ গান শেখে, তাহলে নামী গায়ক হবে। মনে মনে কথা কয়টি চিন্তা করেন স্বামীজী। তারপর বললেন, না পশু-পাখীর ডাক শুনব না। তোমার গান শুনব।

— গান শুনবেন? উৎসাহ প্রকাশ পায় তার কণ্ঠে।

হ্যাঁ। যে এত সুন্দর পশু-পাখীর ডাক নকল করতে পারে, সে নিশ্চয় ভাল গান জানে। নাও, ধর একটা গান।

—বাঃ! অপূর্ব! তোমার বাবার কাছে নিয়ে চলো আমাকে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

শুধু স্বামী হরিদাস নয়, প্রতিটি শিষ্য ওইটুকু বালকের গান শুনে অভিভূত হয়ে গেছে। এ প্রতিভা নিয়ে কি সাধারণ মানুষ জন্মাতে পারে? বলাবলি করে তারা।

—আপনার পুত্রের মধ্যে গানের আশ্চর্য সম্ভাবনা বর্তমান। তানসেনকে আপনি আমার কাছে দিয়ে দিন। আমার শিক্ষায় সে একদিন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক হয়ে উঠতে পারবে।

—আপনি যে আমার গৃহে পদার্পণ করবেন স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই কবে

থেকে সুযোগ খুঁজছি কি করে আপনার সান্নিধ্যে আসব, সেই আপনিই তানসেনের জন্য আমার বাড়ীতে এলেন ! এযে আমার পরম সৌভাগ্য। আজ সারাদিন আপনি শিষ্যসহ এখানেই থাকবেন। কাল ভোরে আপনাদের রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনারা এখন কোথায় যাবেন ?

—বৃন্দাবনে। তানসেনকে নিয়ে যেতে পারবত ?

দরজার ওপাশ থেকে কঁপে উঠলেন প্রিয়া।

—হঁ্যা আমি যাব। আমি গান শিখব। দিনরাত সঙ্গীত সাধনায় ডুবিয়ে দেব নিজেকে। আনন্দে নেচে উঠল বালক।

—আর এখানকার জঙ্গলে গিয়ে যে পশু-পাখীর ডাক অনুকরণ কর, তার কি হবে ? প্রশ্ন করলেন মুকুন্দরাম।

—বাঃ সেখানে যেন জঙ্গল নেই। আর এখন থেকে সব কিছু ভুলে আমি স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত শিখব। তোমরা অনুমতি দাও বাবা।

—আমি অনুমতি দিলেও তোমার মা কি দেবেন ? তিনি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারেন না।

দরজার ওপাশ থেকে চুড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

—তানসেন, দেখো বোধ হয় তোমার মা তোমায় ডাকছেন।

—আসছি আমি। সকলের সম্মতি নিয়ে তান্না পাশের ঘরে চলে যায়।

—ডাকছ মা ?

—হ্যাঁ বাবা। তোর বয়স অল্প। এভাবে আমার চোখের আড়ালে থাকলে আমি থাকব কেমন করে ?

—কিন্তু তুমি কি চাওনা মা, তোমার তান্না একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক হয়ে উঠুক ? আমার গান শুনতে তোমরা ভালবাস, কিন্তু তাই বলে তুমি কি চাওনা সঙ্গীতের সব রাগরাগিনীগুলো শিখে আমি আরো পাঁচজনকে গান শোনাতে পারি। পরে গান শেখাতেও পারি। আমি খুব বেশীদূর লেখা-পড়া শিখিনি, কিন্তু একদিন এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই উপার্জন করতে পারব আমি। মা আর আপত্তি করনা। বল তুমি রাজী ?

—তুমিই ত একদিন বলেছিলে, পুত্রের ইচ্ছেয় বাধা দেবে না। আজ কেন ভুলে যাচ্ছ তবে ?

মুকুন্দরামের কণ্ঠস্বরে মা আর ছেলে চমকে ওঠে। তিনি কখন চুপি চুপি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ খেয়াল করেনি।

—মহম্মদ গাউসের কথা ভুলে গেলে? আর তাছাড়া স্বামীজীর মত গায়ক শ্রেষ্ঠ তাঁকে নিজ থেকে চাইছেন, এ সুযোগ ওকে গ্রহণ করতে না দিলে আমাদের স্নেহই ব্যর্থ হবে। আর আপত্তি করনা তুমি। কাতরকণ্ঠে মুকুন্দরাম অনুনয় করেন স্ত্রীকে।

—মা, আমাকে যেতে না দিলে বড় দুঃখ পাব আমি। জানব, তোমার স্নেহই আমার ভবিষ্যৎ আমাকে গড়তে দিলনা। আর তাছাড়া শিক্ষা সমাপ্ত করে আবার আমি তোমারই কাছে ফিরে আসব। তুমি সম্মতি দাও মা।

—বেশ দিলাম। দু চোখ জলে ভরে ওঠে প্রিয়ার।

—হাসিমুখে সম্মতি দাও মা।

—চোখের জল মুছে নেন তিনি। হাসি হাসি মুখেই বলেন—সম্মতি দিলাম। আশীর্বাদ করি আমার তান্না 'তানসেন' রূপে চির অমর হয়ে থাকবে এই জগতে। রক্ত মাংসের এ দেহটা নষ্ট হয়ে গেলেও অমর গায়ক তানসেনের নাম চিরদিন চিরকাল লোকের মুখে মুখে ফিরবে।

—মা! আনন্দে চোখে জল এসে পড়ে তান্নার। প্রথমে মা পরে বাবাকে প্রণাম করে তান্না।

—তোমার এ আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না। আমি মানস নেত্রে দেখতে পাচ্ছি তোমার তান্নার ভবিষ্যৎ। বলেন মুকুন্দরাম।

— কিন্তু মহম্মদ গাউস কে বাবা? প্রশ্ন করে তান্না।

—তাঁর কথা আর একদিন বলব। শুধু জেনে রেখ, তাঁর কৃপাতেই তোমাকে পেয়েছি।

—গুরুর আদেশ সব সময় মান্য করে চলবে।

—নিশ্চয় করব। মা এবার বিদায় দাও।

—এস বাবা।

চলে গেল তারা। যতদূর দেখা যায় মুকুন্দরাম ও তার পত্নী তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। চোখ দুটো জলে ভরে আসতে চায়। পাছে পত্নীর কাছে

ধরা পড়ে যান, তাই তাড়াতাড়ি মুকুন্দরাম বলেন—আমার একটু কাজ আছে, আমি আসছি।

স্বামীর মনোভাব পাছে ধরা পড়ে যায় তাঁর কাছে, তাই নিজকক্ষে জানলার কাছে চুপচাপ এসে বসেন. চোখে ভেসে ওঠে বারো বছর আগের একটি ছবি।

দেওয়ালী উৎসব! চারিদিক যেন আলোর মালায় ঝলমল করছে। কিন্তু মিশ্র বাড়ীতে শুধু নিয়মরক্ষার জন্য কয়েকটি প্রদীপ ঠাকুরের আসনের সামনে দেওয়া হয়েছে।

—মিশ্রজী, দেওয়ালীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সমবেত ভদ্রলোকেরা এলেন বাড়ীর দরজায়।

—সন্তানহীন সংসারে আবার দেওয়ালীর অভিনন্দন। ঘর থেকে বার হয়ে এসে তাঁদের উদ্দেশ্যে কথা কয়টি ছুঁড়ে দিলেন মুকুন্দরাম।

—বুঝতে পারছি এতক্ষণে, কেন এ আনন্দের দিনে আপনার বাড়ী এত অন্ধকার। বললেন একজন।

—শুধু স্ত্রীর মনের দিকেই তাকিয়ে আজ বাড়ীতে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিনি। সন্তানহীনা নারী অন্তরের ব্যথা পুরুষ মানুষ হয়ে আর আমরা কতটুকু উপলব্ধি করতে পারি? নিজেরা নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অথচ বেচারীর এই জ্বালা দূর করবার জন্য কি করতে পারলাম? একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে তাঁর কণ্ঠ থেকে।

—কিন্তু আপনারা মহম্মদ গাউসের কাছে যাচ্ছেন না কেন? প্রশ্ন করে একজন।

—হ্যাঁ কয়েকবার চিন্তা করেছি তাঁর কথা। কিন্তু পরে ভেবেছি যদি সফল না হই?

—বেশ ত। একবার যান না তাঁর কাছে? আশীর্বাদ নিতে ত ক্ষতি নেই।

—হাঁ আমিও ভাবছি আর দেরী না করে কালকেই গোয়ালিয়রের পথে রওনা হয়ে পড়ব।

—সেই ভাল। আজ আর আমরা বসবনা। আপনারা সেখানে যাবার আয়োজন করুন।

দরজার আড়াল থেকে সবই শুনলেন শিপ্রা।

—মা, বড় পুণ্যবতী নারী তুমি! যে তোমার গর্ভে আসবে সন্তানরূপে জগৎ তার কথা চিরদিন স্মরণ রাখবে। এ পবিত্র তাবিজটি হাতে বেঁধে নাও মা।

—সত্যি আমি মা হতে পারব?

—আমি মিথ্যে বলিনা। তবে।

—থামলেন কেন? শঙ্কিত হন তাঁরা।

—তোমার সন্তান যা করতে চাইবে, তাতে অমত করনা। তাহলে তার প্রতিভা বিকশিত হতে পারবে না। ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সে।

—কিন্তু যদি অন্যায় করে তখন কি করব? প্রশ্ন করেন মুকুন্দরাম।

—শিশু অন্যায় করলে বাপ মা অবশ্যই শাসন করে। কিন্তু যেখানে দেখবে অন্যায় নয়, অথচ তোমাদের প্রেরণা তাকে আরো বিকশিত হতে সাহায্য করছে সেখানে বাধা দিও না। বল পারবে?

—পারব। একসঙ্গে বলেন দু'জনে।

—যাও ঘরে ফিরে। শীগ্‌গির পুত্রের মুখ দর্শন করবে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে আশা উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন দুজনে।...হ্যাঁ তার দুমাস পরেই টের পেলেন মা হতে যাচ্ছেন প্রিয়া। সেদিন আনন্দে সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেননি। বার বার মহম্মদ গাউসের পবিত্র কবজখানি মাথায় ঠেকিয়েছেন।

—মা, রান্না করবেন না?

ঝি সারদার ডাকে চমক ভাঙ্গে প্রিয়ার।

—হুঁ। যাচ্ছি।

—তান্নার জন্য মন খারাপ লাগছে?

—হ্যাঁ লাগছে। তবুও ওর উন্নতি আমি চাই।

—হ্যাঁ ঠিক কথা। ওর মঙ্গল হোক এ কথা আমরাও সব সময় বলি।

প্রিয়া আর দেরী না করে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হন।

দেখতে দেখতে এগারোটি বছর কেটে গেল। হরিদাস স্বামীর তানসেনকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া সার্থক হয়েছে। আজ তেইশ বছরের যুবক তাঁর বড় গর্বের শিষ্য। ভোরের বাতাসে তার সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। বাগানে পায়চারি করতে করতে শুনছিলেন হরিদাস স্বামী। এমন সময় এক যুবক সেখানে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

—কে তুমি ?

—আমার নাম রাজীব। মনিব, মুকুন্দরাম মিশ্রর বাড়ী থেকে আসছি।

—সবাই কুশলে আছেন ত ?

—না মনিবের খুব অসুখ। কবিরাজ বলেছেন, বাঁচার আশা নেই। ছেলেকে দেখবার জন্য উতলা হয়েছেন !

—তাই গিন্নীমার আদেশে নিতে এসেছি তাঁকে। অবশ্য তিনি বলেছেন আপনার অনুমতি পেলে তবেই ছোট কর্তা যাবেন।

—সেকি ! এ অবস্থায় আমি অনুমতি দেব না ? আমি এক্ষুণি তৈরী হবার নির্দেশ দিচ্ছি তাকে।

—ঘরের ভেতর কি ছোট কর্তা গাইছেন ?

—হ্যাঁ।

—কী অপূর্ব গানের গলা। ছোটবেলায় জঙ্গলে বসে কত গান শুনেছি ওঁর।

—তোমাদের সকলের কথাই তানসেন আমাকে বলেছে। এস, ঘরে একটু বিশ্রাম নাও। তারপর জলযোগ করে রওনা হয়ে পড়।

কক্ষের ভেতর প্রবেশ করলেন হরিদাস স্বামী, আর তাঁকে অনুসরণ করে রাজীব।

—তোকে দেখবার জন্যই পথ চেয়ে বসেছিলাম। কত বড় হয়ে গেছিস এখন আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারব।

—না বাবা, তোমাকে আমি যেতে দেব না। আজ তোমাদের জন্যই আমার এ প্রতিষ্ঠা। আমি আরো বড় কবিরাজ নিয়ে আসব।

—পাগল ছেলে। আমার যে ডাক এসেছে। তোর মা রইলেন তাঁকে দেখিস।

মৃত্যু শয্যায় মুকুন্দরাম। শিয়রে পত্নী চোখের জল ফেলছেন। আর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তানসেন। তার চোখেও জল।

—কাঁদিস না বাবা। তুই কাঁদলে তোর মাকে দেখবে কে? তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে তানসেন।

—শোন বাবা, একটা কথা বলে রাখি, হয়ত এরপর আর সময় পাব না।

—কি কথা বাবা?

—একদিন তোকে মহম্মদ গাউসের কথা বলেছিলাম, মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, বলেছিলে এঁর সম্বন্ধে কিছু কথা পরে বলবে।

—আজ সে সময় এসেছে। ইনি একজন বড় সাধক। গোয়ালিয়রে থাকেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে পবিত্র কবজ ধারণ করবার পর তোর মা গর্ভবতী হন। তাই তাঁর কাছে আমাদের অশেষ ঋণ জমা হয়ে রয়েছে। তুই অবশ্যই দেখা করে তোর পরিচয় দিবি। তারপর তাঁর উপদেশ মত চলবি।

—তাই হবে বাবা।

—তান্না, একটা বড় সাধ জাগছে, পূরণ করবি?

—কি বাবা?

—একটা গান কর বাবা। কতদিন তোর কণ্ঠের সুরসুধা পান করিনি। কোনরকমে কথা কয়টি বলেন মুকুন্দরাম।

—কর বাবা একটা গান। ওনার মনের সাধ পূর্ণ কর। এবার কথা বলে প্রিয়া।

—আমি এক্ষুনি গাইছি। তানপুরা নিয়ে মেঝের গালিচাতে বসে তানসেন। তারপর গুরুকে স্মরণ করে সুর ধরে...

—তুমি ফিরে এসেছ তানসেন? একি চেহারা হয়েছে তোমার!

হরিদাস স্বামীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় না তানসেন। তাঁর পায়ে মাথা রেখে শিশুর মত কাঁদতে থাকে।

—কি হয়েছে তানসেন? তবে কি তোমার বাবা বেঁচে নেই? সস্নেহে তাকে তুলে ধরেন হরিদাস স্বামী।

—শুধু বাবা নয়, মাকেও হারিয়েছি আমি।

—সে কি! কেন, কি হয়েছিল তাঁর?

—কিছুই হয়নি। বাবা চলে যাবার পর খুবই মনমরা হয়ে থাকতেন তিনি। তারপর একদিন সকালে ঘুম ভাঙতে গিয়ে দেখি, হাত-পা সব ঠাণ্ডা। কবিরাজ ডেকে আনলাম। তিনি বললেন—ঘন্টা আটেক আগেই হৃদক্রিয়া যন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

—স্বামীজী! আমার বাবা মা বলতে আর কেউ রইল না। আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তানসেন।

—আমিইত তোমার বাবা মা সব। শক্ত হও তানসেন। দুর্বল হয়ে পড়লে দাঁড়াবে কেমন করে? তুমি কি আবার বিরাটে ফিরে যেতে চাও?

—না, সেখানে আর ফিরে যাব না। সেখানকার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। আমার পিসীমা ও পিসেমশাই এখন সে বাড়ীতে আছেন।

—তাহলে তুমি আমার কাছেই থাক।

—হ্যাঁ থাকব। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তবে বাবার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করে আসি একবার।

—কি ইচ্ছা ছিল তাঁর?

—গোয়ালিয়রে গিয়ে মহম্মদ গাউসের সঙ্গে দেখা করা। কেননা তাঁর আশীর্বাদেই...

—থাক আর বলতে হবে না। তোমার বাবা সব বলেছেন আমাকে। নিশ্চিন্ত মনে সেখানে যাও তানসেন। যেমন সুবিধা ফিরে এসো। তোমার জন্য এ দরজা অবারিত। আগামীকাল প্রত্যুষেই রওনা হয়ে পড়।

—আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্য।

—অপূর্ব তোমার সঙ্গীত প্রতিভা। আমি জানতাম. বেটা তোমার ভবিষ্যৎ। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল সঙ্গীত সাধনায় মগ্ন থেকে আর কিছু শুনলে না। তাই এবার তোমাকে আর একজনের গান শোনাতে নিয়ে যাব। তাঁর গান শুনলে দারুণ আনন্দ পাবে। রত্নই রত্নকে চেনে।

—তিনি কে?

—এখানকার রানী।

—তিনি ভাল গান জানেন?

—নিজের কানে শুনে বিচার কর।

—আমার এখনি যেতে ইচ্ছে করছে আব্বাহুজুর।

—এখন নয় বেটা। আগামী সোমবার তাঁর জন্মদিন। সেদিন তাঁর ওখানে আমার নিমন্ত্রণ। সেদিনই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

—আমি যাব আপনার সঙ্গে?

—হ্যাঁ যাবে বৈকি। তোমাকেও যে সেখানে গাইতে হবে। মাতিয়ে দিতে হবে আসর।

—তাই হবে। তিনি কি সেদিনই গান শোনাবেন?

—না রে পাগল, সেদিন নয়। তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আবার যখন আমন্ত্রণ জানাবেন তখনই প্রস্তাবটা রাখবে।

—কিন্তু যদি আমন্ত্রণ না আসে?

—আসবে। আমার অনুমান মিথ্যা হবেনা।

—হ্যাঁ মহম্মদ গাউস সত্যই বলেছিলেন। রানীর জন্মদিনে আসর মাৎ করে দিয়েছিল তানসেন। চিকের আড়ালে রানী, তার সহচরী হুশেনী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকার দল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে সঙ্গীত শুনে। ঠিক তার কয়দিন পরেই আমন্ত্রণ এল রানীর কাছ থেকে। আজ রানীর কক্ষে গানের আসরে তবলাবাদক ছাড়া শুধু তিনজন। রানী, হুশেনী, তানসেন। তানসেনের অনুরোধে আজ রানীও গান গেয়েছেন। সত্যি

অপূর্ব কণ্ঠ তাঁর। তবলচি বিদায় নেবার পর রানী বললেন—আমরা একটা অনুরোধ রাখবেন ?

—অনুরোধ নয়, আদেশ বলুন।

—বেশ তাই। রোজ আমার এখানে আসবেন আপনি। ঘণ্টা খানেক নষ্ট করবেন আমার জন্য। আপনার সুরসুধা পান করে ধন্য হতে চাই আমি।

— আপনাকে সঙ্গীত শোনাতে পারলে আমিও ধন্য হব। রোজ আসব সন্ধ্যেবেলা। কিন্তু আপনার গানও শুনবত ?

—হ্যাঁ মধ্যে মধ্যে শোনাব বৈকি। তারপর সহচারীর দিকে তাকান। বলেন—হুশেনী, এবার তানসেনের জন্য কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা কর।

—জী সবই প্রস্তুত। কক্ষ ছেড়ে বার হয়ে যায় হুশেনী। একটু পরেই রাজার থালায় নানাবিধ সুখাদ্য নিয়ে আসে।

থালাটি তার হাতে তুলে দিতে দিতে মুগ্ধ চোখে সে তাকায় তানসেনের দিকে।

মাথার ওড়না খসে গেছে। তানসেনও তাকায় তার দিকে। অনিন্দ্য-সুন্দর একখানি মুখ। প্রথম দর্শনেই যেন মনটা কেড়ে নিল। তাকিয়েই রইল সে। তাড়াতাড়ি লজ্জা পেয়ে মাথার ওড়না টেনে দিল হুশেনী। রানী তখন চোখ বুজে একটা সুর ভাঁজছিলেন। তাই লক্ষ্য করলেন না।

সেদিন সারারাত ঘুম এল না তানসেনের চোখে। শুধু হুশেনীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এরপর একটি একটি করে কয়েকটি সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। কিন্তু হুশেনীকে নিভৃতে পাওয়ার সুযোগ ঘটেনা। অথচ ভাল করেই অনুভব করে তানসেন, হুশেনীও তাকে চায়, একান্তভাবেই নিজের করে পেতে চায়।

তাদের এই মনোভাব টের পেতে দেরী হয়না রানীর। তাই একদিন হুশেনীকে বলে, তানসেন যখন সন্ধ্যাবেলায় এ-কক্ষে আসবে, তুমি থাকবে না।

চমকে ওঠে হুশেনী। মুখখানি ব্যথায় ম্লান হয়ে যায়। তার দিকে তাকিয়ে রানীর কষ্ট হয়। বলেন—তুমি তোমার আব্বাজানের মৃত্যু শয্যায় কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ?

—বলেছিলাম। ঢোঁক গেলে হুশেনী।

—বল, কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ?

—বলেছিলাম, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত পুরুষ ছাড়া আর কাউকে জীবন-সাথী করবনা।

—কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কি রাখতে পারছ ?

—না পারছি না। আমি যে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তানসেনকে ভালবেসে ফেলেছি। কেঁদে ফেলে হুশেনী।

—এখন উপায় ? তিনি নিশ্চয় ধর্মান্তরিত হবেন না ?

—জানিনা।

—বেশ, পরীক্ষা হোক, তিনি তোমাকে কতটা চান। তুমি পরপর কয়েকদিন আসবে না। কিন্তু টিনের ফাঁক দিয়ে এদিকে দিকে লক্ষ্য রাখবে।

—তাই হবে।

—আজকাল আপনার কি হয়েছে বলুন ত ? তেমন দরদ দিয়ে গান করেন না, সঙ্গীত শেষ হয়ে গেলে কথাও বলেন না, কিছু খেতেও চান না ? শরীর কি সুস্থ নেই ? প্রশ্ন করেন রানী।

—আছে। ছোট্ট জবাব তানসেনের।

—মন কি কোন কারণে খারাপ ?

—আপনার অনুমান সত্য।

- কি কারণ জানতে পারি ?

—সাহস পাচ্ছি না।

—অভয় দিলাম।

—আপনার সহচরী হুশেনীকে দেখতে পাচ্ছিনা বলে।

—সে আর আসবে না আপনার সামনে।

—কেন আমার অপরাধ ?

—সে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে।

—আমাকে ভালবেসে ফেলেছে ? আনন্দে চোখে জল এসে যায় তানসেনের। তাহলে ত তার অনুমান মিথ্যা নয় !

—আমিও, আমিও তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। তাকে দেখতে পাচ্ছিনা বলে গাইতে বসেও অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

—কিন্তু তাকে কি সাদি করতে পারবেন?

—কেন পারব না? তাকে পেলে ধন্য হয়ে যাবে জীবন।

—এর জন্য অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে আপনাকে। পারবেন?

—সেটা কি?

—ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে হবে আপনাকে।

—কেন? চমকে ওঠে তানসেন।

—ইসলাম ভিন্ন আর কারো জীবনসঙ্গিনী হতে পারবে না সে। তার পিতার মৃত্যু শয্যায় এই প্রতিজ্ঞাই করেছে সে।

—ওঃ! দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে তানসেন। তারপর বিদায় নিয়ে বার হয়ে আসে।

এরপর পর পর পাঁচটি দিন কেটে গেছে। তানসেন আর আসেনি। বেচারী হুশেনী মনে প্রাণে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ঠিক এই সময় মহম্মদ গাউস এলেন রানীর সঙ্গে দেখা করতে।

—বলুন আপনি আমার কি সাহায্য চান?

—তানসেন আর হুশেনীর সাদি হবে। তাই আপনার সহযোগিতা চাই।

—তানসেন-হুশেনীর সাদি! কিন্তু তিনি কি ধর্মত্যাগ করবেন?

—হ্যাঁ করবে। প্রকৃত ভালবাসার কাছে সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। সবই শুনেছি তার কাছ থেকে। হুশেনীর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে ও। যে গান ওর এত প্রিয়, সে সঙ্গীতে মন নেই আর ওর। ওর ভাবান্তর দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। তারপর সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে সব অবগত হলাম। আমাকে ও আব্বাহুজুর বলে। আমিই ওকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেব। ওর নাম হবে 'আতা আলি'। কিন্তু জগতের কাছে ও 'তানসেন' নামেই পরিচিত থাকবে। এযে ওর বাবার দেওয়া নাম। কথাগুলো কানে যেতেই আনন্দে কেঁদে ফেলে হুশেনী।

—তোমার সব কাহিনী শুনলাম। আমায় বড় সাধ জাগে তোমার জন্মস্থান, তোমার বাড়ী, তোমার আত্মীয়স্বজনকে দেখে আসি। যাবে একবার আমাকে নিয়ে।

—না হুশেনী, সেখানে এখন আর যাওয়া যাবেনা। বরং আমি আমার গুরুজী হরিদাস স্বামীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। আমাদের দুজনকে দেখলে তিনি খুব খুশী হবেন। বিয়ের পর তাঁর আশীর্বাদ নেওয়া হয়নি।

—আমাকে দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না ত?

—তুমি আমার জীবনের কত সাধনার ধন। তোমাকে দেখে অখুশী হলে কখনও নিয়ে যাই সেখানে? এখন সেখানে কিছুদিন থাকব।

—আর আমি?

—তুমিও থাকবে। তোমাকেও তাঁর শিষ্যা করে নেব। তোমার কণ্ঠ তাঁকেও আনন্দ দেবে। চল আব্বাহুজুরের সঙ্গে দেখা করে আসি। তাঁর অনুমতি নিয়ে তবে বৃন্দাবন যাব।

দেখতে দেখতে চারবছর কেটে গেল। তানসেনের ঘরে এসেছে দুটি পুত্র সন্তান। শরৎসেন ও সুরৎসেনের মধ্যে বয়সে দু'বছরের ব্যবধান। বৃন্দাবনে একটা বাড়ী ভাড়া করে আছে তারা। সঙ্গীতচর্চা হরিদাস স্বামীর কাছে যথারীতি চলছে দুজনের। লক্ষ্মীবাঈ বলে একটি মারাঠি মেয়ে বাচ্চাদের দেখাশোনা করে।

—জান হুশেনী, আজ মনে হয় সেদিন যদি ধর্মত্যাগ করবার ভয়ে তোমাকে সাদি না করতাম, তবে সমস্ত জীবন বৃথা হয়ে যেত। আমি হয়ত পাগল হয়ে যেতাম। আমার এতদিনের সঙ্গীত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেত।

স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল তানসেন। হুশেনী তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল।

—সেজন্য নিজেকে পাপী বলে মনে হয়।

—না না হুশেনী, প্রকৃত প্রেমের মত অমূল্য সম্পদ আর কিছু হতে পারে না। তাই তুমি ও কথা বল না।

—আমার আব্বাজান যদি জীবিত থাকতেন, হয়ত তোমাকে দেখে মত পালটাতেন।

—জানগো, আমরাও আগে হিন্দু ছিলাম?

—হ্যাঁ আব্বাহুজুর বলেছেন। দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে না পেরে তোমার বাবা সারস্বত ব্রাহ্মণ হয়েও সপরিবারে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন।

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ।

—তোমার মা আপত্তি করেন নি?

—না। বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাহস তাঁর ছিল না। বাবা অবশ্য মাকে বলেছিলেন—এর মধ্যে কোন অন্যায় নেই। ঈশ্বর এক। আর তাছাড়া সে সময় অনেক হিন্দুই এ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

—তোমার হিন্দু নাম কী?

—প্রেমকুমারী।

—কে রেখেছিলেন?

—মা।

—সার্থক নাম।

—তোমার 'তানসেন' নামটি কে দিয়েছিলেন?

—আমার বাবা।

—সার্থক হয়েছে এ-নাম দেওয়া।

—সত্যি?

—তা নয়ত কী? তান্ অর্থাৎ সুরলহরী দিয়ে যিনি মানুষের হৃদয়কে এমন দ্রবীভূত করে ফেলেছেন, তাঁর এ নাম হবে না ত কার হবে?

—অন্যের কথা জানিনা। তবে আমার হুশেনীর হৃদয় যে দ্রবীভূত করে ফেলেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারপরেই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল—আচ্ছা বলত তোমার পিতা কেন ও-ধরণের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

—বড় দুঃখে। মুসলমান হবার পর হিন্দুরা ঠিক আমাদের সঙ্গে আগের মত দরদী মন নিয়ে এগিয়ে আসতেন না। সব ব্যাপারেই এড়িয়ে চলতেন। একবার ৺দুর্গাপূজার প্রাঙ্গণে বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য দোষটা আমার। পূজোবাড়ী যাবার জন্য দারুণ কান্নাকাটি করছিলাম। তাই নিরুপায় হয়ে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমাকে কেউ

অবহেলা করেনি। প্রসাদও পেয়েছিলাম। কিন্তু বাবাকে অনেকেই নিদারুণ অপমান করেছিলেন। সেদিন চোখের জলে বাড়ী ফিরে এসে বলেছিলেন—'মেয়ের সাদি আমি মুসলমান ভিন্ন আর কারো সঙ্গে দেবনা। হিন্দুর পরম গুণী সন্তানও যদি আমার কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়, তবে অবশ্যই তাকে ধর্মান্তরিত হতে হবে। কিন্তু আমরা কিছুতেই মেয়েকে আর ধর্মান্তরিত হতে দেবনা।'

এরপর দু' তিনটি বছর কাটল। হঠাৎ মা মারা গেলেন। এ সময় মুসলমান ভাইরা বোনেরা খুবই সাহায্য করেছিলেন আমাদের। কিন্তু হিন্দুরা তেমন সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে আসেননি।

মা চলে যাওয়ার পর দুটি বছর কাটল। বাবা আমার বিয়ের জন্য উদ্যোগী হলেন। রিজিয়া চাচি গোয়ালিয়রের রানীর প্রিয় বাঁদী। তিনি চাচির মুখে আমার কথা শুনে কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমায়। কিন্তু অসুস্থ বাবাকে ফেলে যেতে পারিনি। কথা দিয়েছিলাম পরে গিয়ে দেখা করব। এদিকে বাবার অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির পথে এগিয়ে চলল। যখন তিনি বুঝলেন আর থাকতে পারবেন না এ পৃথিবীতে, তখনই সেই চরম প্রতিজ্ঞাটি করিয়ে নিলেন আমায় দিয়ে।

—তুমি কোন আপত্তি করনি?

—না। বাবার মুখের ওপর কোন কথার বলার সাহস আমাদের কোনদিনও ছিলনা।

—তারপর?

—তারপর দিন শেষ হয়ে গেল তাঁর। আমি তখন একা। এই সময় গ্রামের হিন্দু মোড়লেরা এলেন। এগিয়ে এলেন আমার গ্রামসম্পর্কিত হিন্দু মাসী পিসীর দল। সকলেই আমাকে ভালবাসতেন। শুধু বাবার ওপর রুষ্ট হয়ে সম্পর্ক রাখতেন না।

—তাঁরা এসে কি বললেন?

—সকলেই আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বললেন, তাঁদের ঘরে মেয়ের মতই থাকব আমি। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে দেবেন।

—কিন্তু আব্বার শেষ কথা স্মরণ করে নিজের অক্ষমতা জানালাম।

এদিকে আমার মুসলমান চাচা চাচীরাও নিতে চাইলেন আমায়। কিন্তু রিজিয়া চাচী বাধা দিলেন। বল্লেন, সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবেন আমায়। তারপরেই গোয়ালিয়রের রানীর অন্তঃপুরে স্থান পেলাম। সহচরী হয়ে রইলাম তাঁর পাশে পাশে। আমাদের সব কথা তিনি রিজিয়া চাচীর কাছ থেকে শুনেছিলেন। খুব ভালবেসে ফেল্লেন আমায়। আরো ভালো বেসেছিলেন আমার গান শুনে। কতদিন চাঁদনী রাতে তাঁকে গান শুনিয়েছি। বল্তেন, মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞ পাত্রের সঙ্গেই আমার সাদি দেবেন।

—হয়ত দূরে চলে গিয়ে সুখের নীড় বাঁধব আমরা। আমার সুখ দেখলে তিনিও খুশী হবেন। তার পরেই আবার বলতেন—নাঃ, তোকে ছেড়ে থাকতে পারিনা। এমন পাত্রের সঙ্গে সাদি দেব যাতে তোর নোকরী ছাড়তে না হয়। আবার বলতেন, না, বড় স্বার্থপরের মত কথা বলছি। বড় ঘরে সাদি হোক এই আশীর্বাদই করি। কিন্তু রোজ এসে একবার দেখা দিয়ে যাবি।

—ভেতরে আসব? দরজার ওপাশ থেকে পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যায়।

চমকে ওঠে দু'জনে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে তানসেন। হুশেনী পর্দার আড়ালে চলে যায়।

—আসুন আসুন। অভ্যর্থনা জানায় তানসেন। ভেতরে আসেন হরিদাস স্বামীর এক শিষ্য।

—কি খবর বালকৃষ্ণ?

—আপনার একটা জরুরী চিঠি আছে।

—চিঠি! কই দেখি?

—চিঠিটা হাতে দেয় বালকৃষ্ণ।

—আমি চলি।

—না না, বস।

—বসব না। খুব জরুরী চিঠি। স্বামীজী বললেন। তাই সন্ধ্যে উতরে গেলেও আসতে বাধ্য হলাম। কথা কয়টি বলেই বালকৃষ্ণ বার হয়ে যায়।

চিঠিটা খুলে পড়তে থাকে তানসেন।

—কার চিঠি গো? এগিয়ে আসে হুশেনী।

—আব্বাহুজুরের। চোখ দু'টি জলে ভরে যায় তানসেনের।

—কি লিখেছেন? শঙ্কিত হয় হুশেনী।

—লিখেছেন, তিনি খুব অসুস্থ। বোধহয় তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। আমাদের দেখবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

—তাহলে আর দেরী নয়। কালই রওনা হয়ে পড়ি।

—হ্যাঁ তুমি গোছগাছ কর। আমি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

—সেই ভাল।

চিন্তিত মনে বার হয়ে গেল তানসেন।

—পারলাম না তাঁকে ধরে রাখতে। আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে হুশেনী।

—কাঁদিস না তুই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যা। আজ এ সময় তুই ভিন্ন তানসেনকে কে সান্ত্বনা দেবার আছে? বললেন গোয়ালিয়রের রানী। তাঁর চোখেও জল।

—হ্যাঁ মানুষটা মনে প্রাণে ভেঙ্গে পড়েছেন। আব্বাহুজুরের চিঠি পেয়েই ছুটে এসেছেন। দিনরাত সেবা করেছেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল।

—তবু ভাল যে তোরা দেখা পেয়েছিস। যদি তার আগেই চলে যেতেন?

—হ্যাঁ আমরা আসার পর আরো দু'দিন বেঁচে ছিলেন। ওঁর হাত ধরে বললেন—আমার বাড়ী, সঞ্চিত অর্থ সব রেখে গেলাম তোমার জন্ত। তুমি হুশেনী ও ছেলেদের নিয়ে এখানেই বাস কর।

—তাহলে এখন থেকে তোরা এখানেই থাকবি?

—জী হ্যাঁ, তাঁর শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করব।

—আর কি বলেছেন?

—বলেছেন, উনি যেন ওঁর সঙ্গীত সাধনায় অবহেলা না করেন। তাঁর গানের মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন।

—আর কয়েকটা দিন যাক, তারপর তুই জোর করেই সঙ্গীত সাধনায় নিযুক্ত করবি তানসেনকে।

—করব। এবার তবে আমি বিদায় নেই?

—হ্যাঁ মধ্যে মধ্যে আসিস। তোকে বেশীদিন না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ি।

—আসব।

—তানসেনকেও নিয়ে আসবি। কতদিন ওর গান শুনিনা। এমন কণ্ঠ জগতে সত্যি দুর্লভ।

—ওঁকে নিয়েই আসব। অভিবাদন জানিয়ে চলে যায় হুশেনী।

—আপনি খাবেন না মালকিন? প্রশ্ন করে দাসী।

—না। উনি না খেলে খাই কি করে?

—এদিকে আমাদের ত জোর করে খাইয়ে দিলেন!

—উনি এখন সঙ্গীত সাধনায় মত্ত। দেশ বিদেশ থেকে কত ডাক আসছে এই সুকণ্ঠ শোনার জন্ত। এখন সঙ্গীত সাধনায় মগ্ন তিনি। কি করে ডাকি বল?

—কিন্তু আপনারও ত নিজের শরীরের দিকে দেখা দরকার। এ সময় এত রাত করে খাওয়া দাওয়া করলে সহ্য হবে কেন?

হ্যাঁ হুশেনীর শরীর ভাল নেই। আর দু'মাস পরেই আরেকটি সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছে সে।

—আমি চললাম মালিককে ডাকতে।

—না না। বাধা দেয় হুশেনী।

—আপনার আমি মায়ের মত। অবুঝ হবেন না। চলে যায় সে।

চোখ বন্ধ করে গাইছে তানসেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর ফতিমা ওড়নার আড়াল থেকে কাশতে আরম্ভ করল।

অসন্তুষ্ট হয়ে চোখ মেলল তানসেন। বলল, তুমি এখানে কেন? কিছু বলবে?

—বিবী মালকিনের তবিয়ত ভাল নয়। এত রাত করে খাওয়া সহ্য হবে না তাঁর।

—তাঁকে খেয়ে নিতে বল।

—কোনদিন তিনি আপনাকে ফেলে খান মালিক?

হ্যাঁ ঠিকই ত। সত্যি অনেক রাত হল। আহা বেচারী হুশেনী কি কষ্টই না করে তার জন্ত।

—ঠিক আছে খাবার ব্যবস্থা কর। আমি আসছি। তানপুরাটা নামিয়ে রাখে তানসেন।

—হুশেনী, দারুণ সুখবর। আনন্দে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তানসেন।

—কি খবর বল।

—রেওয়ার অন্তর্গত বন্ধগড়ের রাজা রামচাঁদ বাঘেলা একজন সঙ্গীতানুরাগী। তিনি তাঁর সভাগায়ক হবার জন্ত আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

—এ কিন্তু সম্ভব হয়েছে তোমার এই পয়মন্ত মেয়েটির জন্ত। এই বলে একমাসের শিশু কন্তাটির প্রতি সস্নেহে তাকায় হুশেনী।

—সেজন্তইত ওর নাম দিয়েছি সরস্বতী। কিন্তু…

—বলনা। এত শঙ্কিত হচ্ছ কেন?

—আর দু'দিনের মধ্যেই সেখানে যাবার জন্তই গাড়ী পাঠাবেন মহারাজ। তোমাকে এখন কেমন করে নিয়ে যাব?

—ও এই কথা? সেজন্ত চিন্তা কর না। এখন একাই তুমি যাও। আমি বাচ্চাদের নিয়ে এখানেই থাকব। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

—তোমার মন খারাপ হবে না হুশেনী?

—তোমাকে ছেড়ে থাকতে সত্যি কষ্ট হবে। কিন্তু তোমার প্রতিভা বিকাশের এত বড় সুযোগ নষ্ট হতে দেব না।

—আমি সুযোগ পেলেই চলে আসব।

—সে চিন্তা পরে। তোমার সঙ্গীত দ্বারা যাতে রাজা এবং অন্তান্তদের তুষ্ট করতে পারে সে চেষ্টা কর আগে।

—সত্যি তুমি আমার উপযুক্ত সহধর্মিনী।

প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি মেলে হুশেনী স্বামীর দিকে তাকায়।

—তানসেন!

—আজ্ঞা করুন মহারাজ।

—মুঘল সম্রাট স্বয়ং আকবর আমার অতিথি হয়ে আসছেন। কেন জান?

—আজ্ঞে না।

—তোমার গান শোনবার জন্ত। আমি ভাবতেই পারিনি, স্বয়ং তিনি আসবেন! আজ তোমার জন্তই এ সম্ভব হল। আনন্দে নিজের গলার মুক্তোর হার পরিয়ে দেন তাকে।

—এখানে প্রায় ছয়মাস হল এসেছি। অনেক উপহারইত আমাকে দিয়েছেন মহারাজ, আজ আবার কেন এ দামী হারটি দিলেন?

—আনন্দে। তোমার সঙ্গীত যেমন আমাদের মুগ্ধ করেছে, দেখো

সম্রাট আকবরকেও যেন ঠিক তেমন আনন্দ দিতে পারে।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ। তবে অধীনের একটা নিবেদন আছে।

—কি বল?

—সম্রাট আগ্রায় ফিরে গেলে একবার আমি গোয়ালিয়র যাব। অনেক দিন ছেলেমেয়েদের দেখিনা।

—এবার তুমি তোমার পরিবারকে এখানে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা কর।

—আমিও সে কথা চিন্তা করছিলাম।

—সম্রাট ফিরে গেলে আমি নিজে তোমাদের থাকার জন্য একটি বাড়ী তৈরি করে দেবার ব্যবস্থা করে দেব।

—আপনার দয়ার শেষ নেই। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে বলে তানসেন।

শেষ হল তানসেনের গান। সমগ্র সভা নীরব। সঙ্গীতের রেশ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে।

—জবাব নেই। মহারাজ, তানসেনকে পেয়ে আপনি ভাগ্যবান। আমার দরবারে যদি এমন গায়ক থাকত…।

কয়েক মিনিট পর নীরবতা ভঙ্গ করে সম্রাট কথা কয়টি বললেন।

—আপনি কি তানসেনকে চান? বলেন মহারাজ।

—আপনি দেবেন আমাকে? চোখ দুটিতে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে আকবরের।

—আপনাকে খুশী করতে পারলে ধন্য মনে করব নিজেকে।

—তানসেন! আগ্রাতে সভাগায়ক হতে তোমার আপত্তি নেই ত? এবার আকবর প্রশ্ন করেন তানসেনকে।

—স্বয়ং মুঘল সম্রাটের সভাগায়ক? আনন্দে দু চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে তানসেনের। বলে—এ যে পরম সৌভাগ্য আমার।

—মহান সম্রাট, তানসেন আপনার সভা অলঙ্কৃত করবে। আমাদের চিরন্তন বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে তানসেনকে আমি আপনাকে উপহার দিলাম। বললেন মহারাজ।

তানসেন সস্ত্রীক আগ্রায় এসেছে। পরিবার নিয়ে বাস করবার জন্য আকবরের কাছ থেকে খুব সুন্দর একটি বাড়িও পেয়েছে। এখন থেকে

তাঁর সভায় নবরত্নের অন্যতম একজন হিসেবে তানসেন পরিচিত হল।

—আজ ফিরতে এত রাত হল তোমার ?

—আর বল কেন ? সম্রাটের নির্দেশে এখন রোজ তাঁর বিছানার পাশে বসে আমাকে গাইতে হয়। আমাকে আর হাস্যরসিক বীরবলকে না কাছে পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি।

—আবার ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে জাগাতেও হয় তোমাকে ?

—হ্যাঁ টোরী বা ভৈঁরো রাগ গেয়ে ঘুম ভাঙাতে হয়। ছেলেরা কোথায় ?

—পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

—যাই, একটু আদর করে আসি।

—মেয়েকে করবে না।

—নিশ্চয়ই ! এই বলে পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মেয়ের। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলে, আজ কিন্তু আমি কিছুই খাব না হুসেনী।

—কেন ?

—সম্রাট জোর করে নিজের পাশে বসিয়ে আমাকে ও বীরবলকে নৈশ ভোজন করালেন। তুমি খেয়ে নাও।

—বেশ ছেলেদের দেখে এসে এ ঘরে বস। বড় দুষ্টু হয়েছে সরস্বতী। সুযোগ পেলেই লাফ দিয়ে খাট থেকে নামতে যায়।

—আসছি এক্ষুনি। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায় তানসেন।

খাওয়া দাওয়া সেরে হুসেনী এল এ-ঘরে।

—তুমি একটু এখানে এসে বস হুসেনী।

বলে নিজের পালঙ্ক থেকে সরে গিয়ে জায়গা করে দেয় তানসেন।

হুসেনী সরস্বতীর খাটের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে। সেই খাটেই মেয়েকে নিয়ে ঘুমোয় সে। দেখে, মেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এবার সহজ হয়ে স্বামীর কাছে এসে বসে।

—সম্রাট আকবরকে নিয়ে এইমাত্র একটা গান রচনা করলাম। দেখবে ?

—কই দেখি ?

—আমি পড়ছি তুমি শোন।

এই বলে তানসেন পড়তে থাকে :

জয়তো চিরজীব শাহ আকবর শাহেনশাহ

বাদশাহ তখত বৈঠো ছত্র ফিরে নিশান।
দিল্লীপতি তুম নবী জি কোঁ পায়ব
অতি সুন্দর সুলতান।’

—সুন্দর, অতি সুন্দর। কিন্তু একটা দুঃখ আমার চিরদিনই থেকে যাবে। দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে হুসেনীর কণ্ঠ থেকে।

—কিসের দুঃখ হুসেনী? ব্যাকুল হয় তানসেন।

—সঙ্গীত শিল্পী তানসেনের কথা আজ লোকের মুখে মুখে ফিরছে। কিন্তু তার আড়ালে কবি তানসেন ঢাকা পড়ে গেলেন। আজ পর্যন্ত ত কম গান রচনা করনি, কিন্তু কে তার হিসাব রাখছে? শুধু কি তাই? তোমার শব্দ রচনার কৌশল ধ্রুপদ গানকে কত সমৃদ্ধ করেছে। দেবতাদের মহিমা বর্ণনাতে তুমি যে বিশ্লেষণ দিয়েছ তার মধ্যেও মৌলিকত্ব ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আনন্দ সমারোহ, বর্ষার ঘনঘটা। মেঘ গর্জন ও অবিরাম বৃষ্টিপাতের ধ্বনি তোমার রচিত বসন্ত মল্লার রাগে ভরপুর। যখন চিন্তা করি হিন্দুধর্ম ও ভক্তিবাদের সারাংশ সন্নিবেশিত করেছ তোমার গানে, আনন্দে ভরপুর হয়ে যায় হৃদয়টা। কি নেই তোমার গানে? পাখীরা বন, মলয় পবন, বসন্ত ঋতু, পুরবী বাতাস, বিজলী চমকের ঘনঘটা, বর্ষার ঝিমঝিম স্নিগ্ধতা, রাধাকৃষ্ণের অনৈসর্গিক প্রেমলীলা—সবই আছে। অথচ গায়ক তানসেনই শুধু প্রশংসা অর্জন করেছেন, কেউ একবারও কবি তানসেনের কথা চিন্তা করছে না।

—এইবার বুঝলাম তোমার অন্তরের ব্যথা। সস্নেহে স্ত্রীকে কাছে টেনে নেয় তানসেন।

—কিন্তু লোকে যদি এর মূল্য না দেয়, তার কি করা যাবে? তোমার দরদী মন ঠিক আমার যন্ত্রণাটাও উপলব্ধি করতে পেরেছে। তবে আকবর-কন্যাও আমার কবি মনের প্রশংসা করে পত্র দিয়েছে। তার বক্তব্য আমি গানে এই যে নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করছি—এর সত্যি তুলনা নেই। আমার গান ও আমার কবি প্রতিভা তাকে মুগ্ধ করেছে তাই গোপনে সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমাকে কিছু বলার আছে তার।

—কে সে? শঙ্কিত হয় হুসেনী।

—সম্রাট আকবরের কোন এক বেগমের কন্যা। তার নাম শুরষুন্নিসা। এই যে সেই পত্র। তানসেন হুসেনীর হাতে তুলে দেয় পত্রখানা। হুসেনী পড়ে। সুন্দর মুখখানি বেদনায় ম্লান হয়ে যায় তার।

—তুমি যাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে? ভারভার কণ্ঠ হুসেনীর।

—হ্যাঁ যাব। বাঁদিকে বলেছি আগামীকাল ভোরবেলা যখন গান গেয়ে আকবরের ঘুম ভাঙাতে যাব তখনই দেখা করব তাঁর সঙ্গে। দেখি, তিনি কি বলতে চান।

এরপর আরো কাছে টেনে নেয় হুসেনীকে। বলে, তুমি এতটুকুও চিন্তা কর না। তোমার তানসেন চিরদিন তোমারই হয়ে থাকবে। আমার কৌতুহল হচ্ছে, কি জানতে চাইছেন তিনি।

—যদি সম্রাট কন্যা অন্য কোন প্রস্তাব রাখেন তোমার কাছে?

—অন্যরকম প্রস্তাব! কি রকম বলত? কৌতুহল প্রকাশ পায় তানসেনের কণ্ঠে।

—যদি উনি প্রত্যহই তোমার সঙ্গ কামনা করেন? যদি প্রেমের বাঁধনে বেঁধে তোমাকে কাছে টেনে নেন? শঙ্কিত হয় হুসেনী।

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে তানসেন।

—তুমি ক্ষেপেছ হুসেনী? সম্রাটকন্যার সে দুঃসাহস হবে না। আর যদি হয় তবে সম্রাটের কানে সে কথা তুলতে বাধ্য হব আমি।

—না-গো তাঁর কানে তুলো না। তুমি নিজেই তাঁকে যা বলার বল।

—বেশ! বলে স্ত্রীকে আরো কাছে টেনে নেয় তানসেন।

—একি! হঠাৎ হুসেনীর চোখ পড়ে সরস্বতীর দিকে। দেখে সে উঠে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় হুসেনী। তারপর মেয়ের কাছে এসে সস্নেহে প্রশ্ন করে—তোমার ঘুম ভেঙে গেল কেন? জলতেষ্টা পেয়েছে?

—না তেষ্টা পায়নি। বাবা এত জোর হাসলেন যে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

—সত্যি মা, আমার জন্যই ঘুম ভেঙে গেল তোমার। লজ্জা জড়িত কণ্ঠে বলে তানসেন।

—মা তুমি শোবে না? মেয়ের প্রশ্ন।

—হ্যাঁ শোব।

—অনেক রাত হয়ে গেছে। বাবারও ঘুম পেয়েছে। তুমি চলে এস আমার কাছে।

—হ্যাঁ আসছি। লণ্ঠনের আলোটা কম করে স্বামীর দিকে একবার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি মেলে হুসেনী মেয়ের কাছে গিয়ে শোয়। মেয়ে মনের আনন্দে মাকে জড়িয়ে তার বুকে মাথাটি গুঁজে রাখে।

—বলুন কি বলার জন্ত নিভৃতে এ সাক্ষাতের আয়োজন ?

—আপনার সঙ্গীত, আপনার কবিত্বশক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই বলছিলাম, কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সঙ্গীতে এ নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন ?

গুলাব বাগিচায় বসে তানসেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সম্রাটকন্তা শরফুন্নিশার। পাশে বসে রয়েছে বাঁদী। দুজনের মুখই পাতলা ওড়নায় ঢাকা।

সম্রাটকন্তার প্রশ্ন শুনে একটু চুপ করে থাকে তানসেন। তারপর বলে—আমার সঙ্গীত জগতের গুরু দুজন। একজন হরিদাস স্বামী আরেক জন মহম্মদ গাউস। এই দুজনের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি আজ তার ফলেই হিন্দু সঙ্গীত আর পারস্ত সঙ্গীত দুই-ই ভালভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছি। এঁদের অবদান আমাকে এক নূতন পথ দেখিয়েছে। আমি সঙ্গীত জগতে নূতন কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছি। তাই হিন্দুসঙ্গীত ও পারস্য সঙ্গীতের সমন্বয় করেই এই নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছি।

—আমিও সে রকম একটা কিছু অনুমান করেছিলাম।

—সম্রাট আকবরের গলায় মালা থেকে মহার্ঘ দুটি রত্ন খসে পড়লে পাগল হয়ে যাবেন তিনি। মিষ্টি হেসে কথাটি বলে শরফুন্নিশা।

বাঁদীও সে হাসিতে যোগ দেয়।

—তার মানে ? বিস্মিত তানসেন প্রশ্ন করে।

—মানে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী তানসেন এবং রাজসভার সভাসদ বীরবলের কথাই বলছিলাম। সম্রাট আকবর দিনরাত এঁদের কথাই বলেন।

—পরম সৌভাগ্য আমাদের। আর কিছু বলবেন ? মিষ্টি হেসে এবার প্রশ্ন করল তানসেন।

—হ্যাঁ বলব। বলব বলেই ত নিভৃতে সাক্ষাতের জন্ত এলাম।

—বলুন, আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

—আমি কবি এবং সঙ্গীতশিল্পী তানসেনকে ভালবাসি। বিনিময়ে আর কিছু চাই না, চাই তাঁর প্রতিভার নানাভাবে বিকাশ-সাধন। আমার মনের তুষ্টির জন্ত একটু কষ্ট আপনাকে করতেই হবে, পারবেন ?

তানসেন তাকাল সম্রাটকন্তার দিকে। পাতলা ওড়নার আড়ালে যেন প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ ফুল। মুগ্ধ চোখেই তাকিয়ে রইল সে।

—বলুন পারবেন ?

—আগে বলুন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে নেয় সে।

—আমি নানাধরণের বাদ্যযন্ত্র শুনেছি। ছোটবেলায় পারস্যে দাদির প্রাসাদে নূতন অনেক বাদ্য যন্ত্র শুনেছি। কিন্তু আমার অতৃপ্ত হৃদয় একটি বিশেষ যন্ত্রের সুর শোনবার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। আপনি যদি সেই যন্ত্রটি আবিষ্কার করে ভারতীয় সুর বৈচিত্র্যকে তার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তবে অঞ্জলি ভরে সেই সুরসুধা পান করে হৃদয় শীতল করতাম। আমার বিশ্বাস, আপনার মত গুণী ব্যক্তির দ্বারাই এ সম্ভব হবে।

—বুঝতে পারছি, আপনি সঙ্গীত জগতের একজন বড় পূজারিণী। আপনার মনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলাম।

—তাহলে আশা নিয়ে ফিরতে পারি ?

—হাঁা পারেন। যন্ত্রটি আবিষ্কার করার পর নিশ্চয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। সম্রাটের আগে আপনাকেই সে যন্ত্রটির সুর শোনাব। কারণ আমার আবিষ্কার ঠিক হল কিনা আগে তার বিচার করবেন আপনি।

—তাই হবে। আল্লার দয়ায় আপনার সাধনা ব্যর্থ হবে না।

—বহুত মেহেরবানী আপনার, এবার আমায় বিদায় দেন।

—হাঁা আসুন। দুজনে তাকাল দুজনের মুখের দিকে। তারপর যে যার পথে চলে গেল।

আমার ইনামটা ? প্রিয় বাঁদী রেশমী এসে দাঁড়ায় শরফুন্নেশার সামনে।

গবাক্ষে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়েছিল শরফুন্নেশা, ভাবছিল অনেক অনেক কথা। তার মা পারস্যের মেয়ে। তাঁর কাছ থেকেই সে তার পূর্বপুরুষদের কথা শুনেছে। ওমর শেখ মির্জার পুত্র বাবরই প্রথম এদেশে মোগল সাম্রাজ্যের ভিৎ স্থাপন করেন। তারপর পিতামহ হুমায়ুন শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়ে পারস্যে চলে যান। আসার পথেই 'অমর কোট' নামক স্থানে পিতা আকবরের জন্ম হয়। পারস্যে আসার সময়ই ওমর শেখ মির্জার আরেক পুত্রের নবজাত নাতনী নুজাতুলকে দেখে হুমায়ুনের খুব পছন্দ হয়। তখন থেকেই তিনি আকবরের জন্য তাকে ঠিক করে রাখেন। শেরশাহ মারা যাবার পর হুমায়ুন যখন দিল্লী আক্রমণ করতে এলেন তখন নুজাতুল আর আকবরের সাদি দিয়ে আসতে ভুললেন না। নুজাতুল ছোট্টটি ছিল বলে সেখানেই তার মার কাছে ছিল।

এদিকে শেরশাহের বংশধরদের অনায়াসে পরাজিত করে হুমায়ূন সিংহাসন দখল করলেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি সাম্রাজ্য ভোগ করতে পারলেন না। লেখাপড়া খুবই ভালবাসতেন তিনি। তাই ছাদের ওপর একটি ঘরকে পাঠাগার করেছিলেন। একদিন অন্যমনস্ক বশতঃ সেই পাঠাগারের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে তার পিছলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে এসে একদম নীচে পড়েন। মৃত্যুদূত বোধহয় অপেক্ষা করছিল, তাই এ জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি চলে গেলেন। এরপর কত ঘটনাই ঘটেছে। নাবালক পিতা আকবর সিংহাসনে বসেছেন। তারপর সম্রাটের যখন আঠারো বৎসর বয়স হয়েছে, তখন তিনি বৈরামখাঁকে পদচ্যুত করে রাজ্যশাসনের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। ফলে বৈরামখাঁ বিদ্রোহী হয়েছেন। আবার ধরাও পড়েছেন। অবশ্য সম্রাট তাঁকে ক্ষমা করলেও আততায়ীর হাতে প্রাণনাশ হয় তাঁর। তখনও নুজাতুল পারস্যে। আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করবার পর সম্রাট নিয়ে এলেন তাঁকে। ততদিনে তার আরো অনেক বেগম এসে গেছে। নুজাতুল এখানে এসে প্রধানা বেগমের স্থান পান নি। সম্রাট বোধহয় তার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। ছোট্ট বয়সের কথা না মনে থাকাই সম্ভব। পরে দাদি বেগম লোক পাঠিয়ে সম্রাটকে অনুরোধ করেছিলেন মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য।

দেখতে দেখতে পাঁচ বৎসর কেটে গেল। এই সময় বেগম নুজাতুল চার বৎসরের কন্যা শরফুন্নেশাকে নিয়ে আবার দাদি বেগমের কাছে এলেন। কঠিন অসুখ করেছিল দাদির। বেশ অনেকদিন ভোগার পর মারা গেলেন তিনি। এই সময় প্রায় ছয়মাস তারা পারস্যে ছিল। খুব ভাল লাগত সেখানে থাকতে। কিন্তু সম্রাট কিছুদিন পর তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। এর অবশ্য কারণও ছিল; সম্রাট আকবরের সাদি। এ সাদি কোন মুসলমান রমনীর সঙ্গে নয়, রাজপুত রাজার কন্যা আসছেন তাঁর বেগম হয়ে। অবশ্য এর আগেও খুব ধুমধামের সঙ্গে বহু রাজপুত ও হিন্দু রাজকন্যাকে বেগম করে নিয়ে এসেছেন।

এরপর একটি একটি করে কত বছর কেটে গেল। আজ শরফুন্নেশার বাইশ বছর বয়স। অথচ তার সাদি হয়নি, হবে না। সম্রাট আকবর নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর বংশের মেয়েদের বিয়ে হবে না। কেননা সমানে সমানে বিয়ে না হলে মেয়ে সুখী হবে না। শুধু শরফুন্নেশা কেন, সম্রাটের অন্য কোন বেগমের কন্যারও আর সাদি হলনা। অথচ

সম্রাট এবং তাঁর পুত্ররা সমানে বিয়ে করে চলেছেন। সকল ধর্মকে ভালবেসেছেন পিতা। তাই আজ হারেমে হিন্দু মুসলমান বেগমের অভাব নেই। অথচ তাদের কন্যাদের কারো সঙ্গে জীবনের গ্রন্থি জড়াবার উপায় নেই। তানসেনের রূপ গুণ তাকে মুগ্ধ করেছে, পাগল করেছে। তাই চেয়েছে আরো উন্নতি হোক তাঁর। আরো মেলে ধরুন তিনি নিজেকে। সেই ছোটবেলা থেকে মনোজগতের যে যন্ত্রটি তাকে স্বপ্ন রাজ্যে নিয়ে যেত, আজ বড় হয়ে মনে হয়েছে একমাত্র তানসেনই তাকে সে যন্ত্রের সুর শোনাতে পারে। তাই লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে গোপনে সাক্ষাৎ করেছে তাঁর সঙ্গে। বলেছে মনের ইচ্ছের কথা।

—ইনাম মিলবে না? আবার রেশমীর কণ্ঠস্বর কানে বাজে।

তাকায় শরফুন্নেশা। বলে – কি ইনাম চাস? তারপর নিজেই বলে—এই মুক্তোর মালাটা দিচ্ছি।

জিভে কামড় দেয় রেশমী। বলে—আমি সে ধরণের ইনামের কথা বলিনি। আপনার গান শুনতে চেয়েছি। একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউত আপনার কণ্ঠের এই অমৃত রস পান করেনি, তাই দুঃখ হয় তাদের জন্য।

—হাঁ। সেই পারস্য থেকে যখন আসি, তখনই তুই আমার সঙ্গ ছাড়লি না। আজ কত বছর আমরা একসঙ্গে আছি। তোকে ছাড়া আর কাকে গান শোনাব, বল?

—তাহলে এই নিভৃত কক্ষে শুরু করুন একটি গজল।

—করছি, কিন্তু তুইও আমার সঙ্গে কণ্ঠ দে।

—একটা কথা ভাবছিলাম।

—কী?

—আপনার এ কণ্ঠ যদি তানসেনকে শোনাতে পারতাম?

—কি হত তাতে?

—হত হয়ত অনেক কিছুই। তিনি খুশী হয়ে আপনাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আসতেন। নিয়মিত দেখা হত আপনাদের।

—তাতে শুধু দুঃখই বাড়ত। আর কিছু হত না। নে আমি গাইছি, আমার সঙ্গে কণ্ঠ মেলা।

তানপুরা নিয়ে এল রেশমী। আর চোখ বুজে সুর ধরল শরফুন্নেশা।

—তুমি কে গো? চুপি চুপি আমার বাবার গান শুনছ? চমকে তাকালেন আকবর। দেখেন পাঁচ বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে। তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে বললেন তাকে। মেয়েটি কিছু না বলে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। সেও তার বাবার গান শুনতে বড় ভালবাসে।

গান শেষ হয়ে গেলে ইশারায় আবার তাকে ডাকলেন। সে কাছে আসতেই গলার সোনার হার পরিয়ে দিলেন তার গলায়।

· তোমার নাম কী?

—সরস্বতী।

—তুমি আমার বাবার গান শুনছিলে কেন?

—বড় ভাল লাগে তাই।

— তোমার নাম কী?

— আকবর।

—তুমি সম্রাট?

—হ্যাঁ।

—আমার বাবা ত রোজ ভোরে গান গেয়ে তোমার ঘুম ভাঙায়, আবার এখন এসেছ কেন গান শুনতে?

— তোমার বাবার গান দুঘন্টা আগে শুনেছি। রোজই এ সময় চুপি চুপি এখানে এসে শুনি। বড় লাগে ওর গান।

—বাবা তোমার সভাতেও গান করেন?

—হ্যাঁ।

—তবে আবার এসে শোন কেন?

—সরস্বতী সরস্বতী, কোথায় গেল? তানসেনের গলার আওয়াজ ভেসে আসে।

—আমি যাই। বাবার রেওয়াজ করা হয়ে গেলে রোজ তাঁর কাছে গান শিখি।

—বাঃ! একদিন তবে তোমার গান শুনব। শোনাবে ত?

—হ্যাঁ শোনাব।

—যাও তোমার বাবা ডাকছেন তোমায়।

—হ্যাঁ যাচ্ছি। চলে যেতে উদ্যত হয় সে।

—শোন শোন, তোমার বাবাকে কিন্তু বলবে না, আমার এখানে আসার কথা।

—আচ্ছা। চলে যায় সে।

—দিনরাত সঙ্গীত নিয়ে মগ্ন থাক, তার জন্য সত্যি সুখী আমি। কিন্তু সম্রাট আকবরের এ উপহারটির কথা আমাকে বলনি ত? মেয়ের গলার হার যদি চুরি হয়ে যেত? ভাগ্যিস চোখে পড়ল আমার।

—কি বলছ তুমি?

—বা:! সরস্বতীর গলায় তুমি সম্রাটের দেওয়া সোনার হার পরিয়ে দাওনি?

—আমি! কখন?

—দুপুরে স্নান করাতে গিয়ে দেখি ওর গলায় সোনার হার, লকেটটা তার জ্বল্ জ্বল্ করছে। হাতে নিয়ে দেখি স্বয়ং আকবরের নাম লেখা তাতে।

—তুমি কি বলছ হুশেনী, আমি বুঝতে পারছি না! মহানুভব সম্রাট যা উপহার দেন সবই ত তোমার হাতে তুলে দেই। তুমি আবার রাজসভাতে যাবার সময় সেগুলো আমায় পরিয়ে দাও। আজ আবার নূতন কোন উপহারের কথা বলছ?

—তাহলে সরস্বতীর গলায় এ হার এল কেমন করে? বলে সোনার হারটি স্বামীকে দেখান।

—সত্যি ত এতে তাঁর নাম লেখা! মেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসা করনি?

—করেছি। তার উত্তরে-সুর করে বলে—কে দিয়েছে বলবনা। তা আমার ত ধারণা ছিল, তুমিই দিয়েছ। মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছে তানসেন। হুশেনী বাতাস করতে করতে কথা কয়টি বলল।

—আশ্চর্য ত! সরস্বতীকে ডাক ত।

—ডাকব কি! মেয়ে গোঁসা করে বসে আছে। বলে, ওটা ও গলায় পরে থাকবে।

—সরস্বতী, সরস্বতী শোন ত মা?

উঠে আসে সরস্বতী। চোখ দুটি তার ফোলাফোলা।

—তুমি কাঁদছিলে নাকী? কি হয়েছে?

—আমার সোনার হার মা খুলে নিয়েছে।

—বস মা আমার পাশে।

মেয়ে এসে বসে।

—কে তোমাকে এ হারটা দিয়েছে?

—বলবনা। সুর করে বলে মেয়ে।

—শোন মা, এটা স্বয়ং সম্রাটের হার। কেউ যদি এটা দেখতে পেয়ে

ওঁকে নালিশ করে তবে শান্তি পাব আমি। তাই সত্যি কথা বল, কে দিয়েছে হারটা ?

—নিজে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন আর শাস্তি দেবেন তোমায় ? অবাক হয় মেয়ে।

—কে কে পরিয়ে দিলেন ?

—কেন যার দরবারে গান গাও, সেই সম্রাট ?

—কি বলছ তুমি ! সম্রাট কখন তোমার গলায় হার পরিয়ে দিলেন ?

—বলব না। আবার সুর করে বলে মেয়ে।

—বল মা, তা নয়ত ভীষণ বিপদ হবে আমার।

—তোমরা বলে দেবে না ত ?

—কাকে ?

—সম্রাটকে। তিনি বলতে বারণ করেছেন।

—না বলবনা। কিন্তু কি বলতে বারণ করেছেন ?

—তিনি যে রোজ সকালবেলা এসে চুপি চুপি তোমার রেওয়াজ ঘরের পেছনে এসে গান শোনেন।

—সম্রাট রোজ আসেন ! কই আমি ত জানিনা ?

—একথা তুই কি করে জানলি ? এবার হুশেনী প্রশ্ন করে সরস্বতীকে।

—বাঃ ! আমিই কি জানতাম নাকি ? আজ সকালে পাখির পালক কুড়োতে গিয়ে ওঁকে দেখলাম।

—রোজই পাখির পালক কুড়োতে যাস ? প্রশ্ন করে হুশেনী।

—না। রোজ ঘুম ভেঙ্গে গেলেই বাবার কাছে চলে আসি গান শেখার জন্য। আজ ভাবলাম, বাবা ত গান করছেন একটু পাখির পালক নিয়ে আসি।

—তা সম্রাটকে এ ঘরে ডাকিস নি তুই ?

—না। বলেছি, ভোরবেলা আমার বাবা ত গান শোনান তোমায়, আবার আস কেন ?

—এ কথা বললি তুই ! তা উনি কি বললেন ?

—বললেন, খুব ভাল লাগে তাই আসি। তারপর বলেছেন একদিন আমারও গান শুনবেন।

—উনি তোমায় হারটা দিয়েছেন ? প্রশ্ন করে তানসেন।

—হ্যাঁ বাবা।

—হুশেনী, এক্ষুণি এই হার ওর গলায় পরিয়ে দাও।

স্বামীর আদেশে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সেটা পরিয়ে দেয় তার গলায়।

—প্রথমটা একটু ঈর্ষাই হয়েছিল আপনার ওপর। কিন্তু এখন আমার সেভাব আর একটুও নেই। আমি কোনদিনও ভুলবনা একমাত্র আপনার জন্যই আমার স্বামী আজ এই 'রবাব' নামক যন্ত্রটার উদ্ভাবক বলে পরিচিত হলেন। আপনি এ-প্রেরণা না দিলে কেউ জানতে পারতাম না এর কথা। কৃতজ্ঞতায় ভরা হুশেনীর কণ্ঠস্বর।

—এবার তবে বিদায় নেই। বুঝতেই ত পারছ রাতের অন্ধকারে তোমাদের প্রাসাদে এসেছি, রাতের অন্ধকারে বিদায় নেব। লোকে জানবে, দুজন বাঁদী কোন দরকারে বাইরে গিয়েছিল। বলে শরফুন্নেশা।

—তাহলে আর বাধা দেব না। তবে একটা কথা বলছি, যখনই ইচ্ছা হবে চলে আসবেন। দিনের আলোয় হয়ত বার হওয়া সম্ভব নয় আপনার।

—একেবারে বার হওয়া অসম্ভব তা নয়। কিন্তু এখানে আসি টের পেলে সম্রাট অসন্তুষ্ট হবেন। তখন তানসেন আর আমি দুজনেই অসুবিধায় পড়ে যাব। তাই রাতের অন্ধকারই আমার ভাল।

—তাই আসবেন তবে।

—আমি এলে তুমি বাধা পাবে না ত?

—জী নেহি। এখানে ওঁর রেওয়াজ-ঘরেই আপনি সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করতে পারবেন।

—হাঁ৷ আমি চাই, তানসেন আরো অনেক অনেক বড় হোক। শুধু সঙ্গীত নয় আরো বিভিন্ন দিকে মেলে দিক নিজেকে।

—আমিও তাই চাই। সেজন্য আরেকটি ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছি।

—সেটা কী?

এবার হুশেনী কিছু বলার আগেই মুখ খোলে তানসেন। এতক্ষণ সে নীরবে হুশেনী ও শরফুন্নেশার কথা শুনছিল। এবার বলে—আমি দুটো গানের বই লিখছি। একটা অবশ্য শেষ হয়ে গেছে। আরেকটা সবে শুরু করেছি।

—গানের বই? বিস্মিত হয় শরফুন্নেশা।

—হ্যাঁ 'রাগমালা' আর 'সঙ্গীতসার'। আর এ বিষয়ে আমাকে প্রেরণা দিয়েছে হুশেনী।

—খোদা আপনাদের মঙ্গল করুন।

বোরখায় সর্ব শরীর ঢেকে নেয় দু'জনে। তারপর বার হয়ে যায়।

—চল শোবে, অনেক রাত হল। বলে হুশেনী।

—হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু কাজটা তোমার ঠিক হয়নি।

—কোন কাজটা? অবাক হয় হুশেনী।

—তুমি সম্রাট কন্যাকে কেন আবার আসার কথা বললে?

—বাঃ! ওঁর প্রতি কি আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধ বলে কিছু থাকবে না?

—সেইজন্যই সর্বাগ্রে তাঁকেই এ যন্ত্রের সুর শুনিয়েছিলাম। কিন্তু আবার এলেন তিনি, আবার শোনাতে হল সুর, তৃপ্ত হলেন তিনি।

—এর জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করছ কেন? তিনি সঙ্গীতজগতের একজন অনুরাগিনী, তাঁর কাছ থেকে তুমি অনেক সাহায্য পেতে পার।

—তোমাকে কিছু গোপণ করা উচিত নয়। তুমি বুঝতে পারছ না, সম্রাট কন্যা আমাকে ভালবেসে ফেলেছেন।

—বাঃ! ঈশ্বরকে কি আমরা ভালবাসিনা? মনপ্রাণ দিয়েই ত ভালবাসি। তুমি যে ওঁর চোখে ঈশ্বর।

—আবার ভুল করছ? ঈশ্বরকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু সম্রাট যে প্রতিদিন চিকের আড়াল থেকে আমাকে দেখছেন। নিজের মুখেই বলেছেন ভালবাসার কথা। আর আমিও যে রক্ত মাংসের মানুষ! একথা কেন ভুলে যাচ্ছ? কেন সেই প্রথম দিনের মত ভীতা হচ্ছ না তুমি?

—সমগ্র মনপ্রাণ সঁপেছি এই তানসেনের পদতলে। জানি, কোন পাপ স্পর্শ করবে না তাঁকে। রক্তমাংসের মানুষ হলেও নিজেকে সংযত রাখতে জানেন তিনি। বলে হুশেনী।

কথা বলার কোন ভাষা খুঁজে পায়না তানসেন।

বলে—এত বিশ্বাস করছ হুশেনী?

—হ্যাঁ করছি।

—মিথ্যে বলব না। প্রথম যেদিন গুলাববাগিচায় দেখি পাতলা ওড়নার আড়ালে ওর সুন্দর মুখখানি, মুগ্ধই হয়ে গিয়েছিলাম। এখনও বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি, চিকের আড়ালে সুন্দর দুটি চোখ আমার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

—মুগ্ধ হবার জিনিস হলে সকলে মুগ্ধ হয়, তার জন্য সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন? আর তাছাড়া তিনি নিজে এসে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তুমি নিজে যাওনি তার কাছে।

—কিন্তু এভাবে প্রায়ই যদি এখানে আসেন, তবে ব্যাপারটা বিশ্রী হবে। সম্রাট জানতে পারলে, কী হবে বলত?

—তুমি নিজে সম্রাটকে না বললে কাক-পক্ষীও টের পাবেনা। কেন এত উতলা হচ্ছ ?

—আশ্চর্য লাগছে তোমার এ উদাসীনতা দেখে। তোমাকে আমি কি করে বোঝাই ওই নারী আমাকে ভালবেসেছে, গভীরভাবে ভালবেসেছে। কিন্তু এর জন্য আমি কখনই চাইব না, আমার আর হুশেনী গড়া এই সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাক। হিন্দুশাস্ত্রে আছে—মুনিরও মতিভ্রম হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সাধারণ একজন মানুষ হয়ে আমি কতটুকু নিজেকে ঠিক রাখতে পারব ? না না আমি চাইনা আমাদের ভাগ্যাকাশে আর কেউ দুষ্ট গ্রহের মত উদয় হোক। এরপর যদি, সম্রাট-কন্যা আর কোনদিনও সাক্ষাতের কথা বলেন, স্পষ্টই বারণ করে দেব।

—তার প্রয়োজন হবেনা। আর আমি আসব না।

হঠাৎ শরফুন্নেশার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে দু'জনে। ঘরে যেন ভূত দেখেছে দু'জনে। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে তারা।

—হুশেনী, তানসেন ঠিক বলেছেন।

—কিন্তু আপনি যে চলে গিয়েছিলেন ? থর থর করে কেঁপে ওঠে হুশেনীর ঠোঁট দু'টি।

—হুঁা সাধ হয়েছিল নিজ কণ্ঠের মুক্তোর মালাটি পরিয়ে দেব ওঁর গলায়। কিছুটা যেতেই কথাটা মনে উদয় হল। তাই রেশমীকে নিয়ে আবার ফিরে এলাম। কিন্তু ঘরের কাছে আসতেই তোমাদের কথা কানে এল। বিশেষ সম্রাট-কন্যা কথাটা কানে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর সব কথাই নিজের কানে শুনেছি। সত্যি আমি ভুল করতে যাচ্ছিলাম। তানসেনের প্রতি আমার প্রেম কেন কামনা যুক্ত হবে ? আগে ত তিনি আমার চোখে খোদার আসনই নিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন গুলাব বাগিচায় তাঁকে প্রথম কাছে পেলাম, সেদিন আমার হৃদয়বনে যেন কোকিল কূজন করে উঠল। আমার হৃদয় মুকুরে শুধু ওঁরই ছবি ভেসে উঠতে লাগল। আমি ওকে পাবার জন্য পাগল হলাম। দিনের পর দিন চিকের আড়াল থেকে ওঁকে দেখেছি আর অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করতে চেয়েছি।

একটু দম নেয় শরফুন্নেশা। তারপর আবার শুরু করে—আমার প্রেরণাতেই তানসেন আবিষ্কার করলেন 'রবাব যন্ত্র'। আমার তৃষিত অন্তরকে জুড়িয়ে দেবার কী ব্যাকুল প্রয়াস তাঁর। কিন্তু আমার

মনোজগতে কেমন যেন সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। 'যাকে খোদার আসনে বসিয়েছিলাম, তাঁকে টেনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম ধূলার মলিনতার ধূলিমধ্যে। তাই আমার খোদা-ই কশাঘাতে আমাকে সচেতন করে দিলেন। তানসেনের নিদারুণ কথাগুলো চাবুক হয়ে আমার পিঠে পড়েছে। আমি রক্তাক্ত, ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছি। এ যে আমার পক্ষে কতখানি লজ্জার, তা বোঝাতে পারবনা। এর জন্য নিজেকে ছাড়া আর কারো প্রতি দোষারোপ করতে পারব না। কত সুন্দর সংসার তোমাদের অথচ আমার জন্যই এখানে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠত। সম্রাট-কন্যা বধূ হয়ে কোনদিনও এ-ঘরে আসতে পারতনা'। অথচ দিনের পর দিন কামনার বহ্নি জ্বালাবার চেষ্টা করত। আমাকেও তুমি মার্জনা করে দিও তানসেন, মার্জনা করে দিও হুশেনী।

—বল বল, মার্জনা করেছ ত? হুশেনীর দুটি হাত চেপে ধরেন তিনি।

—করেছি। আপনাকে যত দেখছি ততই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসছে। শান্ত কণ্ঠে বলে হুশেনী।

—তানসেন! এবার তানসেনের প্রতি দৃষ্টি ফেরায় সম্রাট কন্যা। বেদনার বিষাদময়ী এক দেবী মূর্তি যেন।

—বলুন।

—তুমি কশাঘাত করে আমাকে সংযত করেছ, এজন্য অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার প্রেম চিরদিন থাকবে। আমি আমার হৃদয়ের যে সিংহাসনে তোমাকে বসিয়েছি সে স্থান থেকে ফেলে দেব না, তবে আর আমাদের দেখা হবে না। যেদিন 'সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের কথা বিশ্বের সকলের মুখে মুখে ফিরবে সেদিন জানব সার্থক আমার প্রেম! যুগের পর যুগ আসবে। একদিন আমাদের সকলকেও চলে যেতে হবে। কিন্তু বিশ্ব বন্দিত তানসেনের মৃত্যু কোনদিনও হবে না। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর আমার কি আছে? ভাবতেও ভালো লাগছে যে মাটিতে মিশে যাবে আমার এই প্রাণহীন দেহটা, সেই মাটিতে অমর হয়ে থাকবেন 'তানসেন' নামে একজন প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক।

সমস্ত ঘরখানা নীরব হয়ে থাকে। একটা ছুঁচ পড়লেও যেন শোনা যায়।

—হুশেনী! আবার নীরবতা ভঙ্গ করে শরফুন্নেশা।

—বলুন।

—যদি আমার কণ্ঠের এ মুক্তোর মালাটা নিজ হাতে আমার

সামনে তানসেনের গলায় পরিয়ে দাও। তারপর চিরবিদায় নিয়ে চলে যাই।

—কোথায়? শঙ্কিত হয় হুশেনী।

—আপতত হারেমে! আমাদের বন্দিনীদের কারাগারে।

—তারপর? আবার প্রশ্ন করে হুশেনী।

—যতদিন না অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়, ততদিন এ রাজধানী ছেড়ে কিছু দিনের জন্য অন্য কোথাও চলে যেতে চাই।

—সম্রাট যদি সম্মতি না দেন?

—এখনও বেগম নুরজাহান বেঁচে আছেন, কাজেই কিছুদিনের জন্য হয়ত পারস্যে থাকার অনুমতি মিলতে পারে।

—তারপর আবার ফিরে আসবেন ত?

—আসতেই হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই হারেমে থেকে একটার পর একটা অভিশপ্ত দিনগুলো পার করে দিতে হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরফুন্নেশা।

—শাহজাদী আপনি ওর জন্য যে মালা এনেছিলেন, তা আমি পরাব না। কেন, পারেন না আপনার খোদার গলায় নিজের হাতে সে মালা পরিয়ে দিতে?

—তুমি বলছ হুশনী? আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শরফুন্নেশার মুখ।

—আপনি এ হার আমার গলায় পরিয়ে দিন। জীবনেও এর অমর্যাদা হবে না। এগিয়ে আসে তানসেন।

শরফুন্নেশা নিজের গলার হার খুলে পরিয়ে দেয় তানসেনের গলায়। এক পরম তৃপ্তিতে ভরে যায় অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি। বলে—এর কোন লকেট নেই। কাজেই এ জন্য কারো কাছে জবাব দিহি করতে হবে না তোমায়।

—আমি এ-হার কোনদিনও গলা থেকে খুলব না। যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হব, তখন এ-হার আমার কণ্ঠে শোভা পাবে। ধীরে ধীরে কথা কয়টি বলে তানসেন।

—চিরবিদায়। দু'জনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে নেয় সম্রাট কন্যা শরফুন্নেশা। তারপর দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়। একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল বাঁদী। অন্ধকারে দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করল দু'জনে। যতদূর দেখা যায় তানসেন ও হুশেনী তাকিয়ে রইল। অবশেষে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দু'টি মূর্তি।

—এটা কি হয়ে গেল! তিনি যে বড় ব্যথা নিয়ে চলে গেলেন! ব্যথায় ছল ছল করে ওঠে হুশেনীর সুন্দর দু'টি চোখ।

—ঠিকই হল। এটাই হওয়া প্রয়োজন ছিল। এর জন্য মনে কোন ক্ষোভ রেখোনা। শান্ত কণ্ঠে বলে তানসেন।

—তোমার কি একটুও দুঃখ হচ্ছে না?

—রক্ত মাংসের মানুষ আমি! আমার হৃদয়েও 'অনুভূতি' বলে যখন কিছু আছে তখন বেদনাবোধ করাটাকে অস্বীকার করি কি করে? সত্যি যদি পাষাণ হতাম তাহলে কোন প্রশ্ন ছিল না। তা নই বলেই তাঁর দূরে সরে যাওয়া আমার একান্ত কাম্য। তবে আজ তাঁকে এক নূতন রূপে দর্শন করলাম। এখন থেকে তিনি আমার চোখে দেবী'র মত বিরাজ করবেন। পূর্বে আমি হিন্দু ছিলাম বলেই এ উপমাটা মনে এল। ভক্তের মতই মনে তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে যাব চিরদিন।

—হুশেনী, তোমার মনে আছে ত আজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সেই বিশেষ দিনটি? দেশবিদেশ থেকে অনেক নামী শিল্পীরা আসবেন।

—হ্যাঁ আছে। কোনরকমে কথা কয়টি উচ্চারণ করে হুশেনী।

—সম্রাট বলেছেন, যার গান সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেবে তাঁকে, তাঁর গলার হীরের হারটি তাকে উপহার দেবেন। ফতেপুর সিক্রীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করবার পর এই প্রথম তাঁর সভায় এ প্রতিযোগিতা। বলেন তানসেন।

—আমার অন্তরের বিশ্বাস সে জয়মালা তোমার কণ্ঠেই শোভা পাবে। যন্ত্রণায় কেমন কুঁচকে যায় হুশেনীর মুখখানি।

—কি হল! এমন করছ কেন? শঙ্কিত হয় তানসেন।

—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। কোনরকমে বলে হুশেনী।

কি যেন চিন্তা করে তানসেন। তারপর বলে—আমার খেয়ালই ছিলনা। সবসময় এমনভাবে সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলাম যে, খেয়ালই ছিল না আজকালের মধ্যে নূতন অতিথির আবির্ভাব হবে। জন্ম হবে আমাদের কত আদরের সন্তানের। আমি আজ রাজসভাতে যাব না। যাব না যোগ দিতে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়। তোমাকে এভাবে ফেলে কিছুতেই যাব না।

—যেতেই হবে। এক্ষুণি ধাইমা চলে আসবেন। পাড়ার অন্যান্য

স্ত্রীলোকেরা আছেন, কোন অসুবিধা হবে না। তুমি দেরী করনা। প্রস্তুত হও সভায় যাবার জন্য।

—ছেলে মেয়েরা কোথায় ?

—ছেলেরা পড়তে গেছে। মেয়ে একটু সংসারের কাজ করছে। সারা সকালটা ত সেও সঙ্গীতের মধ্যে ডুবিয়ে দেয় নিজেকে।

—সত্যি বড় সুন্দর গান করে ও। ওর দুটি দাদা কিন্তু তেমন গান শিখতে পারল না। অবশ্য সুরৎ-এর প্রাচীন সঙ্গীতে কিছুটা দক্ষতা আছে। শরৎ-এর সঙ্গীত শোনার আগ্রহ থাকলেও শেখার উৎসাহ নেই। পারেও না গাইতে।

তানসেনের কথা শুনতে শুনতে আবার যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠে হুশেনীর সুন্দর মুখখানি। বিছানায় শুয়ে পড়ে কেমন যেন করতে থাকে সে।

—সরস্বতী, সরস্বতী শীগ্‌গির এস। অস্থির হয়ে ওঠে তানসেন।

দশ বছরের সরস্বতী শাড়ী পরে রান্নাঘরে রাঁধুনীর সাহায্যে তার বাবার জলযোগের ব্যবস্থা করছিল। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে।

—ডাকছ বাবা ?

—হ্যাঁ তোমার মা খুব অসুস্থ। তুমি কাছে কাছে থাকবে। ধাইমা আসছে না কেন ?

—তিনি ত এসেছেন। পাড়ার মাসীমা ও জেঠিমারাও এসেছেন। তুমি ঘরে আছ বলে এ ঘরে আসছেননা তাঁরা।

—ওঃ! সে কথা আগে বলতে হয় ?

তারপর হুশেনীর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—আমি তবে আসি ?

—কিছু খেয়েছ ?

—নাঃ আজ আর কিছু খাব না। ফিরে এসে যেন সকলকে সুন্দর দেখি।

—দেখবে গো দেখবে। যন্ত্রণার মধ্যেও হাসি হাসি মুখে কথা কয়টি বলে হুশেনী।

আকবরের সভায় সসম্মানে পুরস্কৃত হয়ে তানসেন ফিরে আসে গৃহে। দেশ বিদেশের শিল্পীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। গলায় শোভা পাচ্ছে হীরের হারটি।

—হুশেনী হুশেনী। বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে তানসেন।

—চুপ বর্ষীয়সী মহিলা হেমলতা বার হয়ে আসেন।

—তোমার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। কিন্তু হুশেনীর অবস্থা একদম ভাল নয়। কবিরাজ ডাকা হয়েছে। তিনি আশা দিতে পারছেন না।

—সে কী! এ আপনি কি শোনালেন আমায়?

—চিন্তা করনা। বুড়ো শিবতলার কাছে এক হাকিম আছেন। স্ত্রী রোগের অব্যর্থ চিকিৎসক তিনি। তবে খাই তার বড় বেশী।

—যত টাকা লাগুক তাকেই ডেকে আনছি আমি।

—তুমি যাবে কেন, ছেলেরা যাক।

—না না আমিই যাচ্ছি। পাগলের মত ছুটে বার হয়ে যায় তানসেন।

যমে মানুষে বেশ কয়দিন টানাটানি চলে হুশেনীকে নিয়ে। জলের মত টাকা খরচ করে তানসেন। অবশেষে বিপদ কেটে যাওয়ার মত অবস্থা আসে।

—এখনও হুশেনীকে বহুদিন সেবা শুশ্রূষার ওপর রাখতে হবে। ওর সেবার জন্য লোক নিযুক্ত রাখতে হবে। রীতিমত ফল দুধ ও দামী-দামী খাবার দিতে হবে ওকে। টাকা, সব টাকা শেষ হয়ে গেছে আমার। কিন্তু উপায় নেই হুশেনীকে বাঁচাতেই হবে। তাই আমি সম্রাটের দেওয়া হীরের হারটি বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছি। মানি, হুশেনী ব্যথা পাবে। উপায় নেই। নিজের মনে মনে কথা কয়টি বলে তানসেন।

—তানসেন শুনলাম তুমি নাকি একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছ?

—জী জাঁহাপনা।

—এ জন্যই কি গত আটদিন ধরে সভাতে আসনি?

—ঠিক সেজন্য নয়, আমার স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়েছিল। আমি ত খবর আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, মনে হয় ঠিক সময়ে খবরও আপনি পেয়েছেন।

—তা পেয়েছি। তাহলে বোধহয় এ কয়দিন গানের রেওয়াজও করেনি বাড়ীতে?

—করবার মত মনের অবস্থাও ছিলনা আমার।

—এখন আশা করি তোমার স্ত্রী সুস্থ আছে ?

—আল্লার দোয়ায় আর আপনার আশীর্বাদে।

—তোমার ছেলে মেয়েরা সকলে ভাল আছে ?

—জী।

—ভাল। বলে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন তার।

তারপরেই হঠাৎ সম্রাটের কি যেন মনে পড়ে। বলেন—তোমার হীরের হারটি কোথায় তানসেন ? চমকে ওঠে তানসেন। মিচকে মিচকে হাসতে থাকে কর্মচারী সৌকত মিঞা আর তার দল।

—হারটি হারিয়ে গেছে। কোনরকমে কথা কয়টি উচ্চারণ করে সে।

—মিথ্যা কথা বলনা তানসেন। আজ তুমি সভা কক্ষ ছেড়ে চলে যাও। যেদিন হার খুঁজে পাবে, সেদিনই সেটা গলায় দিয়ে আসবে। স্তব্ধ হয়ে যায় তানসেন। তারপর তস্‌লিম জানিয়ে সভা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়।

—এবার বাছাধনকে বাগে পেয়েছি। সম্রাটের স্নেহ ভালবাসা কেড়ে নেবার মজা টের পাওয়াচ্ছি। ফিস ফিস করে কথা কয়টি বলে সৌকত মিঞা।

—সৌকত মিঞা! হাঁক দেন আকবর।

—আজ্ঞা করুন, মালিক।

—মণিকারকে হাজির কর।

—হাজির হুজুর।

বিমলাপ্রসাদ এসে অভিবাদন জানায়।

—তানসেন কি হীরের হারটা তোমার কাছে বিক্রী করেছে ?

—জী। এই যে সে হার।

হারটা হাতে নেন আকবর। তারপর বলেন—এ হারটা আমি আবার ক্রয় করতে চাই।

—আপনার মেহেরবানি।

—সত্যি রাজকীয় উপহারের এভাবে অপমান ? এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। বললেন একজন মন্ত্রী।

—তানসেন বলছিলেন তাঁর স্ত্রী খুব অসুস্থ। বলে বিমলা প্রসাদ।

—বেশ ত টাকার জন্য আমাকেই বল্‌লে পারত ? বল্‌লেন সম্রাট।

—কিন্তু আপনার দেওয়া অন্য উপহারগুলো ত গলায় ছিল। হীরের হারটাই বিক্রী করতে গেল কেন ?

—এটা ত আমারও প্রশ্ন। আসুক তানসেন, জিজ্ঞাসা করব সব। বললেন সম্রাট।

—হারও পাবে না, বাছাধনকে আর আসতেও হবে না। আবার ফিস্ ফিস্ করে পার্শ্ববর্তী অনুচরকে বলে সৌকত মিঞা।

—সবই শুনলাম। কিন্তু সত্যি ভাবতে পারিনি আমাকে সুস্থ করবার জন্য তোমার হীরের হারটা বিক্রী করতে হবে।

—উপায় ছিল না হুশেনী। তাই রাজকীয় দান বিক্রী করতে বাধ্য হলাম। তোমার জন্য আমার কাছে সবই তুচ্ছ। অন্যান্য উপহারগুলোতে হাত দেইনি তার কারণ তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম শত অভাবেও ওতে হাত দেব না। হীরের হারটি তুমি দেখনি বলেই সেটা বিক্রী করা সম্ভব হয়েছে।

—কিন্তু এখন কিরবে? শঙ্কা প্রকাশ পায় হুশেনীর কণ্ঠে।

—সেই কথাই ভাবছি। পায়চারী করতে থাকে তানসেন। শত্রুরা সব আমার পেছনে লেগেছে। উদ্ধার পাব কেমন করে?

—রেওয়ার মহারাজ ত তোমায় খুব স্নেহ করতেন, একবার যাবে তাঁর কাছে?

—রেওয়ার মহরাজ! হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথা। দেখি তোমার কেমন পয়মন্ত। আমি ঘোড়া নিয়ে এক্ষুণি বার হয়ে পড়ছি।

—এখনি?

—হ্যাঁ হুশেনী। আর ত সময় নেই! তুমি সাবধানে থেকো। ছেলে-মেয়েদের দিকে নজর রেখ।

—রাখব গো রাখব। চিন্তা করনা।

তানসেন আর দেরী করে না। রেওয়ার পথে অগ্রসর হয়ে যায়।

—কি খবর তানসেন? তোমার কথা সময় সময় বড় মনে হয় আমার। ভাল আছ ত? অভিবাদন জানিয়ে উঠে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করেন মহারাজ।

—মহারাজ! বড় বিপদগ্রস্থ আমি। আপনি পরামর্শ দিন কি করে উদ্ধার পাব?

—বিপদ! কি হয়েছে তানসেন? আমি নিশ্চয় সাহায্য করব তোমায়।

তানসেন তখন তার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কথা জানাল।

—এই কথা? ঠিক আছে, দুশ্চিন্তা দূর করে ফেলে এইবার একটা গান করো তো! কতদিন তোমার সুকণ্ঠের সুর শুনিনা। নাও, শুরু কর।

একটু ইতস্ততঃ করে তনসেন তান ধরল। 'সুফল বিলাওল' ও 'মেঘ' এই দুই নতুন ধরণের রাগসঙ্গীত শোনাল। গান শেষ হলে সমস্ত সভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

— চমৎকার! তোমার সঙ্গীত যেন আগে থেকে আর হৃদয়স্পর্শী, গলা যেন আরও মধুর হয়েছে। প্রীতির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করো আমার রত্নখচিত পাদুকা খানি। আর মনে রেখো আমার দরজা চিরদিন তোমার জন্য খোলা।

—মহারাজ, সত্যি আমি ভাগ্যবান।

—সভার মধ্যে একজন আরেকজনের কানে কানে ফিস-ফিস করে বলে— সত্যি, তানসেন ভগ্যবান। প্রায় লক্ষমুদ্রা হবে এই পাদুকা জোড়ার দাম।

—এসো তানসেন এসো। কয়েকদিন তোমার গান শুনিনি, তাই মনটা বড চঞ্চল।

—আপনি ত আমায় সভায় আসতে বারণ করেছেন।

—হ্যাঁ করেছিলাম, বড় দুঃখে সে আদেশ দিয়েছিলাম। রাজকীয় উপহার বিক্রী করা অত্যন্ত অন্যায়। তোমার এই ক্রটী সকলের সামনে স্বীকার করতেই হবে।

—অপরাধ নেবেন না। সেই ক্রটীর ক্ষতি পূরণ যদি করে দিই? তারপর আপনার অনুমতি নিয়ে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাব।

—মানে?

—মানে হীরের হারের পরিবর্তে এটি আপনাকে দিলাম। এই বলে থলের ভেতর থেকে রত্নখচিত সেই পাদুকা দু'খানি সভার মধ্যে সম্রাট আকবরের সামনে পেশ করল।

সমগ্র সভা স্তম্ভিত হয়ে গেল। স্বয়ং আকবর বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন সেই দুস্প্রাপ্য রত্নখচিত পাদুকা দু'খানির দিকে। তারপর তানসেনকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখে তাঁর জল।

—আমি ভুল করেছিলাম তানসেন। আমার হারটি মূল্যবান ছিল

সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফলে তোমার মত অমূল্য রত্ন যে হারাতে বসছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।

—ছিঃ ছিঃ ধিক আমাকে। অধীনকে আর লজ্জা দেবেন না।

—বেশ তবে এই পাদুকা খানি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর সেই সঙ্গে নাও তোমার হীরের মালা। আকবর নিজের হাতে তার গলায় সেটা পরিয়ে দিলেন।

—শোন তানসেন, বিপদে পড়লে অবশ্যই আমার কাছে সাহায্য চাইবে। কিন্তু রাজকীয় উপহার দান বা বিক্রী করনা। এই দামী পাদুকাখানি হয়ত কোন রাজা মহারাজার কাছ থেকে উপহার পেয়েছ। কাজেই যত্নে তুলে রেখ এটা। তোমার এবং তোমাদের বংশধরদের কাছে কত বড় গৌরবের নিদর্শন হয়ে থাকবে এগুলো।

—আমায় ক্ষমা করুন সম্রাট, পত্নী এমন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াতে মাথার ঠিক ছিলনা।

—কিন্তু অন্যান্য উপহারগুলো ছেড়ে হীরের হারটাই বা বিক্রী করতে গেলে কেন?

—অন্য সব উপহারগুলো হুশেনীর দেখা। কিন্তু এটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার।

—এবার হবে। সস্নেহে বলেন সম্রাট। তানসেন মাথা নীচু করে নেয়।

—হঁ্যা তোমার ছেলের নাম কী রাখলে?

—বিলাস।

—তোমার একটি মেয়েও ত আছে? মনে হয় এখন সে বেশ বড় হয়ে গেছে তাই না?

—জী হাঁ। ওর নাম সরস্বতী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ওই নামই বটে ওর। ওর কি সাদি হয়ে গেছে?

—জী নেহি। আর একটু বড় না হলে সাদি দেব না।

—একদিন ওর গান শোনার ইচ্ছে রইল।

—বেশ, অপনি হুকুম করুন। কবে যাবেন?

—যদি আগামী কাল যাই?

—সে যে আমার পরম সৌভাগ্য।

—সরস্বতীর গানও শুনব আর তোমার নবজাত পুত্রের মুখও দর্শন করবো।

—আনন্দে তানসেনের চোখে জল এসে যায়।

সরস্বতী আকবরকে অভিবাদন জানিয়ে তানপুরা তুলে নিয়ে গাইতে থাকে। কী অপূর্ব তার কণ্ঠস্বর। বিস্মিত নেত্রে সম্রাট দেখলেন সরস্বতীর কণ্ঠে রয়েছে একটি সোনার হার। যার লকেটে রয়েছে তাঁরই নাম লেখা। ব—হু দিন আগের একটি ছবি ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে।

গান শেষ হয়ে গেল। সম্রাট তন্ময় হয়ে রইলেন। তারপর সম্বিৎ ফিরে আসতেই বললেন—আমার কণ্ঠে যে মালাগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোনটি তোমার পছন্দ, বল—আমি নিজের হাতে তোমাকে পরিয়ে দেব। তুমি যে আমার কন্যার মত।

—ব-হু দিন আগেই ত গান না শুনে আপনি আমাকে পুরস্কৃত করেছেন। সেদিন থেকে এখনও পর্যন্ত তা আমার গলাতেই রয়েছে। বাবা মা বলেছেন, এ-হার কোনদিনও গলা থেকে যেন না খুলি। কাজেই আর কোন উপহার চাইনা। চাই আপনার আশীর্বাদ।

—তোমরা তাহলে জানতে একথা? হাসি হাসি মুখে সম্রাট এবার প্রশ্ন করেন তানসেনকে।

—জানতাম। কিন্তু মেয়ে বারণ করেছিল বলেই কোন কথা আপনাকে বলিনি।

—সত্যি তুমি কোন উপহার চাওনা, সরস্বতী?

—আপনার আশীর্বাদ চাই। লজ্জাজড়িত কণ্ঠ স্বর সরস্বতীর।

—অশীর্বাদ করছি, হ্যাঁ প্রাণভরেই আশীর্বাদ করছি, তোমার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হোক। মস্ত বড় একজন গায়িকা হবে তুমি। এবার তোমার ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে এস।

—আনছি। কিন্তু মা কি বলে দিয়েছেন, জানেন?

—কি বলেছেন?

—বলেছেন উপহার নয়, ওকেও প্রাণভরে আশীর্বাদ করবেন আপনি। আপনার অশীর্বাদ পেলেই জীবনে আলোর পথে এগিয়ে যেতে পারব আমরা। চলে গেল সরস্বতী। মুগ্ধ চোখে আকবর তাকালেন তানসেনের দিকে।

—নিজের মুখে বলছি, সত্যি তুমি ভাগ্যবান তানসেন, তাই এমন স্ত্রীরত্ন লাভ করেছ। এখন বুঝতে পারছি, কেন এ-রত্ন হারাবার যন্ত্রণায় তুমি পাগলের মত হয়ে গিয়ে রাজকীয় উপহার বিক্রী করেছিলে।

—শিশুটিকে নিয়ে আসে সরস্বতী। অকবর তাকিয়ে থাকেন। সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে।

—মহানুভব সম্রাট! চিকের ওধার থেকে নারী-কণ্ঠ ভেসে আসে। চমকে

ওঠেন সম্রাট।

—আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনি আজ আমাদের কুটিরে পদার্পণ করেছেন। তাই মধ্যাহ্ন ভোজন এখানেই সারবেন। আমি সামান্যই ব্যবস্থা করেছি। একটু চুপ করে থাকেন আকবর। তারপর বলেন—বেশ, তাই হবে বহিন। তোমার মত নারী জগতে দুর্লভ। তোমার নিমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম।

—আমি স্বধর্ম ত্যাগ করব। বেশ জোর দিয়ে বলে ওঠে বীণা বাদক মিশ্রী সিং।

—না না, সেটা ঠিক হবে না। আতঙ্কিত হয় সরস্বতী।

—কেন হবে না? আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার পিতার গানের সঙ্গে এ যাবৎ আমিই বীণা বাজিয়ে আসছি। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। হরিদাস স্বামীর শিষ্য আমরা দু'জনেই। তোমাদের সকলের সঙ্গে আমার মনের দিক দিয়ে যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর কাউকে বিয়ে করলে সুখী হব না।

—কিন্তু তার জন্য ধর্ম ত্যাগ করবে?

—হ্যাঁ করব। তোমার এই সম্ভাবনাময় জীবনকে আমি নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারিনা। অন্তঃপুর থেকে সঙ্গীতের রেওয়াজ তোমার বজায় রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের গৃহে গেলে সে সম্ভাবনা থাকবে না। আর তাঁরা সকলেইত এ বিয়ের বিরুদ্ধে।

—স্বাভাবিক। প্রত্যেক বাবা-মা চান তাঁদের সন্তান স্বধর্মে বিয়ে করুক।

—না না আর কথা নয়। আজই তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে ইসলামধর্মে দীক্ষা নেবার কথাটা জানাব।

—আমার মা কিন্তু আমার বিয়ের জন্য খুব উতলা হয়েছেন।

—কেন তিনিত জানেন, আমি তোমাকে স্ত্রী হিসাবে মনোনীত করে রেখেছি। একথা কবেই ত মিঞা তানসেনের কাছে বলে রেখেছি।

—সেই জন্যই ত মা তাড়াতাড়ি পার করার চেষ্টা করছেন।

—কেন?

—পাছে হিন্দুগৃহে গিয়ে আমার কোন অসম্মান হয়। আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎটা একটু বেশী।

—তোমার কি সেজন্য কোন ক্ষোভ আছে? সেই কতটুকু ছিলে তুমি।

তখন থেকে তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি, ভালবেসেছি তোমায়। তারপর ধীরে ধীরে বড় হলে তুমি। আমাকেও ভলবাসলে। তোমার মা টের পেয়ে পর্দানসীনা করলেন তোমায়। কিন্তু চুপি চুপি দেখা সক্ষাৎ চলতে লাগল আমাদের। এখন আর আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারিনা। তাই স্বধর্ম ত্যাগ করতেই হবে।

—বেশ, বল বাবাকে সব। তিনি কিন্তু তোমার দারুণ প্রসংসা করেন।

—কি বলেন ?

—বলেন, তুমি হলে তাঁর যোগ্য সহযোগী।

—হ্যাঁ আগে আমি প্রাচীন পদ্ধতিতেই বীণা বাজাতাম, কিন্তু ওঁর নূতন গায়ন রীতির সঙ্গে সহযোগিতায় করতে গিয়ে বীণা বাদনেও নবীনত্ব এসে গেছে আমার।

—তাহলে তুমি আর আজমীড় যাবে না ?

—হ্যাঁ যাব। তিনি যদি ডাকেন, নিশ্চয় যাব। কিন্তু আজমীড় সিংহল গড়ের ক্ষত্রিয় নৃপতি এই সমোখনসিং বড় কঠিন। ধর্মান্তরিত পুত্রকে হয়ত মার্জনা করবেন না।

চুপ করে থাকে সরস্বতী। মনটা বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায়। মিশ্রী সিংহের মুখেও একটা বেদনার ছায়া পড়ে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বলে—মুসলমান হয়ে যে নামটা নেব সেটা কে পছন্দ করবে ?

—স্বয়ং সম্রাট আকবর যে সম্বোধনে ভূষিত করেছেন সেই 'নবাৎ খাঁ' নামেই সঙ্গীত সমাজে চিরদিন পরিচিত থাকবে তুমি।

—বেশ তাই হবে। 'মিশ্রী সিং' এবার থেকে 'নবাৎ খাঁ' নামেই সকলের কাছে পরিচিত হবে। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটি বছর কেটে গেল।

ভারতবর্ষের সর্বত্র তানসেনের নাম কে না জানে ? এদিকে সৌকত মিঞা আর দলবল ক্রমশঃ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল তানসেনের প্রতিভা ও সুখের সংসার দেখে। একবার তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ পেয়েছে। এখন কি উপায়ে তাকে জব্দ করা যায় ?

—আমার মনে হয়, তানসেন যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন আমাদের প্রতি সম্রাটের নজর পড়বে না। বলল সৌকত মিঞার এক বিশিষ্ট বন্ধু।

—হ্যাঁ সঙ্গীতের প্রতিভা তোমার মধ্যেও কিছু কম নেই। কিন্তু কোথায় পাচ্ছ সে সম্মান ? সে জন্য মনে হয় ওর মৃত্যুই আমাদের কাম্য।

—মৃত্যু। কিন্তু কাকে দিয়ে হত্যা করবে ওকে ?

ওর নিজের মৃত্যুই যাতে ও নিজে টেনে আনে, সে ব্যবস্থা করব।

—নিজের মৃত্যু নিজে টেনে আনবে ! কি বলছ তুমি ?

—কেন একজন গায়ক হয়েও সেকথা বুঝছ না ? দীপক রাগ গাওয়াতে হবে ওকে দিয়ে।

—দীপক রাগ ! তাহলে যে বেচারা জলে পুড়ে মরবে। সত্যি খাসা পরিকল্পনা তোমার। কিন্তু কে সম্রাটের কাছে আর্জি পেশ করবে ?

—তুমি। দরবারে শ্রেষ্ঠ গায়কের সম্মান নিতে চাও, আর এ আর্জিটুকু পেশ করতে পার না ? অদ্য আমরা সকলে তোমায় পেছনে আছি।

—বেশ তাই হবে। দেখি নিজের ভাগ্যটাকে পরীক্ষা করে। কালই রাজসভায় আর্জি পেশ করব।

—সাবাস দোস্ত। আমরা সকলে রইলাম তোমার জন্য।

—মহামান্য সম্রাট, অধীনের একটা আর্জি আছে। অভিবাদন জানিয়ে সামনে এসে। দাঁড়াল গায়ক ইসলামসাহ।

—কি আর্জি তোমার ?

—এ সভাস্থলে আমরা যে যতই সঙ্গীত শোনাই না কেন বিখ্যাত গায়ক তানসেনের মত এত আনন্দ কেউ দিতে পারিনা। তাই বলছিলাম, এ ধরণের শিল্পীর মহত্ব নিরুপণ করা যাবে যদি সে দীপক—রাগ গাইতে পারে। অনুগ্রহ করে তানসেনকে আদেশ করুন এ রাগ গাইবার জন্য।

—এই কথা ? অবশ্য তোমার আর্জি পূরণ হবে। তুমি স্বস্থানে বসো গিয়ে।

—কিন্তু মহারাজ, তিনি যদি গাইতে আপত্তি করেন ? প্রশ্ন করে সৌকত মিঞা।

—আমার আদেশ তানসেন অগ্রাহ্য করেনা। ঠিক সেই সময় তানসেন সভায় প্রবেশ করে অভিবাদন জানায় সম্রাটকে। শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কথা সে জানতেও পারলনা। তাই নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করল।

—তানসেন তোমার থেকে একটি 'রাগ' শুনতে ইচ্ছুক। আশা করি অমত করবে না।

—জাঁহাপনা ! এ আপনি কি বলছেন ? উঠে দাঁড়াল তানসেন।

—আপনার আশা পূর্ণ করব না একি হতে পারে ? বলুন, কি রাগ

শোনাব আপনাকে?

—দীপক রাগ।

—দীপক রাগ! চমকে ওঠে তানসেন।

—হ্যাঁ, এই রাগই শুনতে ইচ্ছুক আমি।

—কিন্তু জাঁহাপনা এ যে নিদারুণ ব্যাপার। আমি জ্বলে পুড়ে যাব।

—এটা আমার আদেশ, তানসেন।

—চুপ করে থাকে তানসেন। কপালের বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—চুপ করে আছ কেন? আমার আদেশ তুমি কি পালন করবে না?

—মহামান্য সম্রাট! একটু দম নেয় তানসেন। তারপর বলে—আপনাকে অসম্মান করব না। আমি গাইব, অবশ্যই গাইব। কিন্তু এর জন্য দু'সপ্তাহের প্রস্তুতির প্রয়োজন। আর এই দু'সপ্তাহ আমার জন্য ছুটি মঞ্জুর করুন।

—বেশ করলাম।

—তাহলে আমাকে বিদায় দিন?

—এখনই? বেশ ছুটি দিলাম।

অভিবাদন জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে আসে তানসেন।

—একি তুমি? তানসেনকে এমন অসময়ে গৃহে ফিরে আসতে দেখে হুশেনী অবাক।

—হ্যাঁ ফিরে এলাম প্রিয়তমা। আর দুসপ্তাহ পর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে আমায়।

—সেকি। কি হয়েছে বলত? স্বামীর হাত ধরে নিজ কক্ষে নিয়ে আসে তাকে হুশেনী। বিছানার ওপর বসে তানসেন। হুশেনী চটিজোড়া খুলে নেয়। বলে—শুয়ে পড় একটু।

—হ্যাঁ একটু শুয়ে নিই। তারপর সব বলছি। শুয়ে পড়ে হুশেনী তানসেনকে বাতাস করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর তানসেনকে প্রশ্ন করে—এবার বলবে?

—হ্যাঁ বলব। উঠে বসে তানসেন।

—সম্রাটের হুকুম হয়েছে, আমাকে দীপক রাগ গাইতে হবে। এ রাগ গাইলে আমি জ্বলে পুড়ে যাব।

—সে কি! সম্রাট কেন এমন আদেশ দিলেন?

—মনে হয় শত্রুরা আবার আমার পেছনে লেগেছে।

—তুমি চিন্তা করনা। আমি নিজে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করব। তিনি 'বহিন' সম্বোধন করেছেন আমায়।

—না। হাত চেপে ধরে তানসেন।

—তোমার স্বামীকে ছোট হতে দিওনা। আমি গাইব। তাঁর আদেশ পূর্ণ করব।

—কিন্তু তুমিই যদি জলে পুড়ে শেষ হয়ে গেলে তাহলে আমার জীবনে আর কি রইল? সম্রাটও যে এর পরিণাম জানেন না। তোমার বিহনে তিনি যে শোকে তাপে পাগল হয়ে যাবেন। চুপ করে থাকে তানসেন।

—তুমি অনুমতি দাও, আমি তাঁর কাছে না গিয়ে প্রধানা বেগম সাহেবার কাছে যাব।

—আমি তোমার বারণ করেছি হুশেনী।

—তবে কি হবে? কেঁদে ফেলে হুশেনী।

—তুমি বুদ্ধিমতি নারী। সব বিষয়ে আমার প্রেরণা। এত সহজে ভেঙে পড়লে ত চলবে না।

—বেশ, তবে আরেকজনের কাছে খবর পাঠাচ্ছি। এই বিপদে তিনি নিশ্চয় ছুটে আসবেন। তিনি এলে হয়ত সুপরামর্শ দেবেন। কিংবা সম্রাটকে দিয়ে যেমন করে হোক এ পরিকল্পনা বন্ধ করিয়ে দেবেন।

—কে তিনি?

—সম্রাট কন্যা শরফুন্নেশা।

—তুমি ক্ষেপেছ হুশেনী?

—তিনি যে সত্যি তোমায় ভালবাসেন।

—তোমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। শরফুন্নেশা কি ভাবে তাঁর পিতার কাছে আর্জি পেশ করবেন? তাহলে সম্রাট যে অন্য কিছু সন্দেহ করবেন? ফলে একা আমার নয়, তাঁরও শাস্তি হবে।

—তিনি নিজে করবেন না। মুজাতুল বেগমের মাধ্যমে করবেন।

—মুজাতুল বেগম কেন কন্যার অনুরোধ রাখতে যাবেন?

—একজনকে জানে বাঁচাবার জন্য এটুকু কি করবেন না?

—না না এসব অবান্তর কথা। এখন প্রকৃত কাজের কথা বল হুশেনী। আমি চাই না—আমাদের মধ্যে আবার শরফুন্নেশার আবির্ভাব হোক।

চুপ করে থাকে হুশেনী। আর পায়চারী করতে থাকে তানসেন।

—সম্রাট যখন আমার হুকুম দিয়েছেন, তাঁর নির্দেশ পালন করতেই হবে। আমার বিরুদ্ধে এইভাবে ষড়যন্ত্র চলছে দরবারে? আরেকবারও তারা সম্রাটকে দিয়ে অপমান করে আমাকে দূর করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি। কিন্তু এবার আর পরিত্রাণ নেই আমার।

যাক্ ভবিতব্য খণ্ডাবে কে ? আগামী-দিনের মানুষ জানবে, দীপক রাগ গেয়ে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছে তানসেন নামে আকবরের সভার এক গায়ক। এরপর বিলাস বড় হবে। হয়ত সম্রাটের সভায় তার স্থান হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে আমার স্থান দখল করতে পারে সে, সেদিকে নজর দেবে, বল কথা দাও পারবে ত ?

স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দেয় না হুশেনী। কি যেন মন দিয়ে চিন্তা করে।

—কি ভাবছ হুশেনী ?

উত্তর দেয় না সে।

—হুশেনী, হুশেনী। জোর কণ্ঠে ডাকে তানসেন।

এবার চমকে ওঠে সে। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে—একটা উপায় বার করেছি।

—সেটা কী ?

—মেঘ রাগ উত্তাপ দূর করে বৃষ্টি এনে শীতল করে দেবে। একই সঙ্গে কেউ যদি এই রাগ গাইতে পারে তাহলে মনে হয় তুমি বেঁচে যেতে পার। তাই নয়গো ?

—ঠিক, ঠিক বলেছ। আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে তানসেন।

কিন্তু তার পরেই ম্লান মুখে বলে—কিন্তু কে মেঘ রাগ গাইবে ? আজ আব্বাহুজুর বা স্বামীজী কেউ বেঁচে নেই। তাঁরা এ পৃথিবীতে থাকলে-কোন চিন্তা ছিল না। তুমি পারবে গাইতে হুশেনী ?

— চেষ্টা করতে পারি। তার সময় বড় কম।

—বিলাসকে দিয়ে চেষ্টা করাব ?

—অতটুকু ছেলে ঠিক সময়ে যদি রাগ ধরতে না পারে ?

—তবে ?

—সুরৎকে দিয়ে চেষ্টা করাবে ?

—না প্রাচীন প্রবন্ধ সঙ্গীতে ওর দখল আছে। কিন্তু মেঘরাগ গেয়ে বৃষ্টি ও শীতলতা আনা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না।

—ভেতরে আসব মালকিন ? ঘরের বাইরে দাসী রিজিয়ার গলা পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ আয়রে।

রিজিয়া অভিবাদন জানিয়ে বলে—নবাৎ খাঁ এসেছেন। তাঁকে বসতে বলেছি।

—কে ? আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে হুশেনী।

—শরবৎ পাঠিয়ে দাও রিজিয়া। হুশেনী, আমি বসার ঘরে যাচ্ছি। তুমি চিকের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও। তুমি ভিন্ন আমাদের পরামর্শ জমবে-না।

চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে তার মুখে ও চোখে।

—কথাটা কি সত্য?

—হ্যাঁ সত্য।

—আপনি জেনে শুনেও এ রাগ গাইতে যাচ্ছেন?

—উপায় নেই, সম্রাটের হুকুম। কিন্তু আজ সভাতে তোমাকে দেখতে পেলাম না, অথচ খবরটা পেলে কি করে?

—জী, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাই ভাবলাম, শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে সম্রাটের কাছ থেকে ছুটি নেব ক'দিনের। তাই একটু বিলম্বেই গিয়েছিলাম দরবারে।

—তা ছুটি মঞ্জুর হয়েছে?

—হয়েছে। তবে সম্রাট বললেন—যেদিন দীপক রাগ গাইবেন আপনি, সেদিন যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকি আমি। কেননা আপনার গানের সঙ্গে বীনা যে আমাকেই বাজাতে হবে। কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। তাই দরবার থেকে সোজা চলে আসছি এখানে। কিন্তু আমি সরস্বতীকে গিয়ে কি বলব? কথাটা শুনলে ও যে কান্নায় ভেঙে পড়বে।

—তুমি ওঁকে বলে দাও, আমাদের সরস্বতীই পারবে পিতাকে রক্ষা করতে।

এবার চিকের অন্তরাল থেকে হুশেনীর কণ্ঠ পাওয়া যায়।

—সরস্বতী! সে কিভাবে সাহায্য করবে? বিস্মিত হয় নবাৎ খাঁ।

—মেঘরাগ গেয়ে। দু'সপ্তাহের মধ্যে ওকে নিপুণ ভাবে এটি আয়ত্ত করতে হবে। বলে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দেয় তানসেন।

এবার নবাৎ খাঁর মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে—ঠিক, ঠিক কথাই বলেছেন। তবে একা সরস্বতী নয়, আপনি হরিদাস স্বামীর শিষ্যা রূপবতীকেও এই রাগ আয়ত্ব করান।

—হ্যাঁ তিনি একজন নিপুণা গায়িকা। কিন্তু এখন কে বৃন্দাবনে যাবে?

—না। না সেখানে এখন তিনি নেই। আমার এখানে মাসখানেকের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। সরস্বতী ওঁকে দারুণ ভক্তি করে। তিনি ঠিক সময়েই এখানে এসেছেন। আমি এক্ষুনি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সন্ধ্যার আগেই ওঁদের এখানে পৌঁছে দেব। এই দু'সপ্তাহ আর কিছু নয়, আর

কোনদিকে মন নয়, ওঁরা শুধু নিপুণ ভাবে মেঘমল্লার আয়ত্ব করে যাবেন। ওঁদের একথা মনে রাখতে হবে, আপনার জীবন মরণ ওঁদের ওপর নির্ভর করছে।

—হ্যাঁ ঈশ্বর ঠিক সময়ে ওনাকে পাঠালেন। নইলে দারুণ চিন্তার মধ্যে পড়েছিলাম যে এই রাগ কে গাইবে? উনি এসেছেন খবর পাওয়া মাত্রই আমার সরস্বতীর কথা মনে পড়ে গেল। চিকের আড়াল থেকে আবার কথা বলে হুশেনী।

—এবার বুঝেছি, বাঁদীর মুখে নবাৎ খাঁর আসার সংবাদে আনন্দে কেন চেঁচিয়ে উঠেছিলে তুমি? প্রফুল্ল মুখে কথা কথাক'টি বলে তানসেন।

নবাৎ খাঁ আর দেরী করেন:। বিদায় নিয়ে বার হয়ে যায়।

তানসেনের তত্ত্বাবধানে দিনরাত সরস্বতী ও রূপবতী সঙ্গীত অনুশীলন করছে। তাদেরও বিশ্রাম নেই। যেমন করে হোক মেঘরাগ দু'সপ্তাহের মধ্যে নিপুণভাবে আয়ত্ব করতে হবে। তানসেনকে যে বাঁচাতেই হবে তাদের।

দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট দিন এসে গেল।

—আমার বিশ্বাস, তোমরা কৃতকার্য হবে। মনে রেখো, প্রদীপ জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা গাইতে আরম্ভ করবে.

—হ্যাঁ বাবা।

—ঈশ্বর মঙ্গল করুন তোমাদের।

—গাইবার আগে আব্বাহুজুর আর স্বামীজীকে স্মরণ করো। বলে হুশেনী।

—আমি গাইবার আগে সব সময় আগে তাঁদের স্মরণ করি।

আজ রাজসভায় তিল ধারণের জায়গা নেই। শহরবাসীরা ভেঙে পড়েছে তানসেনের দীপক রাগ শোনবার জন্য।

হায় হায়! শ্রেষ্ঠ গায়ক এভাবে নিজেকে শেষ করে দেবে?

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে অনেক শহরবাসীর কণ্ঠ।

তানসেন আলাপ শুরু করলেন। ক্রমশঃ বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ক্রমে গরমে সকলের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠল। গাছের পাতাগুলি উত্তাপে

শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল।

সঙ্গীত তীব্র হয়ে উঠতেই প্রচণ্ড তাপ প্রবাহে পাখীগুলি মারা গেল। নদীর জল পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। তানসেনের শরীর গরম হয়ে উঠল। চোখ দু'টিও রক্তবর্ণ হল।

চতুর্দিকে আগুন জ্বলে ওঠায় সকলে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। বাতিগুলি নিজ থেকে জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে চিকের আড়াল থেকে মেঘরাগ গাইতে গাইতে সরস্বতী উঠে এল নীল আকাশের নীচে, যেখানে গায়িকা রূপবতী তানপুরা নিয়ে প্রস্তুত। সকলে বিস্মিত হয়ে তাকাল সেদিকে। সরস্বতীর সুর কানে যাওয়া মাত্র রূপবতী কণ্ঠ মেলাল তার সঙ্গে।

আজকের এ অনুষ্ঠানে বহুদিন পর শরফুন্নেশা যোগ দিয়েছে। সেদিনকার সে ঘটনার পর সচরাচর আর চিকের আড়ালে বসে না সে। আজ খুব চিন্তিত মনেই এখানে এসেছে। সেই ভোর থেকে খোদার কাছে চোখের জলে আর্জি পেশ করেছে, যেন তার তানসেনের জীবন সংশয় না হয়। এখন এই মুহূর্তে আগুন জ্বলে ওঠায় সকলের সঙ্গে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সে। কিন্তু হঠাৎ চোখ গেল হুসেনীর দিকে। এ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আজ সম্রাট বিশেষ মহিলাদের বসবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রেখেছেন। শরফুন্নেশা দেখল, হুসেনী চোখ বুজে কার উপাসনা করছে। ততক্ষণে বেগম ও শাহজাদীর দল ভয়ে নিজ নিজ কক্ষে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন সে গেল না। বুক ফেটে যাচ্ছে ...আর সহ্য করা যাচ্ছেনা তানসেনের কষ্ট।—আমার অন্তরের আর্জিকে দেখি খোদা কতখানি মূল্য দেন। মনে মনে কথা ক'টি উচ্চারণ করে সে।

সরস্বতী ও রূপবতী কিন্তু তন্ময় হয়ে গেয়েই চলেছে। ক্রমশঃ মেঘে মেঘে ছেয়ে যেতে লাগল সমস্ত আকাশ।

—ওঃ। একটু বৃষ্টি দাও, জ্বলে পুড়ে গেল শরীর। চিৎকার করে উঠল তানসেন।

না, আর দেরী হল না। নিপুণা-গায়িকা সরস্বতী ও রূপবতীর সাধনায় যেন তুষ্ট হয়ে আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি নেমে এল ধরণীতে। সৃষ্টির আনন্দে তানপুরা রেখে ছুটে বাইরে এল তানসেন।

ততক্ষণে সভার মধ্যে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেছে। স্বয়ং আকবর তানসেনকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে চিৎকার করে চেতনা-হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে।

—জ্বালা! অসহ্য জ্বালা! বলতে বলতে তানসেন বাইরে এল ঠিকই, কিন্তু আর পারল না ঠিক রাখতে নিজেকে। জগৎ সংসার যেন তার চোখের সামনে দুলতে লাগল…। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ল।

বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ রবে এতক্ষণে চোখ মেল্‌ল হুশেনী। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। ছুটে বাইরে বার হয়ে এল। লজ্জা, সঙ্কোচ ভুলে লুটিয়ে পড়ল তানসেনের বুকে। ওদিকে 'খোদা তুমি আছ, খোদা তুমি আছ' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল শরফুন্নেশা। আনন্দে তার দু'চোখ বেয়ে নেমেছে তখন জলের ধারা।

দু'দিন পর্যন্ত তানসেন চেতনা হীন হয়ে শয্যায় পড়ে রইল। সম্রাট আকবর প্রতিদিন তার শয্যার পাশে এসে বসতেন আর ঈশ্বরের কাছে চোখের জলে বলতেন—খোদা, তানসেনকে সুস্থ করে দাও। আমার মনের বাসনা পূর্ণ করো। দরিদ্র জনকে আমি এগারো দিন ধরে খাওয়াবো।

হাকিমের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে তানসেন সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। বহুদিন পর্যন্ত ঘুমের ঘোরে তার চিৎকার শোনা যেত—সর্বাঙ্গ জ্বলছে! চারপাশে অগ্নিশিখা! বৃষ্টি, বৃষ্টি……আমি কোথায়?

সুদীর্ঘ সময় লাগল ঠিকমত সুস্থ হতে। আকবর এবং শহরবাসীরা আনন্দে মগ্ন হয়ে উঠলেন।

—বহিন ষড়যন্ত্রকারীদের কুমন্ত্রণায় ভুলে আমি কতবড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম, আমাকে মাপ করে দাও তুমি। হুশেনীর উদ্দেশ্যে কথা কয়টি বললেন সম্রাট।

—খোদাবন্দ, এ আপনি কি বলছেন? আল্লার দোয়ায় আর আপনার স্নেহ ভালবাসার জোরেইত তাকে ফিরে পেয়েছি। চিকের আড়াল থেকে কথা কয়টি বললে হুশেনী।

—সে সময় সরস্বতী আর সাধিকা রূপবতী না থাকলে তানসেনকে আমরা কিছুতেই ফিরে পেতাম না। বলেন সম্রাট।

—এ কথা আমরাও স্বীকার করছি। তিনি ছিলেন বলেই আমার সরস্বতী নূতন করে উৎসাহ নিয়ে গাইতে পেরেছিল। পর্দার ওপাশ থেকে বলে হুশেনী।

—আমি যে ওদের দু'জনকে দেখার জন্য অধীর হয়েছি। কখন আসবে ওরা? বলেন সম্রাট।

—জাহাঁপনা, খবর পেয়েই ওরা চলে এসেছে। এক্ষুনি দর্শন করবে আপনাকে।

পাৎলা ওড়নায় মুখ ঢেকে হুশেনীর নির্দেশমত সরস্বতী ও রূপবতী অভিবাদন জানায় সম্রাটকে। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়ান তিনি। তারপর নিজ হাতে দু'টি রত্নহার দেন তাদের হাতে।

—এ আমার স্নেহের দান, তোমরা গ্রহণ করে সুখী কর আমাকে। ঈশ্বর মঙ্গল করুন তোমাদের। সস্নেহে বলেন সম্রাট।

হাসি হাসি মুখে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল তারা।

—তানসেন! ধীর কণ্ঠে ডাকলেন আকবর।

—বলুন জাহাঁপনা।

—তোমাকে পুড়িয়ে মারবার যারা চেষ্টা করেছিল, সেই সৌফত মিঞার দলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করব আমি।

—না না খোদাবন্দ! চিকের আড়াল থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে হুশেনীর।

—কেন বহিন, তোমার স্বামীকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করে ছিল তারা, আর মার্জনা করে দেবে তাদের?

—অপরাধ নেবেন না জাহাঁপনা। এবার আস্তে আস্তে শয্যায় শুয়ে কথা কয়টি বলে তানসেন।

—ষড়যন্ত্রকারীরা সাধারণতঃ আমাকে পুড়িয়ে মারবার উদ্দেশ্যে দীপক রাগ গাইবার জন্য আপনার কাছে আর্জি পেশ করেছিল, কিন্তু আপনিও ত আদেশ দিয়েছিলেন আমায়? আমি এর পরিণতি বোঝাবার চেষ্টা করে ছিলাম, কিন্তু আপনি বুঝতে চাননি।

—হ্যাঁ ঠিক কথা। জেদের বশেই তোমাকে দিয়ে জোর করে গাইয়ে ছিলাম। কারো কাছে ছোট করতে চাইনি তোমায়। তাহলে সর্ব প্রথম আমারই শাস্তি হওয়া দরকার। বলো বহিন, কি শাস্তি দেবে আমায়? এবার কথা কয়টি চিকের দিকে ছুড়ে দিলেন সম্রাট।

—একটু অপেক্ষা করুন। নিজের হাতেই শাস্তি দিতে চাই।

হ্যাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসি হাসি মুখে ওড়নায় মুখ ঢেকে হুশেনী বার হয়ে এল।

—আপনার হাতটা একবার বার করুন ভাইজান।

—ভাইজান! আঃ! কে যেন অমৃত বর্ষণ করল কানে।

তানসেনও বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইল। অবাক হল স্পষ্টভাবে এ

দম্বোধন করতে দেখে।

—যদিও আজ হিন্দুদের রাখী পূর্ণিমার দিন, কিন্তু আপনার কাছে ত সকল ধর্মই সমান। তাই আমি আপনার ইসলাম বহিন হয়েও আমাদের ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে এ পবিত্র রাখী বেঁধে দিলাম। আমরা পূর্বে হিন্দু ছিলাম, একথা বোধহয় আপনার অজানা নয়।

আনন্দে চোখে জল এসে যায় সম্রাট আকবরের। আশীর্বাদ করার উদ্দেশ্যে হাত তোলেন। আর সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে তানসেন। মনে হয় মাটির পৃথিবীর মধ্যেই স্বর্গসুখ উপলব্ধি করতে পারছে সে………।

আকবরের রাজসভায় দীর্ঘকাল সম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করে ১৫৮৫ সালে তানসেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে গোয়ালিয়রে মহম্মদ গাউসের সমাধির পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর অমর প্রতিভার স্পর্শে ভারতীয় সঙ্গীত এক উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিল। চিরাচরিত প্রথাকে ভেঙে তিনি সঙ্গীতের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। অনেকের ধারণা তাঁর সমাধির পাশে যে বৃক্ষটি রয়েছে তার পাতা চিবিয়ে খেলে সুগায়ক বা গায়িকা হতে পারা যায়।

এ কথা সত্য কিনা জোর দিয়ে বলা যায় না, তবে সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই যে এই গাছের পাতা সংগ্রহের জন্য আসেন তা অসত্য নয়। তাই এ কথা সগৌরবে বলা যায়, তানসেন তাঁর অমর প্রতিভার স্পর্শে সর্বকালের সঙ্গীতকার ও সঙ্গীত প্রেমীদের কাছে প্রেরণার প্রতীক হয়ে থাকবেন।

দীর্ঘ বারো বছরেরও বেশী, ১৫৭৪ থেকে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ফতেপুর সিক্রি ভারতের রাজধানী ছিল। আকবর শাহ তাঁর পারিষদ ও সহযোগীদের নিয়ে এখানে রাজ দরবারে বসতেন। অতি সুন্দর এই রাজধানী ঐশ্বর্যে আর সৌন্দর্যে কেমন ঝলমল করত।

কিন্তু কে শোনায় আজ? লাল বেলে পাথরে গড়া স্মৃতি জড়িত ভবনটি ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছে। সে কি কিছু চায়? হ্যাঁ অনুভূতি যার প্রবল, সে বুঝতে পারে তার জীর্ণ ভাষা। সে যেন বলে, ওগো পথিক! চলে যেওনা? একটু দাঁড়াও, কান পেতে শোন আজও সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের সুর ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে রয়েছে চারিদিক——…..।

বঙ্গরাজ বীরবল

—কথাটা কি সত্য নয় ?

—হ্যাঁ এর মধ্যে কোন ভুল নেই।

—তা পণ্ডিত মশাইকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয় ?

—ওরে বাপস্! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে? লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবেন যে ?

—তোর সাহস না থাক, আমার আছে। আমিই প্রশ্নটা করব। সত্যি আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

চুপি চুপি কথা হচ্ছিল লাট্টু আর গণেশ-এর মধ্যে। এ পাঠশালায় তাদের মত অনেকেই পড়ে। কিন্তু পণ্ডিত মশাই-এর সব বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব ওই মহেশ দাস নামে ছেলেটির ওপর। গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। কোনদিনও গুরুমশাইকে এক পয়সার জিনিসও দেয়নি—অথচ টানটা যেন ওরই প্রতি বেশী। এর কারণ ছেলেটির উপস্থিত বুদ্ধি ও মেধা। তা তারই বা কম কিসে ? অন্য ছেলেগুলোও মহেশদাসকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করে। পণ্ডিত মশাই-এর মত তাদেরও ধারণা, ওর মত বুদ্ধিমান ছেলে জগতে দুর্লভ। একমাত্র ওরা দু'জনেই এ মতকে সমর্থন করে না।

—হ্যাঁরে লাট্টু! গণেশের সঙ্গে কি কথা বলছিস ? অঙ্ক কষা হয়ে গেছে তোদের ?

পণ্ডিত মশাই-এর ডাকে চমকে ওঠে দু'জনে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

—অঙ্ক কষা হয়ে গেছে তোদের ? আবার প্রশ্ন করেন তিনি।

—তা কি গল্প হচ্ছিল দু'জনে ? লাট্টু বুঝি পরামর্শ দিচ্ছিল, আমার চোখে ধুলো দিয়ে পাঠশালা পালাবার জন্য।

—আজ্ঞে না। অন্য কথা বলছিল। এবারেও কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দেয় গণেশ।

—সে কথা ত ছুটির পরে বললেও চলত ? পড়তে এসে সেদিকে মন নেই কেন ?

মাথা নীচু করে নেয় গণেশ।

—লাট্টু! তুই দিন দিন ভীষণ অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছিস! আগে দেখতাম পড়াশোনায় যথেষ্ট মন ছিল। এখন দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন ? তোর বাপ কত বড় একজন ধনী ব্যক্তি। এই 'ত্রিবিক্রমপুর' গ্রামে তাঁর কত প্রভাব প্রতিপত্তি। আর তাঁর ছেলে হয়ে তুই এমন হয়ে যাচ্ছিল ?

—এর জন্য ওই দায়ী। বলে মহেশ দাসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে লাট্টু। কথা কয়টি বলতে একটুও কাঁপল না তার স্বর।

ওর কথা শুনে পণ্ডিত মশাই অবাক হয়ে যান। মহেশ দাসও বিস্মিত নেত্রে তাকায়। ছেলেরা কিন্তু মুখ টেপাটিপি করে হাসতে থাকে। কেননা সকলেই জানে লাট্টু ভীষণ হিংসা করে মহেশদাসকে।

—কেন কি করেছে ও ? প্রশ্ন করেন পণ্ডিত মশাই।

—আপনি কেন সবার চেয়ে ওকে বেশী ভালবাসেন ?

—এ একটা কথা হল ? তোরা আমার ছাত্র। তোদের সকলকেই আমি ভালবাসি। ও সব সময় পড়া করে। সেজন্য বকবার দরকার হয় না। আজই ত দেখ—কেউ অঙ্ক করে এখনও দেখালি না। অথচ ও নির্ভুল অঙ্ক কষে এনে দেখাল। এ জন্য তুই হিংসা করছিস ?

—আজ্ঞে আমার বলার উদ্দেশ্য হল, আপনি সব ব্যাপারেই ওর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান। সেদিন বল্লেন—ওর মত উপস্থিত বুদ্ধি আর কারো নেই। আপনিত একবারও পরীক্ষা করে দেখেননি, এ ধরণের বুদ্ধি আমার আছে কিনা।

পণ্ডিত মশাই বিস্মিত নেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বল্লেন—তুই যে এত উদ্ধত হয়ে গেছিস কোনদিনও ভাবতে পারিনি। বেশ আজই তার পরীক্ষা নিচ্ছি।

তারপর দু'টুকরো কাগজে কি যেন লিখলেন। এর মধ্যে একটি লাট্টু আর একটি মহেশদাসের হাতে দিলেন। বল্লেন—ওই যে পূব দিকের মাটির ঘরটা দেখা যাচ্ছে ওখানে তুই যা। আর মহেশদাস যা পশ্চিমের ওই মাটির ঘরটির দিকে। সেখানে গিয়ে চিরকুটটা খুলে পড়বি দু'জনে। তারপর নির্দিষ্ট জিনিসটা নিয়ে আসবি। খবরদার আগে কেউ এটা খুলবি না।

—বেশ! প্রণাম জানায় দু'জনে গুরু মহাশয়কে। তারপর নির্দিষ্ট ঘর দুটোর দিকে এগিয়ে যায়।

............এবার কাগজটা খুলি। কথা ক'টি মনে মনে বলে লাটু। হাসি হাসি মুখে খোলে সেটি। কিন্তু লেখা পড়েই চোখ দুটি কপালে ওঠে। পণ্ডিত মশাই নির্দেশ দিয়েছেন, আগুন চাই, কিন্তু কোন পাত্রে বহন করে আনা চলবে না।

—এ আবার কি ধরণের আদেশ! আমাকে জব্দ করতে চান? কিন্তু মহেশ দাস কি সফল হবে এ কাজ করতে? শুধু হাতে আগুন নিয়ে কেউ যেতে পারে? আজই বাবাকে গুরুমশাই-এর বিরুদ্ধে বলতে হবে। উনি আমার হাতের চেটো পুড়িয়ে দিতে চাইছেন। রাগে লাল হয়ে ওঠে লাটুর ফর্সা মুখখানি।

—কি গো, কি ভাবছ?

সুবলের গলায় আওয়াজ কানে যেতেই চমকে তাকায় লাটু। মহেশ দাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু সে।

—একি তুই এখানে?

—গুরু মশাই তোমার পেছনে আমাকে আর মহেশদাসের পেছনে গণেশকে পাঠালেন।

—কেন?

—যদি তোমরা অন্য কারো বুদ্ধি নাও? সেজন্য ঠিক বেছে বেছে আমাদের দু'জনকে দু'জনের পেছু নিতে বলেছেন।

—যাচ্ছি। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি মহেশদাসও পারবে না এ কাজ করতে।

—গুরু মশাই কি কাজ দিয়েছেন আমরা অবশ্য জানি না। তিনি জানতে চাইতে বারণও করেছেন। বলেছেন, ফিরে গেলে বলবেন। তাই আর দেরী না করে চল। সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। বলে সুরেশ।

—হ্যাঁ চল।

.........ফিরে এল লাটু আর সুবল।

—আজ্ঞে না। এ অসম্ভব নির্দেশ কারো পক্ষেই পালন করা সম্ভব নয়।

ঠিক সেই সময় মহেশ দাস এল। আর তার পেছন পেছন গণেশ। হাসি হাসি মুখে সে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল গুরুমশাই-এর সামনে। হাতের চেটোর মধ্যে রয়েছে আগুন। আনন্দে গুরুমশাই-এর চোখে জল এসে যায়। এবার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন যা লিখেছিলেন কাগজ দু'টিতে। সকলে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে মহেশদাসের দিকে।

—নে বাবা এটা ওপাশে ফেলে দিয়ে সকলকে বল্‌ কিভাবে আমার নির্দেশ পালন করলি।

গুরু মশাই-এর আদেশ পেয়ে হাতের আগুন ফেলে হাত ধুয়ে নেয় সে। তারপর তাকে প্রণাম জানিয়ে বলে—চিরকুটটা পড়ে ভাবলাম কি করে এ আদেশ পালন করি? তারপর চট্‌ করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি হাতভর্তি করে ছাই নিলাম, তারপর আগুন চেয়ে চলে এলাম এখানে।

—বাঃ! জড়িয়ে ধরলেন তাকে গুরুমশাই।

—তোর চোখে জল কেন লাটু? তুই কেন ব্যথা পাচ্ছিস? সন্দেহে প্রশ্ন করলেন গুরুমশাই।

—দুঃখে নয় গুরুমশাই, আনন্দে। আজ আপনার সামনে, সকলের সামনে আমি মহেশদাসের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছি। আজ থেকে ও হল আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমাদের এ বন্ধুত্ব যেন চিরদিন থাকে। এবার গুরুমশাই-এর চরণ তলে এসে পড়ে লাটু।

গভীর স্নেহে তাকে তুলে ধরেন গুরুমশায়। বলেন—যা ঘরে গুরু-মার কাছ থেকে লাড্ডুর হাঁড়িটা চেয়ে নিয়ে আয়। তুই নিজে আগে মহেশ দাসকে খাইয়ে দে, তারপর সকলকে খাওয়া। আর মহেশদাস খাইয়ে দেবে তোকে।

গুরুমশাই-এর নির্দেশ পেয়ে আনন্দে লাটু ভেতরে চলে যায় লাফ্‌ মেরে আর ছেলেরা উল্লাস ধ্বনি করে ওঠে।

দেখতে দেখতে কেটে গেছে বেশ অনেকগুলি বছর। সেদিনের বালক মহেশদাস কিশোর অতিক্রম করে সবে যৌবনে পদার্পণ করেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের কিশোরী মেয়ে সুনয়না তার ঘরে বৌ হয়ে এসেছে। ছয়মাস হলো একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের। মেয়ের নাম রক্ষিতা। সব দিক দিয়ে সুখী মহেশদাস। শুধু অভাব অর্থের। এত প্রতিভা রয়েছে তার মধ্যে, অথচ আর্থিক ব্যাপারে তেমন কোন সুরাহা হচ্ছে না।

—বাবা কি বলছিলেন, জানিস?

—কি?

—বলছিলেন ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা যার মধ্যে রয়েছে, সে কোন্‌ দুঃখে এই ত্রিবিক্রমপুরে পড়ে রয়েছে? ওর উচিত আগ্রায় গিয়ে সম্রাট আকবরের সঙ্গে দেখা করা। তোর লেখা কবিতাগুলো বাবা পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন।

—কবিতাগুলো ওনাকে দেখিয়েছিস নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তুই যে বল্‌লি, তুই পড়বি ?

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছি। আমার পড়ে খুব ভাল লেগেছে বলে বাবাকে পড়ালাম। শুধু বাবা নন, আরেকজনও তোর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছে।

—কে ?

—আমার স্ত্রী হেমলতা।

পথ চলতে চলতে কথা হচ্ছিল মহেশদাস আর লাট্টুর মধ্যে। ছোটবেলায় সে ঘটনাটি পাঠশালায় ঘটে যাবার পর থেকে আর তার মধ্যে শত্রুতাভাব নেই। এখন লাট্টু প্রাণ দিয়ে ভালবাসে মহেশদাসকে। সব সময় চেষ্টা করে, কেমন করে মহেশদাসের প্রতিভার বিকাশ সাধন হবে। শুধু তাই নয়, তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনরকম জটিলতা দেখা দিলে সে ছুটে আসে মহেশদাসের কাছে। যদিও বয়সে সে তার থেকে প্রায় তিন বছরের বড় কিন্তু দারুণ ভক্তি করে সহপাঠী মহেশদাসকে। তার নিজের একটি ছেলে আছে। এখন তার বয়স সাত বৎসর। স্থির করে রেখেছে, মহেশদাসের কন্যাকেই সে নিজের ছেলের বৌ করে আনবে।

—বৌরাণীকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানালাম।

—বেশ। কিন্তু সম্রাটের দরবারে যাবার কি ব্যবস্থা করলি ?

—তুই বলছিস ?

—হ্যাঁ। আমার মন বলছে তোর মত ব্যক্তি সেখানে যোগ্য সমাদর পাবে।

—একাই যাব ?

—হ্যাঁ। তারপর অবস্থা বুঝে পরিবার নিয়ে যাবি।

—তাই করব লাট্টু। দেখি তোর শুভেচ্ছা আমাকে কতখানি সফলতার পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

—অস্তগামী সূর্যের দিকে একবার চেয়ে দেখ মহেশদাস। মহেশদাস তাকায়, বলে—বাঃ! কি সুন্দর। চারিদিক লাল আভায় ছেয়ে গেছে।

—তিনিও তাঁর আশীর্বাদ জানাচ্ছেন তোকে।

—হ্যাঁ। আমিও অন্তরে কোথাও যেন সাড়া পাচ্ছি। আগামীকাল প্রভাতেই যাত্রা শুরু করব।

—কিন্তু সম্রাট আকবরের সভায় তোর নাম হবে বীরবল।

—বীরবল। সে ত এখানকার গুণী সমাজের দেওয়া উপাধি!

—হ্যাঁ সেই নামই বলবি তুই সেখানে।

—তাই হবে লাট্টু। দেখি বীরবল নামের শক্তি কতখানি?

—আমাদের শুভেচ্ছা ব্যর্থ হবে না। এক চোখে হাসি, এক চোখে জল লাট্টুর

—আমার সভায় প্রচুর গুণী ব্যক্তি রয়েছেন। তবে তোমাকে আমি ফেরাব না। যদি তোমার মধ্যে সভ্যকাবের যোগ্যতা থাকে, অবশ্যই স্থান পাবে এ দরবারে। অভিবাদন জানিয়ে নিজের প্রার্থনা জানাবার পর আকবর কথা কয়টি বললেন।

—বেশ। পরীক্ষা নিন।

—পরীক্ষা! এখনই? হা হা করে হেসে উঠলেন সম্রাট।

—তোমার লেখা কবিতাগুলো অবশ্যই শুনব। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও ত?

—প্রশ্ন করুন জাঁহাপনা।

—বেশ! বলত মৃত্যুর পর কে স্বর্গে যায় আর কার স্থান নরকে হয়?

সভাসদ্‌রা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে থাকে। কেননা একটু আগেই সম্রাট এ প্রশ্নটি তাদের সম্মুখে রেখেছিলেন। তার মধ্যে দু' তিন-জন উত্তরও দিয়েছেন। তবে কি তা সম্রাটের মনঃপুত হয়নি?

—না, সত্যি কারো জবাব আমার মনঃপুত হয়নি। এবার সভাসদ্‌দের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলেন সম্রাট। তারপর নবাগত বীরবলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। তাঁকে বলেন—এঁদের মধ্যে অনেকের ধারণা ভালকাজ করলে স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়। সেখানে মানুষ খুব সুখে বাস করে। আর পাপ কাজ করলে স্থান হয় নরকে। সেখানে অতি দুঃখে তার দিন কাটে। কিন্তু যতক্ষণ না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত সে কথার সত্যতা বিচার করব কেমন করে? তাই তোমার কাছেই প্রশ্নটা রাখছি। দেখি তোমার কি মত?

—জাঁহাপনা! কথাটা ঠিকই বলেছেন। মৃত্যুর পূর্বে আমরা এ বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলতে পারিনা। তবে কথাটার যখন প্রচলন আছে, তখন অবশ্যই এর অন্তর্নিহিত একটা ব্যাখ্যা আছে। সেটা হল, এই পৃথিবীর মধ্যেই রয়েছে স্বর্গ ও নরক। রিপুর তাড়নায় মানুষের বিবেক বিবেচনা যখন লোপ পায় তখনই নানাধরণের অপ্রীতিকর, অপরাধ-

মূলক কাজ করে ফেলে সে। এর শাস্তি এ পৃথিবীতে বসেই সে পায়। হয় সম্রাট তার শাস্তির ব্য·স্থা করেন, আর তা নয় বিবেকের দংশনে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে নিজের মৃত্যুকে নিজেই টেনে নিয়ে আসে। যারা এ ধরণের কু-কাজ করে ইহলোক ত্যাগ করে, তাদের জন্য চোখের জল ফেলার থাকে না কেউ, হয়ত তাদের মৃত্যুটাই মানুষের কাম্য থাকে, সেটাই হল তার নরকবাস। আর স্বর্গ? সত্যি বড় সুন্দর এর ব্যাখ্যা। প্রেম, প্রীতির পুণ্য বাঁধনে আমরা যখন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে বেঁধে ফেলতে পারি, অপরের উপকারের জন্য স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করে কল্যাণমূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, তখন এক অনাবিল আনন্দে, অপরিসীম পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে যায় অন্তরটা। হৃদয়ের এ অনুভূতির কোন মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, এটাই তার পরম পাওয়া। এ ধরণের মানুষ পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকে। রক্তমাংসের শরীরটার ত ক্ষয় হতে হতে একদিন শেষ হয়েই যায়, কিন্তু মানুষের অন্তরে চিরদিন সে বেঁচে থাকে। দিনের পর দিন চলে যায়, বছরের পর বছর চলে যায়, এমন কি যুগের পর যুগ চলে যায়, তবুও মানুষের স্মৃতিতে সে চির উজ্জ্বল অমর হয়ে থাকে। সেখানেই হয় তার স্বর্গলাভ। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন আপনার পিতা সম্রাট হুমায়ুনের কথা। তাঁর মহত্বের তুলনা নেই। অসময়ে নদীবক্ষ থেকে ভিস্তিওয়ালা তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিল তাই সিংহাসনে বসবার পর কিভাবে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করলেন। ভিস্তি-ওয়ালা সম্রাটকে জব্দ করবার জন্য তাঁর প্রাণরক্ষার বিনিময়ে সিংহাসন চাইল—আর কত সহজে সম্রাট সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে সেখানে বসালেন তাকে। শুধু একদিনের তরেই সে সিংহাসনে বসেছিল, পরদিন নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে সম্রাটকে তাঁর সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়েছিল। কেন? সম্রাটের মহত্বের পরিচয় পেয়ে। আজ একথা সকলেরই মুখে মুখে ফিরছে। শুধু আজ নয়, এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে সম্রাট হুমায়ুন চিরদিন চিরকাল বেঁচে থাকবেন। এখানেই হয়ে গেছে তাঁর স্বর্গ লাভ।

—বাঃ! তুমি ত বড় সুন্দর কথা শোনালে?

সিংহাসন থেকে উঠে এলেন সম্রাট। নিজের গলার মুক্তোর মালাখানি পরিয়ে দিলেন তার গলায়।

সভাসদরা স্তম্ভিত। এত সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে দিয়ে বোঝানো সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। চিরদিন যা তারা শুনে এসেছে সেটাই ব্যাখ্যা করেছে সম্রাটের কাছে।

—তোমার আজ থেকে এ সভায় যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে স্থান হয়ে গেল। তুমি আজ থেকে আমার একজন পরামর্শদাতা হলে। যে কথা আমার অন্তরের অন্তস্থলে ছিল, অথচ প্রকাশের ভাষা ছিল না, তুমিই তার সত্য রূপটা যুক্তি সহাকারে প্রকাশ করলে। তোমায় পরামর্শদাতা পেয়ে ধন্য আমি। সত্যি বড় আনন্দের দিন আজ আমার।

—জাঁহাপনা! আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। অভিবাদন জানিয়ে চারজন লোক বক্তব্যটা রাখে।

—কিসের আর্জি?

—জী, কাকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কোন জিনিসই ঘরে উঠোনে বা বাইরে রাখার উপাই নেই। সব কিছুই ওরা মুখে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে লোকসান হলে বড় মুস্কিলে পড়ে যাব।

—তাহলে তোমাদের অভিযোগটা কাকের বিরুদ্ধে?

—জী। এ অভিযোগ শুধু আমাদের নয়। দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলের মুখপাত্র হিসাবে আমরা এসেছি। সভায় একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল।

—কি ব্যাপার! ওখানে কিসের আলোচনা চলছে? প্রশ্ন করলেন সম্রাট।

প্রধান মন্ত্রী এগিয়ে এলেন। সভার দিকে ফিরে বল্‌লেন—আপনারা কি বলতে চাইছেন?

একজন এগিয়ে এল। তারপর সম্রাটকে অভিবাদন করে বল্‌ল—আমাদেরও কাকের সম্বন্ধে অভিযোগ রয়েছে জাঁহাপনা। কাকের দৌরাত্ম্যে সকলে পাগল হয়ে যেতে বসেছি। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। বল্‌লেন আগ্রাবাসী একজন।

—ও! তাহলে সবারই এক অভিযোগ। বেশ আমি চিন্তা করছি।

সকলে অভিবাদন জানিয়ে নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে বসল।

—মন্ত্রীবর! আমি ভাবছি, দিল্লিতে কত সংখ্যায় কাক আছে তার একটা হিসাব নেওয়া দরকার। পরে আগ্রার কাক সংখ্যা গণনা করাচ্ছি।

—গোস্তাকি মাপ করবেন। সেটা কী সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয়? বেশ বীরবলকে ডাকুন ত।

বীরবল এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালেন।

—তুমি এই কাজের ভারটা নাও। পারবে কী?

—জী পারব।

স্বয়ং সম্রাট এবং সভার সকলে বিস্মিত হয়।

—পারবে কাকের সংখ্যা গুণতে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন সম্রাট।

—সে কাজটা অতীতেই করে রেখেছি। অর্থাৎ কাকের হিসেব অনেক আগে থেকেই আমার নেওয়া আছে।

—কি রকম?

—জী দু'জায়গাতেই ওদের সংখ্যা হলো ষাট হাজার পাঁচশো বাহান্ন। একেবারে পাকা হিসেব।

—কেমন করে হিসেব নিলে? যদি কম বেশী হয়?

—হতেই পারে সম্রাট। যদি বেশী হয় তবে বুঝতে হবে বাইরের থেকে ওদের আত্মীয় বন্ধুরা এসে ওদের কাছে আতিথ্য নিয়েছে। আর যদি কম হয়, বুঝতে হবে, ওরা গিয়েছে বিদেশে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে।

হো হো করে অট্টহাসিতে সভা ফেটে পড়ল। স্বয়ং সম্রাট হাসতে হাসতে উঠে এসে বীরবলকে আলিঙ্গন জানালেন। বললেন—আজ থেকে শুধু পরামর্শদাতা নয় বিদূষকের শ্রেষ্ঠ আসনটিও তোমার জন্য সংরক্ষিত রাখলাম। এবার বল, তোমার কিছু আর্জি আছে কিনা।

—জী আছে।

—বল, বল। আগ্রহ প্রকাশ পায় সম্রাটের কণ্ঠে।

—আমার পরিবারকে নিয়ে আসতে চাই। তাই কয়েকদিনের ছুটি যদি মঞ্জুর করেন।

—বহুত আচ্ছা। সাত দিনের ছুটি দিলাম।

—আপনার মেহেরবানির কথা ভুলব না। তসলিম জানায় বীরবল।

—ঠাকুর! আপনি আমাদের বাঁচান। দু'জন গায়ক এসে কেঁদে পড়ল বীরবলের পায়ে।

—কে তোমরা?

—আপনি আমাদের চেনেন না। কিন্তু আপনার কথা আমরা সব জেনেছি। বড় বিপদ আমাদের।

—কি ব্যাপার বলত?

—আমি এখানে আসার আগে একবার সম্রাটের দরবারে আমরা গিয়েছিলাম কিছু পাবার আশায়।

—তা কি করলে গিয়ে?

—আমরা গান শোনালাম। বলল একজন।

—সম্রাট নিশ্চয় পুরস্কৃত করেছেন তোমাদের?

—করেছেন। গরীব মানুষ দুটোকে উপযুক্ত পুরস্কারই দিয়েছেন। দু'জনকে দুটো হাতী দিয়েছেন।

—হাতী! কেন?

—সম্রাটের খেয়াল। বললেন, এমন সুন্দর গলা তোমাদের। সেজন্য টাকা পয়সা দিয়ে ছোট করলাম না। এই হাতী দুটোই উচিত পুরস্কার হল।

—তারপর?

—তারপর আর কি! রাজকীয় দানের অমর্যদা করতে পারলাম না বলে নিয়ে এলাম সে দুটোকে।

—হাতী দুটো কোথায়?

—আমাদের কাছেই আছে। কিন্তু ও দুটোকে পুষতে গিয়ে আমরা আমাদের সর্বস্ব খুইয়েছি। আমাদের পরিবারেরা এখন না খেয়ে মরতে বসেছে। কথা কয়টি বলতে বলতে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল অপর ব্যক্তিটি।

—আপনি বলে দিন, কি উপায়ে হাতির হাত থেকে রেহাই পেতে পারি? প্রথম ব্যক্তিটিও কাঁদতে কাঁদতে বলে।

—তাইত চিন্তার কথা। বীরবল একটু চিন্তা করলেন তারপর বললেন, একটা কাজ কর। হাতি দুটোর গলায় এমন কায়দায় একটা মস্ত ঘন্টা ও জয়ঢাক বেঁধে দাও যাতে ওরা হাঁটতে গেলেই খুব আওয়াজ হয়। তারপর কিছু খেতে না দিয়ে পথে পথে ঘুরতে ছেড়ে দাও। এই বলে কানে কানে আরো অনেক কিছু বললেন।

—বাঁচালেন আমাদের। হাসিমুখে চলে গেল তারা।

—জাঁহাপনা, এরাই হল হাতীর মালিক। আপনার আদেশে ধরে এনেছি ওদের।

সম্রাট তাকালেন ওদের দিকে। ভ্রু দুটি কুঁচকে উঠল।

—জান কি অন্যায় করেছ তোমরা?

—জী নেহি।

—জান না? রেগে উঠলেন সম্রাট।

—তোমাদের আমি শূলে চড়াব। কোন্ সাহসে তোমরা দুটো পাগলা হাতীকে শহরে ছেড়ে দিয়েছ? তোমরা জান আজ ওদের অত্যাচারে শহরের অধিবাসীরা ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গেছে? ওদের কান্নাকাটি সহ্য করতে পারছি না আর।

—জাঁহাপনা! আমাদের হাতী পাগলা হবে কেন? আপনি ভুলে গেছেন আমাদের গান শুনে প্রীত হয়ে ও দুটো ত আপনিই আমাদের উপহার দিয়েছেন বেশ অনেকদিন আগে।

—তা ও দুটোকে রাস্তায় ছাড়লে কেন?

—হুজুর! বহুদিন ওদেব প্রতিপালন করেছি, বাদ্যযন্ত্রে শিক্ষাদান করেছি। এখন ওরা বেশ পারদর্শী হয়ে ওঠাতে আপনার এই বিশাল সাম্রাজ্যে ছেড়ে দিয়েছি। ওরা এবার জনসাধারণকে বাদ্যযন্ত্র শুনিয়ে নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা নিজেরাই করুক।

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন সম্রাট। হেসে উঠলেন সভাসদ্‌রা।

সম্রাট তাকালেন বীরবলের দিকে।

—আর ভাল মানুষের মত মুখ করে বসতে হবে না বীরবল। বুঝতে পারছি ওদের এ বুদ্ধিটি দিয়েছে কে? সত্যি আমারই ভুল হয়েছিল ওদের আমি দুখানি মোজা দান করছি।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওটে গায়ক দুজনের মুখ। বীরবলের প্রতি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অভিবাদন জানায় সম্রাটকে। বীরবব শুধু মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

সম্রাট সেদিন যমুনার তীরে তাঁর সুন্দর উদ্যানে বসে অস্তগামী সূর্যের শোভা দেখছিলেন এক দৃষ্টিতে। সম্রাটের আহ্বানে বীরবল এসে বসল তাঁর পাশে।

—কয়েকদিন থেকেই একটা কথা ভাবছি। একটা প্রশ্ন আর কি।

—সেটা কি, বলুন হুজুর?

—আমার বিশ্বাস, এবার তুমি ঘাবড়ে যাবে।

—তা হয়ত যেতে পারি, তবুও প্রশ্নটা করেই দেখুন না?

—হেরে গেলে কিন্তু আগামীকাল সভাস্থলে সকলকে সে কথা বলে দেব।

—অবশ্যই দেবেন। আর দিতে গেলে?

—সে কথাও সগর্বে ঘোষণা করব।

—এবার বলুন আপনার প্রশ্নটা।

—সূর্যের আলোয় সব জিনিষই দেখা যায়, কিন্তু বলতে পারো, এমন কোন বস্তু আছে যা সূর্যের আলোতেও দেখা যায় না?

—উপযুক্ত সময়েই প্রশ্নটা করেছেন। এক্ষুনি সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যাবে, চারিদিক অন্ধকারে ভরে যাবে।

—তাতে কি?

—বাঃ! আপনার প্রশ্নের উত্তরই ত এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন সম্রাট। সত্যি তুমি বুদ্ধিমান।

—জাঁহাপনা, এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?

—অবশ্যই।

—সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে মুখ লুকায় কেন?

—এ আবার কি প্রশ্ন হল? রেগে উঠলেন সম্রাট।

—রাগ করছেন কেন দিন না এর উত্তরটা?

—আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।—তোমার মত কোন নিবোধের কাছে যাও জবাব পেয়ে যাবে। রাগতভাবে বললেন সম্রাট।

—সে জনাই ত আপনার কাছে এলাম।

—সত্যি বীরবল অবাক করলে তুমি? হাসিতে ভরে উঠল সম্রাটের মুখ।

আপনি কিন্তু একই সময়ের মধ্যে আমাকে 'বুদ্ধিমান' ও 'নির্বোধ' এই দুটি আখ্যায় ভূষিত করেছেন? কপট অভিমান প্রকাশ পায় বীরবলের কণ্ঠে।

—হ্যাঁ করেছি। তার জন্য রাগ করছ নাকি? সত্যি তোমার সঙ্গে পারিনা। আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আর এর জন্য তোমাকে শিগ্রীরই একটা জায়গীর দান করছি। বল আর রাগ নেই ত?

—ছিঃ ছিঃ! এ কথা বলে অধীনকে আর লজ্জা দেবেন না। চলুন এবারে ওঠা যাক।

—হ্যাঁ চল।

বাগান দিয়ে আসছিলেন তাঁরা। হঠাৎ সম্রাট আরেকটি প্রশ্ন করলেন বীরবলকে।

—কোন ফুলে মৌমাছি বসে না বলতে পার?

—চাঁপা ফুলে।

—কেন ?

—ওর গন্ধ যেমন মিষ্টি, তেমন কড়া। মৌমাছি বসলে অলে অলে পুড়ে পালায়। ফুলের জগতে যেমন চাঁপা, বাদশাহ সুলতানের জগতে তেমন আপনি।

সম্রাট ভারী খুশী হয়ে আলিঙ্গন করলেন বীরবলকে।

—এস এস বীরবল। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এইমাত্র মিঞা তানসেন গীত পরিবেশন করলেন।

—জী পথ দিয়ে আসতে আসতেই ওনার প্রাণ মাতানো সুর আমার কাণে এসে পৌঁছেছে।

সম্রাটকে কুর্ণিশ জানিয়ে কথা কয়টি বলেন বীরবল।

—আজ তোমার আসতে এত দেরী হল কেন ? জানো তো সারাদিনের ঝামেলার পর সন্ধ্যার অবকাশে তানসেনের সংগীত আর তোমার হাস্য-রসের কাহিনী না শুনলে বড় অতৃপ্তি বোধ হয় ? বীরবল সে কথার উত্তর না দিয়ে বলেন—জাঁহাপনা, আপনি আমবিহীন আমের স্বাদ গ্রহণ করেছেন ?

—সে আবার কী ?

—এ কথা তো আপনার আরো ভাল করে জানা দরকার। কেননা পারস্য দেশেই ঘটনাটা ঘটে।

—কি ঘটনাটা ? শিগ্রী বল। শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।

—বহুকাল আগে পারস্য দেশের সুলতান তাঁর সভাসদ্‌দের কাছে একটি প্রশ্ন রাখলেন। প্রশ্নটা—পৃথিবীর মধ্যে কোন্ ফল সব চেয়ে সুস্বাদু ? সুলতানের প্রশ্ন শুনে সভাসদ্‌রা আঙ্গুর, আপেল, খেজুর ইত্যাদির নাম করল। কিন্তু উজীর নীরব রইলেন।

—এ বিষয়ে উজীর সাহেবের কি মত ? সুলতান প্রশ্ন করলেন তাঁকে।

—জাঁহাপনা ভারতবর্ষে 'আম' নামে একটা ফল আছে। সৌভাগ্য বশতঃ কোন এক সময়ে সে ফলের আস্বাদ গ্রহণ করবার সুযোগ আমার এসেছিল। কি অপূর্ব যে তার স্বাদ, বোঝাতে পারব না। এখনও মনে হয় তা যেন জিভে লেগে আছে।

—কিন্তু এখানে কোথায় পাব সে ফল ?

—আপনি অনুমতি দিলে নিয়ে আসতে পারি।

—ভারতবর্ষে যাবে তুমি? কিন্তু ততদিন ফলগুলো কি ঠিক থাকবে?

—আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া থাকতে কোন চিন্তা নেই। আর ফলগুলো সে রকম ব্যবস্থা করেই নিয়ে আসব। তবে একটি দুটি হয়ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

—তাহলে আগামীকালই রওনা হয়ে পড়। ফিরতে দেরী করোনা।

—বহুত মেহেরবাণি আপনার। কুর্ণিশ জানিয়ে বিদায় নেন উজীর সাহেব।

এরপর ভারতবর্ষে এসে মনের আনন্দে তিনি নানা ধরণের আম খেলেন তারপর তিনঝুড়ি আম নিয়ে চললেন পারস্যের পথে। রাস্তা দিয়ে চলতে আমের মন মাতানো গন্ধে উজীর সাহেব লোভ সম্বরণ করতে পারলেন চলতে না। একটা ঝুড়ি থেকে দুটো আম নিয়ে খেয়ে নিলেন। চিন্তা করলেন কে আর টের পাচ্ছে? পরদিন অনুরূপ চিন্তা করে আবার দুটো আম খেয়ে নিলেন। পরদিন আবার দুটো, তারপর দিন আবার দুটো, পরদিন আরো। আমফল তাঁকে এমন পাগল করে দিল তিনি ভুলেই গেলেন কার জন্য কি উদ্দেশ্যে তিনি এ-ফল নিয়ে যাচ্ছেন।

অবশেষে পারস্যে এসে পৌঁছালেন। কিন্তু তার আগেই টের পেয়ে গেলেন তিনটি ঝুড়িই শূন্য হয়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। এবার আর প্রাণে বাঁচার আশা নেই। শুষ্ক মুখে উজীর সাহেব নিজ অট্টালিকায় ফিরে এলেন। স্ত্রী ও কন্যা তাঁকে দেখে আনন্দে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল। কিন্তু উজীর সাহেবের মুখের চেহারা দেখে চিন্তিত হলেন তাঁরা। পরে সব শুনে স্ত্রী কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। মেয়ে কিন্তু দারুণ বুদ্ধিমতী। সে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার সুন্দর মুখখানি। এগিয়ে এল পিতার কাছে। তারপর উজীর সাহেবের কানে কানে কি যেন বলল। মেয়ের কথা শুনে আনন্দে লাফ দিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, সাবাস্ এই না হলে আমার বেটি!

এরপর উজীর সাহেব সুগন্ধি জলে স্নান সেরে উত্তম পোশাক পরে দরবারে এলেন। তাঁকে দেখে সুলতান আনন্দ প্রকাশ করলেন। তার পর বললেন—কই হে, তোমার আমফল কোথায়?

—চিন্তা করবেন না হুজুর। সে ফলের স্বাদ এক্ষুনি গ্রহণ করাচ্ছি।

—কিন্তু ফল কোথায়?

—জাঁহাপনা, আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল আমফলের স্বাদ

গ্রহণ করাব, তা ফল দিয়ে কি প্রয়োজন ?

—এ আবার কি ধরণের কথা ? ফলবিহীন ফলের স্বাদ গ্রহণ করব কেমন করে ?

উজীর সাহেবকে দরবারের সকলে ভালবাসত। কিন্তু তাঁর মুখে এ ধরণের কথা শুনে তারাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবল মাথার কোন গোলমাল হয়নি তো তাঁর ?

—উজীর সাহেব! গম্ভীর কণ্ঠে সুলতান ডাকলেন।

—হুকুম করুন।

—আমি ফল আনবার জন্য তোমাকে ছুটি দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তোমার কথামত কাজ করনি তাই তোমার গর্দান নেবার ব্যবস্থা করছি।

—আপনি যখন সুলতান, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু পূর্বে আমার অন্তিম কামনা পূরণ করুন। তারপর আজই শূলে দেবার ব্যবস্থা করুন।

—বটে! কি তোমার অন্তিম কামনা ?

—আপনার বান্দাকে বলুন, আমার জন্য কিছুটা পাকা গোলা তেঁতুল আর ঝোলাগুড় এনে দিতে। ঝোলাগুড় যেন একটু বেশী করে নিয়ে আসে।

—এ আবার কি উদ্ভট খেয়াল! কি করবে এ দিয়ে ?

—সুলতান! কিছু জানতে চাইবেন না। আমার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করুন।

—বেশ! তাই হোক। সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের নির্দেশে পাকা তেঁতুল গোলা আর ঝোলাগুড় এসে গেল।

উজীর সাহেব দুটো একত্র করে একটা পাত্রে খুব ভালো করে মাখলেন ও-দুটিকে। তারপর নিজের লম্বা দাড়িতে ওগুলো দু'হাত দিয়ে চেপে চেপে লাগালেন।

সভার লোক বিস্মিত। স্বয়ং সুলতানেরও সন্দেহ হল, উজীর সাহেব সুস্থ আছেন কিনা।

এবার হাসি হাসি মুখে উজীর সাহেব সম্রাটের কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন—মেহেরবানি করে এবার আমার দাড়িটা চুষুন।

—কি এত বড় আস্পর্ধা ? রাগে লাফ দিয়ে উঠলেন সুলতান।

—স্পর্ধার মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। রাগে রক্তবর্ণ হয়ে গেছে সুলতানের মুখ।

—কে আছিস একে নিয়ে যা এখান থেকে। এক্ষুনি শূলে চড়িয়ে দে। মুখ দেখতে চাইনা এর।

—আর কিছুক্ষণ পরে এ দুনিয়া থেকে চলেই যাচ্ছি। কোনদিনও আর ছোটবেলার এ সঙ্গীটির মুখ দেখতে হবে না। কিন্তু তার আগে মৃত্যুপথযাত্রী এ মানুষটির সাধ পূরণ করবেন না? প্রত্যেক দেশেই কিন্তু এ নিয়ম আছে।

—কি মুস্কিল! এ আবার কি ইচ্ছে তোমার?

—এটাই আমার অন্তিম বাসনা, সুলতান।

—কই দেখি এগিয়ে এস। বিরক্তিতে ভরে গেছে সুলতানের মুখ।

একটু হেসে সুলতানের মুখের সামনে নিজের দাড়ি এগিয়ে দিলেন উজীর সাহেব। সুলতান ঘৃণাভরে চুষলেন। আবার চুষলেন, আবার, আবার। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ থেকে বিরক্তির ভাবটা কেটে গেল। বরং দেখা গেল তিনি উজীর সাহেবের দাড়ি চুষেই চলেছেন। সভার লোকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে ততক্ষণে।

—জাহাঁপনা! এবার মুখ সরান। দাড়িতে আর কিছু নেই। তাড়াতাড়ি লজ্জা পেয়ে সুলতান মুখটি তুলে নেন।

—হুজুর এবার বলুন, যা চুষলেন তার স্বাদটি কেমন?

—খুব ভাল লাগল। বেশ টক্‌টক্‌ মিষ্টি মিষ্টি আবার আঁশ আঁশ। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন সুলতান।

—এটাই হল আমের স্বাদ। এরপরেও যদি ইচ্ছে থাকে শূলে চড়াতে পারেন। তবে আমি আমার কথা রেখেছি। আমের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি।

সুলতান জড়িয়ে ধরলেন উজীর সাহেবকে।—বাবাঃ! কি বুদ্ধি তোমার। এখনও সেই ছোটবেলার মত দুষ্টু আছ? সভার সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। বীরবল শেষ করলেন তাঁর গল্প।

সভার মধ্যে তখন হাসির ঝরণা ঝরছে। শ্রোতারা সকলে হেসে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। কারো হাসি যেন থামতেই চায় না। হাসতে হাসতে কেউ গড়াগড়ি যাচ্ছে, কারও বা হাসির দমকে চোখ দিয়ে জল বার হয়ে এসেছে, কেউ বা অপরের দাড়ির কাছে মুখ নিয়ে চোষার ভাণ করছে। স্বয়ং আকবর জড়িয়ে ধরলেন বীরবলকে। প্রেম পূর্ণ কণ্ঠে বললেন—সুলতানের উজীরের থেকে তুমিও কিছু কম নও। দেখো আবার এ ধরণের বাধ্য বাধকতার মধ্যে আমাকে কিন্তু ফেল না। বলে শিশুর মত সরল হাসি হাসতে লাগলেন।

—কি গো ! সম্রাট তোমাকে বলেছিলেন না একটা জায়গীর দেবেন ?

—হ্যাঁ তা বলেছিলেন।

—কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি ভুলে গেছেন ?

—তাই মনে হচ্ছে।

—তুমি সম্রাটকে মনে করিয়ে দিচ্ছনা কেন ?

—করাব, যখন সময় হবে।

—তোমাকে তো চিনি, তুমি মুখ ফুটে কিছুতেই তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে দেবে না ?

—তাহলে বলতে হবে এতদিন ঘর করেও আমাকে চেনে নি। মুখ ফুটে পূর্বপ্রতিশ্রুতির কথা জানাব না ঠিকই, কিন্তু সুযোগ আসলে ঠিকই এ কথা কৌশলে স্মরণ করিয়ে দেব।

কথা হচ্ছিল বীরবল ও সুনয়নার মধ্যে।

—আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। এবার দরবারে যাই ?

—হ্যাঁ যাবে বৈকি। সুনয়নার কণ্ঠ একটু ভার ভার।

হেসে বীরবল বার হয়ে গেলেন।

রাজ দরবারে পৌঁছে দেখেন, সম্রাট আজ একটি প্রশ্ন রেখেছেন সভাসদদের সামনে। প্রশ্নটা, তিনি বড় না স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র বড় ?

সকলেই আড়ষ্ট। দেবরাজকে বড় বললে সম্রাট হবেন অসন্তুষ্ট, আবার সম্রাটকে বড় বললে সেটাকে চাটুবাক্য শোনায়। তাই সকলে বড় বিপন্ন।

কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না দেখে সম্রাট বীরবলের দিকে তাকালেন। বীরবল হেসেই খুন।

—হাসছ কেন বীরবল ? আমি কি নির্বোধের মত প্রশ্ন করেছি ?

—এ আপনি কি বলছেন ? আমি হাসছি লোকের ধারণা দেবরাজ বড়, কিন্তু এ কথা বলে কেউ আপনার বিরাগ ভাজন হতে চাইছে না দেখে।

—সত্যি কি তিনি বড় নন ?

—না আপনিই বড়।

এ কথা শুনে সভায় অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল।

—কেমন করে ? আবার সম্রাটের প্রশ্ন।

—লোকে দেবরাজকে চোখে দেখেনি, তাই তাঁকে বড় বলে। আসলে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আপনাদের দু'জনকে একই দাঁড়ি পাল্লায় তুলেছিলেন

আপনি অনেক ভারী, তাই ঝুলে পড়লেন পৃথিবীতে। পৃথিবীর সম্রাট আপনি।

এবার সভায় আনন্দসূচক ধ্বনি উঠল। কেন না প্রত্যেকেই বুঝতে পারলেন, উপস্থিত বুদ্ধি বলে বীরবল দেবরাজ ইন্দ্রকে উচ্চাসনেই রেখে দিলেন।

—এস বীরবল এই গাছটার তলায় একটু বসি।

—অবশ্যই। ঘোড়া থেকে নামলেন বীরবল। তারপর গাছের তলায় সম্রাটের পাশে বসলেন।

এমন সময় উটের পিঠে চড়ে দু'টি লোক চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে সম্রাট কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

—কিছু যেন চিন্তা করছেন সম্রাট?

—হ্যাঁ ভাবছি উটের পিঠে ওই কুঁজটা থাকে কিসের জন্য?

—ওটা পূর্বজন্মের পাপের ফল।

—এটা ঠিক উত্তর হল না। জন্তু তার নিজের স্বভাব অনুযায়ী চলে। এখানে পাপ পুণ্যের প্রশ্ন নেই।

বীরবল এই কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠলেন।

—হাসছ কেন? একটু বিরক্ত বোধ করেন সম্রাট।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ও যে পূর্বজন্মে জন্তুই ছিল, একথা কে বলতে পারে? নবাব বাদশাহও হতে পারে!

ভ্রূ কুঞ্চন করলেন সম্রাট। তাকালেন বীরবলের দিকে।

—হুজুর! পাপের বোঝা বড় ভয়ানক। উট যে কেবল পাপের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ায় তাই নয়, যতদিন বাঁচে ঘাড় উঁচু করে শান্ত দৃষ্টিতে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেদিন মরে সেদিন পাপের নিবৃত্তি হয়।

—এত বড় অপরাধ করে তারা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি প্রকারের পাপ, বল?

—প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ। হয়তো পূর্বজন্মে কারো কাছে কোন কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপর আর মনে নেই তার।

—থাক বীরবল। চল ওঠা যাক। কি যেন মনে হওয়াতে সম্রাট থামিয়ে দিলেন তাকে।

—চলুন। আড়চোখে বীরবল তাকালেন সম্রাটের দিকে।

—বীরবল! চলতে চলতে বলেন সম্রাট।

—হুকুম করুন।

—বলছিলাম, বেশ অনেকদিন আগে তোমাকে জায়গীর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কালই সেটা দিয়ে দিচ্ছি।

—বহুত মেহেরবানি আপনার। হাসতে হাসতে বলে বীরবল।

—তোমার কাছে প্রতি ব্যাপারেই হার মানছি আমি। এ হার মানার মধ্যেও গৌরব বোধ করছি। খোদার মেহেরবানি না হলে এমন রত্ন লাভ হত না আমার।

সম্রাটের দিকে তাকান বীরবল। প্রশান্তিতে সমগ্র মুখখানি ভরে যায়।

—জাঁহাপনা, আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। কুর্নিশ জানিয়ে কথাকয়টি বলে সর্দার আনোয়ার খান।

—বল, কি বলতে চাও?

—অপরাধ নেবেন না। আজকাল আপনার সব প্রশ্নের উত্তর মহামান্য বীরবলই দেন। আমাদের আপনি আর আর সে সুযোগ দেন না।

কথাটা শুনে জোরে হেসে উঠলেন সম্রাট। বললেন—আজ বীরবল এখনও আসেনি। বেশ তোমাকেই সে সুযোগ দিচ্ছি। ভেবে চিন্তে উত্তর দেবে।

—বলুন হুজুর।

—আমি তোমাকে পাঁচটা প্রশ্ন করছি। যথা—কোন ফুল শ্রেষ্ঠ? কার দাঁত সবচেয়ে সুন্দর? কার ছেলে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ? সর্বাপেক্ষা প্রধান নরপতি কে? কোন্‌টি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ?

প্রশ্ন শুনে মুখ শুকিয়ে গেল আনোয়ার খানের।

—হুজুর বড় কঠিন প্রশ্নগুলো। আমাকে বিশ মিনিট সময় দিন। আমি যা তা উত্তর দেব না। সেজন্য একটু সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

—আপত্তি নেই। কিন্তু এর মধ্যে যদি বীরবল এসে পড়ে?

—আমার উত্তর ভুল হলে তবে তাঁকে প্রশ্ন করবেন সম্রাট। নম্রভাবেই কথা কয়টি বলে আনোয়ার খান।

—বেশ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে ডাকছি।

বীরবল এলেন। অভিবাদন জানিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসতে গেলেন।

—না না ওখানে নয়। তোমার রচিত একটা কবিতা আমাকে শোনাও বীরবল।

—বেশ। আনন্দের সঙ্গে বীরবল খাতা খুলে কবিতাপাঠ করেন। বড় ছন্দ দিয়ে লেখা এ কবিতাগুলো।

মুগ্ধ হন আকবর।

—সম্রাট! কুর্নিশ জানায় আনোয়ার খান।

—আমি প্রস্তুত জাঁহাপনা।

—বেশ বল।

আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো পর পর দিচ্ছি। যথা—জয় হল শ্রেষ্ঠ ফুল। হাতির দাঁতই শ্রেষ্ঠ দাঁত। মানুষের মধ্যে রাজপুত্রই হল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সম্রাট হলেন শ্রেষ্ঠ নৃপতি। বিদ্যা হল শ্রেষ্ঠ গুণ। গর্বিতভাব আনোয়ার খানের মুখে।

—না, এ ঠিক উত্তর হল না। তুমি স্বস্থানে গিয়ে বস।

নিমেষে কালো হয়ে গেল আনোয়ার খানের মুখ। সে মাথা নীচু করে স্বস্থানে ফিরে এল।

—এবার বীরবল তোমার পালা। আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর তুমি দাও।

বীরবল এতক্ষণ একটু হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলেন। এবার চট্ করে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন।

—বলুন জাঁহাপনা।

সম্রাট ঠিক একই প্রশ্নগুলো রাখলেন তাঁর সামনে। বীরবল এক সেকেণ্ড চোখ বুজলেন। তারপরেই উত্তর দিলেন: তুলার ফুল হলো শ্রেষ্ঠ ফুল, কেননা মানবজাতি এর থেকে পরিধেয় বস্ত্র পায়। লাঙলের ফলার দাঁত হল শ্রেষ্ঠ দাঁত, কারণ এই দাঁত ভূমি কর্ষণ করে এবং ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে। গাভীর পুত্র সন্তান হল শ্রেষ্ঠ সন্তান, যেহেতু সে লাঙল টানে। ইন্দ্র হলেন শ্রেষ্ঠ রাজা, কেননা পৃথিবীতে তিনি বৃষ্টি দান করেন। সৎসাহস হল শ্রেষ্ঠ গুণ, কারণ ঈশ্বর সৎসাহসীর পক্ষ সমর্থন করেন।

—ঠিক ঠিক জবাব পেলাম। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন সম্রাট। সত্যি, বীরবল ঠিক আমার মনের কথাটি টেনে বার করে দেয়। তোমরা বীরবলের জয়ধ্বনি কর। সভাসদ্‌দের প্রতি কথাটা ছুঁড়ে দিলেন আকবর।

সঙ্গে সঙ্গে তারা আনন্দধ্বনি করে ওঠে—জয় সম্রাট আকবরের জয়, জয় রঙ্গরাজ বীরবলের জয়।

আবুল ফজল হলেন সম্রাট আকবরের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী। তিনি যেমনই গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তেমনি কাজের মানুষ। সম্রাট তাঁকে বোধ হয় একটু সমীহ করতেন। তাঁরও একদিন ইচ্ছা হল বীরবলকে জব্দ করবেন। তিনি সম্রাটের সামনেই একদিন বীরবলকে বললেন, তোমার নতুন চাকরির কথা কি শুনেছ বীরবল?

—আমার নতুন চাকরি! কই? কবে থেকে? কিছু জানিনা তো?

—হ্যাঁ সব দিক চিন্তা করে দেখা গেল এ কাজের দায়িত্ব একমাত্র তুমিই নিতে পারবে, সে যোগ্যতা তোমার আছে।

– কিন্তু কাজটা কী?

—শহরের অধিবাসীদের অভিযোগ, বড় বেশী নেড়ি কুকুরের উৎপাত বেড়েছে। ওদের উপদ্রবে লোকে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সেজন্য সম্রাট তোমাকে এই চাকরি দিচ্ছেন যে আজ থেকে কুকুরদের সর্বপ্রকার দায়িত্বভার তুমি বহন করবে।

—কাজের মতই কাজ বটে। এতে কিন্তু আমি খুব খুশী হয়েছি। হব না কেন বলুন? আজ থেকে আপনাদের সকলকে যে আমার জিম্মায় আসতে হবে।

উচ্চ হাস্যে এবার সম্রাট ফেটে পড়লেন। ফেটে পড়লেন সভার অন্যান্য সকলে। অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন আবুল ফজল। তিনি ভাবতেই পারেন নি বীরবল এভাবে তাঁকে জব্দ করবে। মনে মনে বললেন—উচিত শিক্ষাই পেলাম। জীবনে এই প্রথম আর এই শেষ বীরবলকে পরিহাস করা।

সত্যি এরপর আর কোনদিনও তিনি বীরবলকে জব্দ করবার চেষ্টা করেন নি।

—ওহে বীরবল, এমন এক ব্যক্তিকে শহর থেকে ধরে আনো- যে ব্যক্তি একই সঙ্গে যেমনই অসম সাহসিক, তেমনি ভীতু! যদি না আনতে পারো তবে কঠিন শাস্তি দেব তোমায়।

—কঠিন আদেশ সম্রাট।

—তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরকে কঠিন বলছ! সত্যিই অবাক করলে যে!

—আপনার আদেশ পালন করবার চেষ্টা করব। এর জন্য একটু সময়ের দরকার, যদি অনুগ্রহ করে আজকের মত ছুটি দেন বড় ভাল হয়।

—বেশ তাই হোক। কাল কিন্তু তেমন ব্যক্তিকে অবশ্যই হাজির করবে। মেয়েছেলে হলেও আপত্তি নেই।

—যথা আজ্ঞা সম্রাট।

বনপথ দিয়ে চলেছেন বীরবল। হঠাৎ নজর গেল একটি সুন্দরী কিশোরী উদাস নয়ন মেলে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। মুখখানি ব্যথায় থম্‌থম্‌ করছে।

বীরবলের পায়ের শব্দে মেয়েটি তাড়াতাড়ি তাকায়, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। হতাশার বেদনা ফুটে ওঠে তার মুখখানিতে।

—তুমি কে গো? এমন বেদনাপূর্ণ মন নিয়ে কি জন্য বসে আছ এখানে? সাপটাপের ভয় নেই কী তোমার?

—সাপ কি করবে? ছোবল মারবে? মারুক। মরতেই আমি চাই।

—সেকি! কেন, কিসের দুঃখ তোমার?

—আমার দুঃখ? আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি।

—বল বল। সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বীরবল।

—শুনে আপনি কি করবেন? সে যে বড় লজ্জার, বড় কলঙ্কের কথা।

—তবু বল।

—আমি একজনকে ভালবাসি, দারুণ ভালবাসি। তাঁকে বিশ্বাস করে আমি সর্বস্ব দিয়েছি। তাঁর আহ্বানে প্রতিদিন গভীর রাত্রে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত সাপ বাঘের ভয়, অন্ধকার পথঘাট সব কিছু তুচ্ছ করে এই গভীর জঙ্গল পেরিয়ে তাঁর কাছে যাই। আবার ভোর হবার আগেই ফিরে আসি বাড়ী। গতকালও গভীর রাত্রে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে।

—কিন্তু কাল সন্ধ্যে থেকেই তো প্রবল ঝড় বৃষ্টি হয়েছে! রাত্রে তো প্রকৃতি দেবী তাণ্ডব লীলায় মত্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় তো কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি বাড়ী ছেড়ে বার-হওয়া। অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন বীরবল।

—আমার হয়েছে। আমি সব কিছু তুচ্ছ করে ছুটে গিয়েছি তাঁর কাছে। কেননা আমি হঠাৎ জানতে পারলাম আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

—তিনি কি বললেন ?

—বললেন, আর এসো না। আমার বাড়ীর লোকজন তোমার অভিসারের কথা টের পেয়ে গেছে। আমরা ব্রাহ্মণ। কায়স্থ পরিবারের এমন নষ্টা চরিত্রের মেয়ের সঙ্গে আমার মা বিয়ে দেবেন না।

—তুমি এর উত্তরে কি বললে ?

—কিছুই বলার সুযোগ হয়নি। কেননা অন্য দিনের মত তাঁর শোবার ঘরের দরজা খোলা ছিল না। জানলা দিয়ে এই কথাগুলো বলে মুখের ওপর সেটা বন্ধ করে দিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, বৃষ্টিতে সারা শরীর ভিজে গেল। তারপর কোন রকমে ফিরে এলাম বাড়ী।

—বাড়ীতে কে কে আছেন তোমার ?

—কাকা-কাকীমার কাছে থাকি আমি।

—তাঁরা কি কখনও টের পাননি ?

—হ্যাঁ আজই টের পেয়েছেন। খুব ভৎর্সনা করেছেন। বলেছেন, আমার মত কলঙ্কিনীর মুখ দেখতেও ঘৃণা হয় তাঁদের।

—তোমার সেই ভালবাসার ব্যক্তিটি কোথায় থাকেন বলতে পার ?

—পারি। কিন্তু কিছুই লাভ হবে না।

—সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। ওঠ, বাড়ীটি দেখিয়ে দেবে। তারপর তোমাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব। সেখানে তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করব। দরকার হয় তোমার কাকা কাকীমার কাছে আমি নিজে যাব। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো প্রতিদিন অভিসারে এই যে যাবার ব্যবস্থা করেছিলে খুবই অন্যায় কাজ এটা।

—কি করব, পারিনি যে তার আহ্বান উপেক্ষা করতে। আমি যে তাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছি।

—যতই ভালবেসে থাক, খুবই অন্যায় করেছ। নারীর কাছে তার ইজ্জতের অপেক্ষা আর কিছু বড় নয়। নাও ওঠ, চল দেখিয়ে দেবে তার বাড়ী, চলতে চলতে কথা হবে। মেয়েটিকে নিয়ে অগ্রসর হলেন বীরবল।

—তুমি কি এখন স্নানে যাচ্ছ ?

—একি! মহামান্য বীরবল আপনি ?

—হ্যাঁ তোমার সঙ্গে কথা আছে। একটু নিভৃতে এস।

—আপনি কি আমায় চেনেন ? বিস্মিত স্বর তরুণের কণ্ঠে।

—আগে চিনতাম না। একটু আগে তোমার পরিচয় পেলাম। তা

সুকুমারীকে বিয়ে করতে অমত করছ কেন?

চমকে ওঠে গোবিন্দলাল। তারপর বলে—সে কায়স্থ আর নষ্টা চরিত্রের তাই।

—কিন্তু কে তাকে নষ্ট হতে সাহায্য করেছে?

—আমি...আমি। ঢোক গেলে গোবিন্দলাল। তারপর আবার বলে, আসলে আমি তাকে খুব ভালবাসি। ভেবেছিলাম বাড়ীর অমতেই বিয়ে করব তাকে। কিন্তু এখন এ ধরণের বিয়ে করলে বাবা বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। তিনি বঞ্চিত করলে আর জীবিকা নির্বাহের সংস্থান থাকবে না। আমার বিমাতা ভীষণ রাগী মেয়েছেলে। তাঁর মন জুগিয়ে চলতে হয় বলেই তাঁর কথাগুলোই আপনাকে বললাম। এগুলো আমার মনের কথা নয়।

—তোমাদের এ অভিসারের কথা কবে টের পেলেন তোমার বাবা মা?

—পরশু রাত্রে। সে কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড! সুকুমারীকে দুর্দান্ত সাহসী মেয়েছেলে বলেই জানতাম। সাহসী না হলে কেউ গভীর রাত্রে এভাবে জঙ্গল দিয়ে আসতে সাহস পায়? কিন্তু কি করল জানেন? আধো আলো আধো অন্ধকারে আমরা দু'জনে নীচুস্বরে কথাবার্তা কইছিলাম। হঠাৎ ও পাড়ামাত করে চেঁচিয়ে উঠল—ও বাবাগো মাগো গেছিগো। কে আছ, বাঁচাও বাঁচাও।

আমি চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম সাপটাপ কিছু হবে। আলো বাড়াতেই দেখলাম সেসব কিছুই নয়—একটা নেংটি ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। ইঁদুরটা নাকি ওর পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে। এদিকে ওর চিৎকারে বাবা মা এবং অন্যান্য ভাই বোনেরা ছুটে এসেছে। বুঝুন আমার অবস্থা। ওকে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে চলে যেতে হল। আর বাবা আমাকে খড়ম পেটা করে প্রায় আধমরা করে ফেললেন। তারপর বাবা মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম আর মিশব না ওর সঙ্গে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ প্রতিজ্ঞা আমার অন্তরের নয়।

বীরবলের চোখ দুটো আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠল। বাঃ! ঈশ্বর এত সদয় তাঁর প্রতি!' এই মেয়েটিকেই সে আগামীকাল দরবারে নিয়ে যাবে। কারণ সম্রাটের হুকুম মত এত ভাল উদাহরণ আর হয় না।

—আপনি বলুন মহামান্য বীরবল আমি কি করব?

—তুমি ওকে বিয়ে করবে।

—কিন্তু ওকে খাওয়াব কি ? তাহলে বাবা ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

—একান্তই যদি তা করেন তবে সে দায়িত্ব আমি নেব।

—আপনি !

—হ্যাঁ। সম্রাটের দরবারে তোমাকে কাজের ব্যবস্থা করে দেব। তুমি উপার্জন করে তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে।

গোবিন্দলালের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, আপনার কাছে আমি চিরদিন চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। এই বলে প্রণাম করে।

—আশীর্বাদ করি, সুখী হও তোমরা।

—কি ব্যাপার বীরবল ! অবগুণ্ঠনবতী এ নারীকে দরবারে এনেছ কেন ?

—আপনি ত হুকুম করলেন ?

—আমি ! কখন ?

—বাঃ ! আপনি না বলেছিলেন একই সঙ্গে দুর্দান্ত সাহসী ও ভীতু এমন ব্যক্তিকে দর্শন করতে চান ? এই নারীর মধ্যেই সে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে। এই বলে সব ঘটনাটি গুছিয়ে বলেন।

—সত্যি বীরবল তোমার তুলনা নেই। মুগ্ধকণ্ঠে বলেন সম্রাট।

বীরবল আনন্দে মাথাটি নীচু করেন।

—কি পুরস্কার চাও তুমি ?

—আপনি একজনকে একটা কাজ দিন।

—কাকে ?

—এই মেয়েটির হবু স্বামীকে।

অবাক হন সম্রাট। তারপর হাসতে হাসতে বলেন —তাই হবে, তাই হবে।

—আপনার রাজ্যে চাকরী পেলে তবেই একে সে বিয়ে করবে। কাজেই বুঝতেই পারছেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বলেন—তোমাদের বিয়ে বীরবলের বাড়ীতে হবে কিন্তু খরচ সব আমার। জীবনে সুখী হও তোমরা।

মেয়েটি প্রণাম করে সম্রাটকে। আনন্দে তার দুটি চোখ জলে ভরে যায়।

—তোমার রসিকরাজ বীরবল তো শুনি খুব বুদ্ধিমান। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিক ত সে ?

—বেশ কালই তাকে অন্দর মহলে আসতে বলব। তোমার যত খুশী প্রশ্ন তাঁকে কর।

কথা হচ্ছিল প্রধানা অথা বড়িবেগম সাহেবা ও সম্রাটের মধ্যে। বীরবলের সঙ্গে বেগমসাহেবার অনেকদিন ধরেই আলাপ করার ইচ্ছে। কিন্তু ঠিক সুযোগ হয়ে উঠছেনা। এইসব বুদ্ধিমান ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ রাখলে বেগমদেরও অনেক সুবিধা হয়।

...পরদিন সম্রাটের নির্দেশে বীরবল এলেন দরবারে। বেগম সাহেবা চিকের আড়ালে বসে প্রশ্ন করলেন—আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের কথা শুনে খুব প্রীত হয়েছি। এবার আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন। তবেই আপনার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেব।

—বলুন বেগমসাহেবা।

—আকাশে কয়টি তারা আছে? নির্ভুল উত্তর দেবেন।

—অবশ্যই। মনে হয় বেগমসাহেবার সঠিক উত্তরটি জানা আছে। তাই আমিও পরম আনন্দের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছি আপনার মহলের বাগিচায় তেঁতুলগাছটির যতগুলি পাতা আছে তার চেয়ে আরো মাত্র পঁচিশটি তারা আকাশে বেশী আছে।

—তোমার গণনা নির্ভুল কেমন করে জানব? এবার প্রশ্ন করেন সম্রাট।

—খুব সহজ। একদল লোক লাগিয়ে তেঁতুল গাছটার পাতাগুলি আগে গুনিয়ে নিন। তারপর আমার হিসাব আমি প্রমাণ করে দেব।

—বেগমসাহেবা!! তুমি কি বল? এবার চিকের দিকে তাকালেন সম্রাট।

—আপনার বীরবল সত্যি বুদ্ধিমান। তেঁতুলগাছের পাতা যে গোণা অসম্ভব ব্যাপার সে কথা তিনিও জানেন, আমরাও জানি। হেসে বলেন বেগম সাহেবা।

—এবার অপর প্রশ্নটি করুন বেগমসাহেবা।

—হ্যাঁ করছি। বলুন ত, সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু?

—মোটে চার ইঞ্চি।

—সেকি! এ আবার কি কথা? বিস্মিতস্বর আকবরের কণ্ঠে।

—সত্যি হুজুর তাই। আমরা দুই চোখে যা দেখি তা সত্য। কিন্তু দুই কানে যা শুনি তা অনেক সময়ে সত্য হয় না। অনেক সময় অনেক মিথ্যা লতাপাতার মত পল্লবিত হয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছায়।

হা হা করে হেসে উঠলেন সম্রাট। বললেন—এতও জান বাবু? তোমার কি মত? এবার চিকের উদ্দেশ্যে কথাটি ছুঁড়ে দিলেন সম্রাট।

—এবারেও হার স্বীকার করলাম। হাসতে হাসতে বলেন বেগমসাহেবা।

—কিন্তু এখানে একটা কথা বলা হয়নি। বলেন বীরবল।

—সেটা কী? সম্রাটের প্রশ্ন।

—আমরা কান দিয়ে যা শুনি তা যেমন সব সময় সত্য হয়না, তেমন চোখ দিয়ে যা দেখি তাও কিন্তু এক এক সময় ভুল হয়ে যায়। অর্থাৎ চোখ দিয়ে দর্শন করলেই যে সেটা সত্য হবে সব সময় তা নয়।

—তা কি করে হবে? সম্রাট ও মহিষী একই সঙ্গে প্রশ্ন করেন।

—সত্যি তাই।

—আমি এ মতটা মানতে পাচ্ছিনা। বলেন বেগমসাহেবা।

—আজ না মানুন একদিন না একদিন এর প্রমাণ দিতে পারব।

—বেশ! অপেক্ষায় থাকব। এবার আমার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন বেগমসাহেবা।

—সুপারী কখন পচে? রুটির ছালটা কখন পুড়ে যায়? ঘোড়া ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায় কেন? হাসলেন বীরবল। বল্‌লেন—একটি কথায় তিনটি প্রশ্নের জবাব দিন মালকিন। ওরা কেউ আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না, তাই অমন দশা হয়।

আবার হেসে উঠলেন সম্রাট।

—এবারেও হার মানলাম। চিকের আড়াল থেকে বেগমের কণ্ঠ ভেসে আসে।

—এবারে আরো একটি প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন।

—সাতাশ থেকে নয় বাদ দিলে কত থাকে? পাশে দাঁড়িয়েছিল শাহজাদা ফারুক। প্রশ্নটা শুনে সে আঠারো আঠারো বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

—এত সোজা ;প্রশ্ন করলে বীরবলকে? অবাক হয়ে আকবর প্রশ্ন করলেন মহিষীকে।

—সোজা কি কঠিন আপনার বুদ্ধিমান বীরবলই বুঝবেন। মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসতে থাকেন।

—সাতাশ থেকে নয় বাদ গেলে কিছুই থাকে না বেগমসাহেবা।

—সে কি? অবাক হন সম্রাট। ছোট্ট সেলিমও বিস্মিতনেত্রে তাকিয়ে থাকে।

—আপনি বুঝিয়ে দিন। বেগমসাহেবা নির্দেশ দেন।

—বেশ! মোট সাতাশটি নক্ষত্রপুঞ্জ আছে সৌর জগতে। কিন্তু বর্ষাকালে তাদের মধ্যে মধ্যে নয়টির দরকার হয়। বাকিগুলো অপেক্ষা অপেক্ষা। সেজন্য ওদের অস্তিত্ব নেই।

—আমি মুগ্ধ। এখন আর বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে ওনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই। আল্লা ওনার মঙ্গল করুন। উনি যদি মধ্যে মধ্যে এভাবে অন্দর মহলে আসেন তবে খুবই খুশী হব। আর আজ মধ্যাহ্ন ভোজন এখানেই সারতে হবে তাঁকে। এ ছাড়া আমি একটি রত্নহার ইনাম দিতে চাই ওঁকে।

—তাই হবে মহিষী। উত্তর দেন সম্রাট।

তারপর বীরবলের দিকে ফিরে বলেন —মাঝে মাঝে নয়। তোমার প্রয়োজন মত পরামর্শের জন্য যখন ইচ্ছে তুমি অন্দরমহলে আসবে। তুমি আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী। তোমাকে আজ থেকে সে অধিকার দিলাম। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বীরবলের মুখ।

—তোমাকে পারস্যে যেতে হবে বীরবল। কেন জান? তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা পারস্যের শাহের কানে উঠেছে। তিনি তোমাকে দেখবার জন্য উৎসুক। শাহের দূত সেই অনুরোধ নিয়ে এসেছে আমার কাছে।

—আপনি যা বলবেন তাই হবে।

—আমি চাই তুমি যাবে। কিন্তু আমার মান যেন বজায় থাকে। তোমার বুদ্ধি তোমার জ্ঞান দিয়ে তুমি যেমন আমাদের মুগ্ধ করেছ, শাহর ক্ষেত্রে যেন তার ব্যতিক্রম না হয়।

—আপনি চিন্তা করবেন না জাহাঁপনা।

নির্দিষ্ট দিনে বীরবল রওনা হলেন। তেহরাণে পৌঁছে বীরবল শাহর কাছে নিজের আগমনবার্তা জানালেন।

শাহ এলেন দশজন সভাসদকে নিয়ে।

—কিন্তু একি! বীরবল অবাক হলেন। —এঁরা দশজন যে ঠিক একই রকম পোশাক ও আভরণ পরেছেন নিজেদের! চেহারাও অনেকটা এক। কুর্নিশ করবেন কাকে? বুঝতে পেরেছি আমাকে জব্দ করতে চান শাহ। ঠিক আছে জয়ী হতে পারি কিনা দেখা যাক। কথাকয়টি মনে মনে বলে এক পলকের জন্য তিনি সকলের মুখের দিকে তাকালেন তারপর ঠিক শাহর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, এবং কুর্নিশ করলেন।

—তুমি কেমন করে বুঝলে আমি শাহ?

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শাহ।

—এ আর এমন কঠিন কাজ কি? ওরা আড় চোখে তাকাচ্ছিলেন আপনার দিকে, আপনি কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অন্য দিকে। হুজুর,

ব্যক্তিত্বই হল বৈশিষ্ট্য।

—সত্যি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলাম। প্রথম দর্শনেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি। এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।

—বলুন জাহাঁপনা।

—ধর দু'টি পক্ষের যুদ্ধ হচ্ছে। একদল এসেছে হাতির পিঠে চড়ে আর এক দল এসেছে ঘোড়ায় চড়ে। কার জয় হবে?

—সেটা নির্ভর করে রণক্ষেত্রের ওপর।

—কেন?

—স্থানটি যদি ধূলিময় হয় তবে হাতির পিঠে চড়ে এসেছে যারা তাদের অবশ্যই পরাজয় হবে।

—ব্যাপারটা আরো গুছিয়ে বল।

—জাহাঁপনা, হাতিরা নিজেদের মাথায় ধূলি ওড়ায় কিন্তু ঘোড়ার ক্ষেত্রে তা নয়। কাজেই এবার বুঝতে পারছেন কেন অশ্বারোহীদের জয় হবে?

-পারছি বীরবল। খুব খুশী হলাম। এবার চল প্রাসাদে। এখানে কয়েকদিন আমাদের অতিথি হয়ে থাকতে হবে তোমায়।

-আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি জাহাঁপনা।

—সত্যি কি বীরবলের বুদ্ধিমত্তার তুলনা নেই?

—জী শাহজাদী।

—ঠিক আছে। আজই আব্বাহুজুরের কাছে একটা আর্জি রাখব।

—সেটা কী?

—আমাদের জ্ঞানী বুদ্ধিমান উজীরসাহেবকে তিনি পরাজিত করতে পারেন কিনা দেখি। তাই আব্বাহুজুরকে বলব দু'হাত লম্বা কাপড় দিয়ে ওঁদের বলবেন, কে এ দিয়ে তাঁদের শাহের শরীরটা ঢেকে দিতে পারেন?

-এটা কেমন করে সম্ভব হবে। আমাদের মহামান্য শাহ হলেন কত লম্বা চওড়া মানুষ। দুহাত কাপড় দিয়ে কি করে তাঁর শরীর ঢাকা সম্ভব হবে? বুদ্ধিমত্তার এ কি পরীক্ষা নেবার কথা বলছেন শাহজাদী? তাহলে কেউই তো সফল হবেন না।

—এঁদের মধ্যে যাঁর উপস্থিত বুদ্ধি বেশী তিনিই হবেন।

কথা হচ্ছিল শাহকন্যা আজিমউন্নিসা ও বাঁদী সেলিমার মধ্যে। ইতিমধ্যে পারস্যের নানা স্থানে বুদ্ধিমান রসিকরাজ বীরবলের আগমনের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই তাঁকে দর্শন করবার জন্য, তাঁর পরীক্ষা নেবার জন্য

উৎসুক। শাহজাদী বীরবলের কথা শুনলেন। তিনি নিজে খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। সেজন্য শাহর নয়নের মণি। শাসনকার্যে অনেক সময় জটিল জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি মেয়ের বুদ্ধি নেন। কাজেই আব্বাহুজুরের কাছে প্রস্তাবটা কার্যকরী করাতে দেরী হবে না, এটা আজিমউন্নিসা ভাল ভাবেই জানেন। তাই মিচ্‌কে মিচ্‌কে হেসে বলেন—এবার মোগল দরবারের ওই রত্নটি কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। সম্রাট আকবরের দরবারে মাথা নীচু করেই প্রবেশ করতে হবে তাঁকে।

—আপনার কি ধারণা উজীরসাহেব জয়ী হতে পারবেন? প্রশ্ন করে সেলিমা?

—সে কথা আগে নাই বা বল্‌লাম? হাসি মুখে বলেন আজিমউন্নিসা।

আজ দরবার লোক লোকারণ্য। ওপাশটায় চিক ফেলা রয়েছে। কেননা বেগম, শাহজাদী ও বাঁদির দল বসেছে। একপাশে বান্দা দু'হাত নূতন কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে মখমলের একটা বিছানা পাতা।

উজীরসাহেব, অতিথি বীরবল এবং দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সকলেই শুনলেন শাহর প্রস্তাবটা।

—বীরবল ছাড়া আমার দরবারে আর কেউ যদি এতে অংশ নিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে এগিয়ে আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন পদস্থ কর্মচারী এসে কুর্নিশ জানাল শাহকে।

—বহুত আচ্ছা। আমি বিছানায় শুচ্ছি। এবার কাজ শুরু হোক। এই বলে বান্দাকে হুকুম দিলেন তিনজনের মধ্যে একজনের হাতে কাপড়টা দিতে।

কথা অনুসারে কাজ চল্‌ল। কিন্তু সে ব্যক্তি ঘেমে উঠল। কিছুতেই দু'হাতে কাপড় দিয়ে শাহর দেহটা ঢাকতে পারল না।

এরপর আরো দু'জন এলেন। তাঁরাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। সভায় হাসির রোল উঠল।

—উজীরসাহেব! এবার আপনি আসুন।

—গোস্তাখি মাপ করবেন। আমি এটা চেষ্টা করতে গিয়ে সফল হব না। জনতা এ দৃশ্য দেখে হাসবেই। কিন্তু তাদের হাসি হুল ফোটাবে আমাকে। জীবনে পরাজয় স্বীকার করি নি।

—এবার করছেন ?

—যদি ভারতের এই রত্নটি সফল হন তবেই ?

—আর তা না হলে ?

—এবারেও গোস্তাফি মার্জনা করতে বলছি। কেননা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের পরিকল্পনা এ নয়।

চিকের আড়ালে অপমানে রাঙা হয়ে উঠল আজিমউন্নিসার সুন্দর মুখখানি। কিন্তু কি বলবেন তিনি? এ রাজ্যে সবাই উজীরসাহেবকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। স্বয়ং আব্বাহুজুর 'উজীরসাহেব' বলতে অজ্ঞান।

—এবার তোমার পালা। বীরবলের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলেন শাহ।

—সে তো বুঝতেই পারছি। হাসি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলেন বীরবল।

এগিয়ে এলেন তিনি। প্রথমেই সুলতানের পা দু'খানা হাঁটু পর্যন্ত মুড়ে দিলেন এবং মাথাটা গলার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন। তারপর কাপড়ের টুকরোটা ছড়িয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢেকে দিলেন। এরপর বল্‌লেন—আশা করি ব্যর্থ হইনি আমি।

লাফিয়ে উঠলেন শাহ। আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন বীরবলকে।—সত্যি তোমার উপস্থিত বুদ্ধি মুগ্ধ করল আমাকে। আমার গলার এই মুক্তোর মালাটি তোমাকে উপহার দিলাম।

সমগ্র সভাকক্ষের জনতা উল্লাসধ্বনি করে উঠল। চিকের আড়ালেও অন্দরমহল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

—আমি সত্যি মুগ্ধ হলাম। এমন মানুষের সঙ্গে একবার আলাপ হয় না? গদ্‌ গদ্‌ স্বরে বলেন শাহজাদী।

—আপনি চান আলাপ করতে? প্রশ্ন করে সেলিমা।

—হ্যাঁ, আজ রাতে চুপি চুপি যাব ওনার কক্ষে।

—সেকি! ওনার কক্ষে যাবেন কেন?

—আঃ! আস্তে বলতে পারিস না?

—মহামান্য বীরবলের কাছে আমরা সকলেই পরাজিত এ কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু হুজুরের অনুমতি নিয়ে একবার আমি পরীক্ষা করতে চাই। এ পরীক্ষায় তিনি জয়ী হলে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করে সম্রাটের দরবারে সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে আসব তাঁকে। বল্‌লেন উজীর সাহেব।

—বেশ অনুমতি দিলাম। বল্‌লেন শাহ।

—মহামান্য বীরবল, বলুন তো যুদ্ধের সময় কোন অস্ত্রটা সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনে লাগে?

—উপস্থিত বুদ্ধি।

—আমাদের অস্ত্রাগারে অনেক সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র থাকতে আপনি উপস্থিত বুদ্ধির মূল্য দিচ্ছেন?

—আমি তাই মনে করি।

—বেশ প্রমাণ হোক।

—তাই হোক।

—শুনুন প্রাসদের এক মাইল উত্তরে ডান দিকে গেলে একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তা দেখতে পাবেন আপনি। কাল সকালে সে পথ দিয়ে মোড় পর্যন্ত যাবেন।

—তারপর?

—রাস্তার মোড়ে আমি আপনার জন্য এক মহার্ঘ উপহার নিয়ে অপেক্ষা করব। সেটি আমার হাত থেকে গ্রহণ করতে হবে আপনাকে।

—বেশ। তাই হবে।

—এ আর এমন কঠিন কাজ কী? প্রশ্ন করে সেলিমা।

—নারে। উজীরসাহেবকে তো চিনি। নিশ্চয় অন্য কোন সাংঘাতিক মতলব এঁটেছেন। বলেন আজিমউন্নিসা।

—বসুন শাহজাদী, আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমার কক্ষে এসেছেন। সেলিমা আপনার আসার সংবাদটা আগেই দিয়ে রেখেছে। কিন্তু আগমনের কারণ কিছু বলে নি।

—আমি নিজেই জানি না। হাসতে হাসতে বলে সেলিমা।

দুজনেই বোরখায় সর্ব শরীর ঢেকে রেখেছে। মহার্ঘ জাজিমের ওপর বসলেন শাহজাদী।

—আমি তবে বাইরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। বলল সেলিমা।

—হ্যাঁ দেরী করিস না।

চলে গেল সেলিমা।

—বলুন শাহাজাদী, কি হুকুম আপনার?

—আপনার কাছে মাপ চাইতে এলাম।

—মাপ! কেন? কি অপরাধ করেছেন?

—প্রকৃত গুণীর অমর্যাদা করেছি। আমি প্রথমটা আপনার সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করে ছিলাম, তাই আব্বাহুজুরকে ওই পরামর্শটা আমিই দিয়েছিলাম।

—আপনি। কেন?

—ভেবেছিলাম পারবেন না। মুখ কালি করে ফিরে যাবেন।

—তারপর?

—তারপর যখন দেখলাম কেউ পারলেন না, এমন কি এ রাজ্যের সব থেকে বুদ্ধিমান উজীরসাহেবও হেরে গেলেন তখন বুঝলাম প্রকৃতপক্ষে কতখানি প্রতিভা রয়েছে আপনার মধ্যে। তখনই মনে প্রবল বাসনা জাগল আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু মুখখানা এভাবে ঢেকে রাখলে কথা বলে আনন্দ পাচ্ছি না।

—পর পুরুষের কাছে আমরা মুখ দেখাই না।

—আমাকে আপনার একজন মিতা মনে করতে পারেন না?

—মিতা! আপনাকে? এমন কথা এর আগে তো কেউ বলেনি!

—সেজন্যই ত বললাম।

এবার শাহজাদী মুখের পর্দা সরিয়ে দেন। হ্যাঁ অপ্সরাই বটে! মনে হয় ভুল করে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। বীরবলের চোখের পলক পড়ে না।

—মিতার দিকে কিন্তু অমন করে তাকিয়ে থাকতে নেই।

লজ্জিত হন বীরবল।

—আমি আমাদের বন্ধুত্ব স্মরণ করে নিজ হাতে আপনার আঙ্গুলে এ আংটিটি পরিয়ে দিতে চাই।

—কিন্তু আমার আঙ্গুলের মাপ পেলেন কোথায়?

—মাপ ছাড়াই আংটি এনেছি। এ বিষয়ে সেলিমার পেয়ারের মানুষটি আমায় সাহায্য করেছে। আমার ধারণা কোন না কোন আঙ্গুলে এটি লাগবেই।

নিজের হাতে শাহজাদী আজিমউন্নিসা বীরবলের অনামিকায় আংটিটি পরিয়ে দিলেন।

—আপনার এ বন্ধুত্বের কথা চিরদিন স্মরণ রাখব শাহজাদী। কিন্তু আমি কি দেব?

—আব্বাহুজুরের কাছে শুনেছি আপনি কবিতা লেখেন 'ব্রহ্ম' নামে। নিজের হাতে কবিতা লিখে যদি কয়েকটি উপহার দিতেন।

—তাই দেব শাহজাদী। বীরবল থলে থেকে বার করলেন নিজের কবিতার খাতা।

—না না ওগুলো নয়।

—তবে?

—আপনার আর আমার বন্ধুত্বকে স্মরণ করে কবিতা রচনা করতে হবে। আর হয়ত আমাদের দেখা হবে না। কিন্তু আমার জীবনে সেগুলোই পাথেয় হয়ে থাকবে।

—তাই হবে শাহজাদী। আমি এখান থেকে বিদায় নেবার আগে আপনাকে কবিতাগুলো দিয়ে যাব। আপনি সেলিমাকে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে।

দরজায় টোকা পড়ল।

—কে?

—আমি উজীরসাহেব।

চমকে উঠলেন দু'জনে।

বীরবলের ইঙ্গিতে শাহজাদী স্নানঘরে ঢুকে পড়লেন।

—আপনি এত রাত্রে? দরজা খুলে দিয়েই উজীরসাহেবকে প্রশ্ন করেন বীরবল।

চরিদিক তাকিয়ে নেন উজীরসাহেব।

—আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আহ্বান জানান বীরবল।

—এত রাতে আপনি জেগে জেগে কি করছিলেন?

—সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু গভীর রাতে হঠাৎ আমার কক্ষে আপনার আগমনের কারণ কি?

—কিছুই না। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ গুণগুণ কথার আওয়াজ কানে এল আপনার কক্ষ থেকে।

—হ্যাঁ, আমি কবিতা রচনা ও পাঠকাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু আপনি এত রাতে সফরে বার হয়েছেন?

—আমাদের তাই করতে হয়। সত্যি, রাত অনেক হল, শুয়ে পড়ুন। কাল সকলের কথা মনে আছে তো?

—আছে। হাসতে হাসতে বলেন বীরবল।

—আস্সালাম্ আলাইকুম। বলেন উজীরসাহেব।

—ওয়া আলাই কুম্ সালাম। প্রত্যুত্তর করলেন বীরবল। চলে গেলেন উজীরসাহেব। একটু অপেক্ষা করলেন বীরবল। তারপর যেই শাহজাদীকে বার হবার জন্য বলবেন, অমনি আবার দরজায় টোকা পড়ল।

—আমি সেলিমা। খুব নীচুস্বরে বলে সে।

দরজা খুলে দেন বীরবল।

—শাহজাদী কোথায়? শঙ্কিত স্বর সেলিমার কণ্ঠে।

স্নানঘর দেখিয়ে দেন বীরবল।

—শুনুন, উজীরসাহেব বার হয়েছেন। আমি আপনার বান্দার কাছ জেনেছি স্নানঘরের পেছনে একটা দরজা আছে। আমি সেখান থেকে শাহজাদীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। ধরা পড়লে শাহ আপনাদের সকলেরই গর্দান নিয়ে নেবেন। আমরা চলে গেলেই আপনি দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

—তাই হবে সেলিমা।

যাবার সময় করুণ চোখ দু'টি মেলে আজিমউন্নিসা তাকালেন বীরবলের দিকে। চোখ ছলোছলো।

—তোমার কথা চিরদিন মনে রাখব মিতা।

—আমিও রাখব। কবিতা পাঠাতে ভুল না।

—কখনই না।

সজল চোখে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন শাহজাদী।

পথটা বড় সঙ্কীর্ণ। কেন আমাকে এখান থেকে চলতে বলা হল কে জানে? কথা কয়টি নিজের মনে মনে বলে অগ্রসর হলেন বীরবল। ওরে বাপ্! একলাফে বীরবল এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। একটা হাতি উল্টো দিক থেকে ওভাবে ছুটে আসছে কেন? এখন উপায়? পৈত্রিক প্রাণটা কি এভাবে বিসর্জন দেব? পালাবই বা কেমন করে? হাতি যে এসে পড়ল প্রায়। হঠাৎ তাঁর চোখ গেল নেড়ি কুকুরটার দিকে। লাফ দিয়ে ওর গায়েই তো পড়েছিলেন তিনি। চক্ষের নিমেষে বীরবল কুকুরটার পেছনের পা দুটো হিঁচড়ে টেনে ছুঁড়ে দিলেন হাতির শুঁড়ের ওপর। কুকুরটা ভয় পেয়ে দিল হাতির শুঁড়ে এক কামড়। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল হাতিটা। সেই সুযোগে বীরবল হাতির নজর এড়িয়ে উল্টো দিকে দৌড় লাগালেন। হাতির মাহুত উজীরসাহেবের নির্দেশ মত ধারে কাছেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাতির কাছে এল তারপর যা করণীয় করল।

ওদিকে বীরবল পৌঁছে গেলেন উজীরসাহেবের কাছে। তিনি প্রাণ ভরে আলিঙ্গন জানালেন তাঁকে। তাঁর দু'চোখে জল। নিজের হীরকখচিত তরবারিটি উপহার দিলেন তাঁকে। এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সসম্মানে বীরবলকে সভায় নিয়ে এলেন তিনি এবং সগৌরবে বীরবলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন সকলের সামনে। চিকের আড়ালে শাহজাদীর সুন্দর

মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য। সম্রাট আকবরের দূত এসেছে পত্র নিয়ে। শাহ পড়লেন। মুখখানি বেদনায় ম্লান হয়ে গেল। বললেন সম্রাট খবর পাঠিয়েছেন বীরবলকে ফেরার জন্য। বীরবলের আগমনে মনটা যত আনন্দের হয়েছিল ফিরে যাওয়াটা তত বেদনার হবে। কিন্তু উপায় নেই।

তারপর উজীরসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, আপনি দূতের থাকার ব্যবস্থা করে দিন। দু'দিন পরে আমরা যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে বীরবলের রওনা হবার ব্যবস্থা করছি। বলতে বলতে শাহর চোখ দু'টি জলে ভরে ওঠে।

ফিরে এলেন বীরবল নিজের দেশে। প্রচুর ধন রত্ন ও উপহার সঙ্গে নিয়ে। হ্যাঁ সেলিমার মারফৎ শাহজাদীকে দু'টি কবিতা উপহার দিয়ে আসতে ভুল হয়নি তাঁর।

—জাহাঁপনা, আমার পুত্রের এই তলোয়ার এক সময় আপনার হয়ে অনেক যুদ্ধ জয় করেছে। দয়া করে এটা আপনি অস্ত্রাগারে রেখে দিন।

—তলোয়ারটা দেখি।

বৃদ্ধা এগিয়ে এসে সেটা সসম্ভ্রমে সম্রাটের পায়ের কাছে রাখল। একজন সেনাপতি সেটা সম্রাটের হাতে দিলেন। সম্রাট খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করলেন—এ ধরণের জংধরা পুরোনো তলোয়ার আমার অস্ত্রাগারে রাখার বাসনা জেগেছে কেন তোমার?

বৃদ্ধা একটু থতমত খেয়ে যায়। বলে, আমার একটি মাত্রই ছেলে ছিল সে। কুড়ি বছর আপনার সেনাবাহিনীতে কাজ করেছে। কিন্তু সে মারা যাওয়াতে আর আমার দেখা শোনা করার কেউ নেই। তাই বড় আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—বুঝলাম। কিন্তু এ তলোয়ার আমাদের কোন কাজে লাগবে না। কাজেই এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তবে এটা আনতে যে মেহনতের প্রয়োজন হয়েছে তার জন্য পাঁচটা মোহর দিচ্ছি।

—মাত্র পাঁচটা মোহর! ছল ছল চোখে সেই বৃদ্ধা তাকালো বীরবলের দিকে।

—তলোয়ারটা একবার দেখতে পারি জাহাঁপনা?

—অবশ্যই। পার্শ্বচরকে নির্দেশ দিলেন ওটা বীরবলের হাতে দিতে।

বীরবল তলোয়ারটি হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখছেন আর দেখছেন, দেখা যেন ফুরোচ্ছেই না।

—কি ব্যাপার বীরবল? এত কী দেখছ?

—কিছু না জাহাঁপনা। একটা কথা কেবলই মনে হচ্ছে তাই হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে না এটা।

—কি কথা মনে হচ্ছে? বিস্মিত সম্রাট প্রশ্ন করেন।

—জাহাঁপনা, মনে হচ্ছে তলোয়ারটা সোনা হয়ে যাবে।

—সোনা হয়ে যাবে! তুমি যে অবাক করলে?

—সামান্য পরশ পাথর যেখানে লোহাকে সোনায় পরিণত করে…সেখানে সম্রাটের হাতের স্পর্শ পেয়েও……।

—মানে! কি বলতে চাইছ?

—কি বলতে চাইছি বুঝছেন না জাঁহাপনা?

মিটি মিটি হাসেন বীরবল।

—খুব পারছি। এক চোট হেসে নিলেন সম্রাট। তারপর বল্লেন—এই তলোয়ারের সমান ওজনের সোনা মহিলাটিকে দেবার ব্যবস্থা কর।

সম্রাটের নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হল। আনন্দে মহিলাটির চোখে জল এসে গেল। দু'হাত তুলে সম্রাটও বীরবলকে আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি ফিরলেন।

—শুনছ এই বৃদ্ধা মহিলা অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন, তোমাকে এর একটা বিহিত করতেই হবে।

বাড়ী ফিরতেই সুনয়না কথা কয়টি বলে।

—ইনি কে? বীরবলের প্রশ্ন।

—এঁর নাম হরিমতী। ছয়মাস আগে ইনি তীর্থে গিয়েছিলেন। তখন সঞ্চিত অর্থ পরিচিত এক সাধু বাবার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

—তা সাধুবাবা কি টাকা মেরে দিয়ে পালিয়েছেন?

—না বাবা সে পালায়নি। এখানেই আছে। এবার কথা বলে বৃদ্ধা।

—তবে?

—ব্যাপারটা হল তীর্থে যাবার সময় থলে ভর্তি টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে বলি—আপনি সন্ন্যাসী মানুষ। সে জন্য আপনার কাছেই বিশ্বাস করে এ থলিটি রাখতে চাই।

—তা তিনি কি বল্লেন?

—বল্লেন—আমি সাধু। সেজন্য ওসব স্পর্শ করব না। তুমি বরং আমার কুঁড়ে ঘরে গর্ত খুঁড়ে ওটা রেখে যাও। শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে সেই মত কাজ করলাম। তারপর নিশ্চিন্ত মনে তীর্থ করতে চলে গেলাম।

—তারপর ?

—তারপর ফিরে এসে থলি আনতে তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আমি তখন কুঁড়ে ঘরে ঢুকে সে গর্তটা খুঁড়লাম। কিন্তু কোথায় সে থলি ? চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম। সাধু বাবাকে বললাম এ কেমন ধরণের আচরণ ? আমার সর্বস্ব চলে গেলে আমি বাঁচব কেমন করে ? শুনে রেগে উঠে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন আমায়। বাবাঠাকুর। আপনি আমাকে বাঁচান। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন মহিলা।

—বুঝেছি। আমি সেই সাধুবাবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আপনি কবে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন ?

—গতকাল দুপুরে। সকালেই ফিরে এসেছি এখানে।

—কালই আসেন নি কেন ?

—ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করব ? একজন সন্ন্যাসী যে আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারেন স্বপ্নেও ভাবিনি। তারপর আমার অবস্থা দেখে পাড়ার সকলে পরামর্শ দিল আপনার সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা বলতে। যে জন্য মা-সুনয়নার শরণাপন্ন হলাম।

—ঠিক আছে, কাল সকালে আমি আপনার সঙ্গে সাধুবাবার কুটিরে যাব, তারপর আমি যা বলব সেই মত কাজ করবেন।

—তাই করব বাবা। আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব, বুঝতে পারছি না।

—আগে আপনার টাকাকড়ি উদ্ধার করি, তারপর কৃতজ্ঞতা জানাবেন। হাসতে হাসতে বলেন বীরবল।

—এই সেই ঘর বাবাঠাকুর।

বীরবল চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর বললেন—ওই তেঁতুল গাছটার পেছনে আপনি চলে যান—সেখান থেকে এদিকে নজর রাখবেন। যখন দেখবেন আমি দ্বিতীয়বার সাধুবাবাকে প্রণাম করছি তখন আপনি কাঁদ কাঁদ মুখ করে ঢুকবেন। তারপর আমাকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন এমন ভাব করবেন। শুধু একটা কথাই বলবেন—একজনের বিরুদ্ধে নালিশ আছে আপনার। সে আর কেউ নয়, স্বয়ং সাধুবাবাই।

—তাই করব বাবাঠাকুর। গাছের পেছনে চলে গেলেন বৃদ্ধা। বীরবল

এগিয়ে এসে ডাকতে থাকেন—ও সাধুবাবা বাড়ী আছেন কি ?

সাধুবাবা ঘর থেকে বার হয়ে এলেন। বীরবল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তাঁকে।

—দীর্ঘজীবী হও বৎস। বল কি প্রয়োজন ?

মাথা তুলে হাঁটু গেড়ে বসলেন বীরবল। তারপর থলি থেকে একটা বাক্স বার করলেন।

—আপনার আশীর্বাদ চাই প্রভু। শুনেছি আপনি সিদ্ধপুরুষ। অনেকদিন ধরেই আপনার পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছে ছিল। আজ সেই সৌভাগ্য হল।

সাধুবাবার চোখ দু'টি চক্‌চক্ করে ওঠে। চিন্তা করেন, রূপার ওই বাক্সটিতে কি আছে ? সোনা, হীরা, জহরত ?

—প্রভু। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আমার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু...।

—বল বৎস। এ সংসারে এসে মানুষের দুঃখ বিপদে যদি সাহায্যই না করতে পারলাম তবে আর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছি কিসের জন্য ? ভোগ, লিপ্সা, মোহ সব ত্যাগ করেছি বলেই তো মানুষের বিপদে নিজের এ দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। বল বৎস, সঙ্কোচ করনা।

—না প্রভু! এমন মহাত্যাগী পুরুষের ওপর পার্থিব সুখ দুঃখের ভার চাপানো ঠিক হবে না। আমার মন টেনেছিল, তাই চলে এসেছি। কিন্তু যে প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছি তা আপনার মত সিদ্ধপুরুষের কাছে কিছুতেই বলতে পারব না। বলে বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ান।

সাধুবাবার বাড়াভাতে ছাই পড়বার উপক্রম। চিন্তা করেন—বাক্সটা নিয়ে কি ও সত্যি সত্যি হাঁটা দেবে ? না না যেমন করে হোক বাক্সটা হাতাতেই হবে। তাই বলেন—বৎস! সঙ্কোচ বোধ করো না। কি হয়েছে বল। আমি নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করব, এযে আমার গুরুর আদেশ।

—আমি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আজমীঢ় চলে যাচ্ছি। এই বাক্সে অনেক হীরা জহরৎ আছে। দেখুন।

বীরবল বাক্সটা খোলেন। সাধুবাবার মুখের ভাব যা হয়েছে বলার নয়। এমন বাক্স হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল ? তবুও মুখে অন্য কথা বলতে হবে। তাই বলেন—টাকা মাটি, মাটি টাকা। তোমাদের মত গৃহীদের যতক্ষণ রক্তমাংসের শরীরটা আছে ততক্ষণ এর প্রতি আকর্ষণ থাকবেই। আমার

অবশ্য ওসব জিনিস স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু যেহেতু তোমাকে কথা দিয়েছি যেহেতু সে কথা রাখতেই হবে। এক কাজ কর তুমি, ওটা ঘরের এক কোণে পুঁতে রাখো। এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কিছু নেই।

—আপনার অনেক দয়া প্রভু। আপনার কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব। এই বলে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানান বীরবল। বাক্সটা তখন সাধুবাবার পায়ের কাছে।

—এবার আমার পালা। কাঁদ কাঁদ মুখে বৃদ্ধা এলেন।

সর্বনাশী! ওই হতচ্ছাড়ী বুড়ীটা আসার সময় পেল না? এখন যদি এই ধনবান ব্যক্তিটিকে সব বলে দেয় তবে তো বড় বিপদ।

ঠিক সেই সময় বীরবল মাথা তুলে বসলেন।

—একি! মহামান্য বীরবল আপনি? আপনাকেই তো আমি খুঁজ-ছিলাম। একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে আমার।

—কার বিরুদ্ধে মা?

ততক্ষণে সাধুবাবার মুখের চেহারাই পাল্‌টে গেছে। তিনি আকবরের রসিকরাজ সভাসদ বীরবলের কথা শুনেছিলেন, কিন্তু চোখে দেখেন নি। এখন এ বৃদ্ধা সব বলে দিলে তো বড় বিপদ! তিনি নিজে তো ওই বাক্স এখানে রাখবেনই না, উল্টে বৃদ্ধার টাকা তাঁকে দিয়ে ফেরত দেও-য়াতে বাধ্য করবেন। হয়ত বা সাজাও মিলতে পারে।

—বল মা কার বিরুদ্ধে? আবার বীরবলের সহানুভূতিপূর্ণ গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।

সাধুবাবা চিন্তা করলেন বৃদ্ধাকে তার টাকা ফিরিয়ে দেওয়া ভাল। কিন্তু বীরবলের ওই বাক্সটি কিছুতেই প্রাণে ধরে হাতছাড়া করা যাবে না। আজ বাক্সটা পেলে কাল ভোরে এটা নিয়ে দূরে কোথাও রওনা হয়ে যাব। সারা জীবনের মত অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আমার। আর এ দেশে ফিরে আসব না! তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—তুমি এসে পড়েছ? বাঁচা গেল। তোমার টাকার থলেটার কথাই ভাবছিলাম। ঠিক কোথায় রেখেছিলে বলতো বুড়ীমা?

—ওই তো ডান দিকের ওই কোণটিতে।

—মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে তোমার।

—না বাবা আমার খুব ভাল করেই মনে আছে ওখানটায় পুঁতেছিলাম।

—বেশ। আমি ধ্যানযোগে জেনে নিচ্ছি।

চোখ বুজলেন সাধুবাবা। বীরবল বৃদ্ধার দিকে তাকালেন। সরলা

মেয়েছেলে। উৎসুক হয়ে ভণ্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাসি দমন করলেন বীরবল।

—হ্যাঁ ঠিকই অনুমান করেছি। স্থান ভুল করেছ তুমি? ওই বাঁদিকের বস্তাটা সরিয়ে খোঁড়তো। আমি ধ্যানযোগে দেখলাম, ওখানেই রয়েছে তোমার থলি।

আনন্দে বৃদ্ধা ঘরের ভেতর ঢুকলেন। তারপর হাসি হাসি মুখে বার হয়ে এলেন।—বাবা! আমাকে ক্ষমা কর।

সন্ন্যাসীর পায়ে পড়লেন বৃদ্ধা।

—গত কালই যদি ধ্যানযোগে জেনে নিতেন...। কাঁদতে থাকেন তিনি।

—কেন মা কি হয়েছে?

—আমি না বুঝে মহামান্য বীরবলের কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম।

সাধুবাবা হাসলেন। কিন্তু বললেন—এর জন্য এত ব্যথা পাচ্ছ কেন? আসল ব্যাপারটা কি জান—টাকাকড়ি মানেই দুশ্চিন্তা—এতে স্মরণ শক্তি কমে যায়। মাথায় গোলমাল হয়। তোমারও ও ধরণের কিছু একটা হয়েছে। এবার তুমি এস।

—হ্যাঁ যাই বাবা। বীরবলের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানিয়ে চলে যান বৃদ্ধা।

—এবার বাক্সটা ঘরের যে কোন জায়গায় আপনি পুঁতে রেখে চলে যান। আমি আহ্নিক করতে বসছি।

—হ্যাঁ তাই যাচ্ছি।

—প্রভু আছেন? বীরবলের ভৃত্য হন্তদন্ত হয়ে এল। কেননা বীরবল তাকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন বৃদ্ধা বার হয়ে এলেই সে যেন আসে। এখানে আসবার সময় ভৃত্যকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।—বৃদ্ধা তেঁতুল গাছের আড়ালে লুকোলে ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন চাঁপা গাছের আড়ালে লুকোবার জন্য। তারপর কি বলতে হবে সেটা শিখিয়ে দিলেন চুপিচুপি।

—কি ব্যাপার কেষ্টা? তুমি আমার খোঁজ করছ কেন?

—হুজুর, আপনার ভাই এসেছেন দেখা করতে। শিগ্রী চলুন।

—ওহো! তাহলে ত আজমীঢ় যাওয়া হল না। আর আপনাকেও কষ্ট করতে হল না। বলে বাক্সটা হাতে নিয়ে বার হয়ে এলেন। সাধুবাবার রক্ত শুষে নেওয়া মুখখানি মনে পড়াতে পথের মধ্যেই হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন দু'জনে।

—কি ব্যাপার জাহাঁপনা। এত রাতে তলব করেছেন কেন আমায়? তাও আবার অন্দর মহলে?

—বলছি বীরবল। অস্থিরভাবে অলিন্দে পায়চারি করতে করতে বল্লেন সম্রাট আকবর।

—আপনি কি অসুস্থ?

—এবার হব। শোন বীরবল এই মুহূর্তে আমি একজনকে হত্যা করতাম। কিন্তু করলাম না। কেন জান? যাতে এই হত্যা কেন করলাম তার সাক্ষী তোমাকে রাখতে পারি।

—আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝছি না।

—এবার বুঝবে। বিনা দ্বিধায় বড়ি বেগমসাহেবার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে একটা দৃশ্য দেখে এস। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, তাই আর ঢুকলাম না। ফিরে এলে পরামর্শ করব কার কি শাস্তি হওয়া দরকার।

বীরবল শয়নকক্ষে এলেন। রূপার বাতিদানে বাতি জ্বলছে ঠিকই। কিন্তু সমস্ত ঘরখানাতে এক আলো আঁধারি মায়া বিরাজ করছে। বড়িবেগম-সাহেবা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। তার মুখে গলায় কোন ওড়না নেই। শুধু কামিজ আর গাড়ারা পরেই শুয়ে আছেন বেগমসাহেবা। কিন্তু পাশে ও কে শুয়ে? সেও বেগমসাহেবার দিকে পেছন ফিরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বেশ নাকও ডাকছে তার। বড়ি বেগমসাহেবার কক্ষে এ কোন্ পুরুষ? এটা সম্ভব হল কেমন করে? আজ তাঁর কক্ষে সম্রাট আসবেন এ কথা তো তিনিও জানেন ভাল করে। তবে এ ঘটনা ঘটল কেমন করে? প্রাণের ভয় কি কারো নেই?

বীরবল একটু তাকালেন বেগমের দিকে তারপর লোকটির কাছে গিয়ে বাতিটি ধরে তার মুখ দেখলেন।

—একি! এ যে স্বয়ং সম্রাট আকবরের খাস ভৃত্য। এখানে এল কি করে? আর বড়ি বেগমসাহেবার সঙ্গে তার রীতিমত গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠল! ছিঃ ছিঃ! আবার তাকালেন লোকটির দিকে। মুখের দু'পাশ দিয়ে লাল গড়িয়ে পড়ছে। ঘুমে এমনভাবে অচৈতন্যের মত পড়ে আছে যে বিশ্ব সংসার ডুবে গেলেও জ্ঞান হবে না তার। ধীরে ধীরে বীরবলের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। নিশ্চয় কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে।

কক্ষ থেকে বার হলেন বীরবল।

—দেখলে ত সব? এবার বল, তরবারির আঘাতে কার মাথাটা আগে

কাটব ?

—একটু অপেক্ষা করুন। আপনি কক্ষে এসে পালঙ্কের ওপাশে বসুন। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করি। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে আপনার দেওয়া শাস্তি মাথায় তুলে নিতে বাধ্য বেগমসাহেবা এবং আপনার বিশ্বস্ত নফর। কথা মত কাজ হল।

—বেগমসাহেবা, বেগমসাহেবা শিগ্রী উঠুন। তবুও দু'জনের কারো ঘুম ভাঙল না।

এবার বীরবল তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে জোরে ডাকলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকালেন তিনি। প্রথমটা আঁতকে উঠলেন বীরবলকে দেখে। তাড়াতাড়ি ওড়না দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিলেন। তারপর রাগত ভাবে বল্লেন, আপনাকে সৎ ব্যক্তি বলেই জানতাম। কিন্তু আপনার চরিত্র যে এত নীচে নেমে গেছে জানতাম না। কার হুকুমে এ ঘরে প্রবেশ করেছেন ? সম্রাট জেগে উঠলেই আপনার শাস্তির ব্যবস্থা করব। আপনার মত অসৎ ব্যক্তিকে বাঘের মুখে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। রাগে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকেন বেগমসাহেবা।

—বাঘ সিংহ যার মুখে মন চায় ফেলে দেবেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন আপনার শয্যার অংশীদার কে ?

—কি! লাফ দিয়ে উঠলেন বেগমসাহেবা। তারপর চাবুকটা টেনে নিয়ে মারতে উদ্যত হলেন তাঁকে।

—আপনার যত খুশী বেত মারবেন আমাকে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা সত্যি ফেলে দেবার মত নয়।

—দেখুন আপনার স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আপনি আর তানসেন আমাদের স্বামীর প্রতিটি মুহূর্ত এমনভাবে গ্রাস করে রেখেছেন যে আমরা তাঁকে কাছেই পাই না। যখন আমাদের মহলে আসেন তখন পরিশ্রান্ত থাকেন। বাতচিত হয় না তেমন। আবার ওদিকে তানসেনের সুমধুর গীত শুনতে শুনতে যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন জাগাতেও সাহস হয় না। আমাদের কত কথা থাকে, কিন্তু মনের কথা মনে রেখেই শুয়ে পড়ি। অথচ আপনি এ ধরণের নোংরা প্রশ্ন করে অপমান করলেন আমায় ?

—যতই ভাল বাসুন তিনি আপনাকে, এ কথা শুনলে কোতল করবার ব্যবস্থা করবেন।

—বেশ করবেন। কিন্তু অনুগ্রহ করে আপনার পাশে ছোট্ট কক্ষটিতে চলে যান। সেখান থেকে জাফরি দিয়ে সব ব্যাপারটা দেখুন। তারপর

বিচার করবেন।

একটু হতভম্ব হয়ে যান বেগমসাহেবা। তারপর অন্য কক্ষে চলে যান।

—এই ব্যাটা! ওঠ শিগ্গী। তার নাকে সুড়সুড়ি দিলেন বীরবল।

ধড়মড় করে উঠে বসে সে। বোকা বোকা চোখে চারিদিক তাকিয়ে লাফ মেরে খাট থেকে নামে। তারপর বীরবলের পা দু'টি জড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

—এ খাটে কেন শুয়েছিলি? জানিস না এখানে স্বয়ং সম্রাট এবং বেগম শোন?

—জানি। বড়ি বেগমসাহেবার বাঁদি জোহরা ভাল শয্যা রচনা করতে পারে না। এ কাজটা আমি খুব ভাল করে রপ্ত করেছি। সেজন্য স্বয়ং সম্রাট আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এ কক্ষের শয্যা রচনা করবার জন্য। সেকথা বেগমসাহেবাও জানেন। কাঁপতে কাঁপতে বলে সে।

—বেশ! শয্যা রচনা করতে গিয়ে শুলি কোন স্পর্ধায়?

—আজ্ঞে সেটাই অন্যায় হয়ে গেছে! এ মহলের সকলে আজ মীনবাজারে গিয়েছিলেন। জানতাম ফিরে এসে খানাপিনা সারতে সারতে রাত হয়ে যাবে, তাই সন্ধ্যার সময় শয্যা রচনা করতে এলাম। শয্যা রচনা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করবার জন্য নিজেই শুলাম। শোয়ামাত্র শরীরটা যেন ছেড়ে দিল। উঠব উঠব করেও না উঠে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। এজন্য দায়ী এই নরম শয্যা আর যমুনার বাতাস।

—বটে! বেগমসাহেবা যদি শুতে এসে দেখতেন তোকে, তবে তোর কি হত বলত!

—ওরে বাপ! ভাবতে পারি না। তিনি আমাদের সকলের মা। কিন্তু সেই তিনিই কিছুতেই ক্ষমা করতেন না। জান নিয়ে তবে ছাড়তেন।

—আমি একথা সম্রাট এবং তাঁর কানে দেবই।

—হুজুর! পায়ে পড়ি। এমন অন্যায় আর হবে না। আমি নাকে ক্ষত দিচ্ছি। এবারের মত মার্জনা করে দিন।

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে নাকে ক্ষত দিতে থাকে সে। জাফরি দিয়ে সব দেখে শিউরে ওঠেন বেগমসাহেবা। কপালে করাঘাত করেন।

—যা ব্যাটা। আর কখনও এমন করবি না। হাসি চেপে বললেন বীরবল।

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সে স্থান সে-ত্যাগ করল।

এবার সম্রাট বার হয়ে এলেন।

—বীরবল! তোমাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ জানাব, জানি না। আজ তুমি না থাকলে দুটি জান নিয়ে রক্তাক্ত করতাম নিজের হাত দুটি।

আবার কেঁপে উঠলেন বড়ি বেগমসাহেবা।

—আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। আপনি বার হয়ে আসুন। বেগমের উদ্দেশ্যে বললেন বীরবল। ওড়নায় মুখ ঢেকে বার হয়ে এলেন বেগমসাহেবা।

—জাহাঁপনা! ছিঃ ছিঃ কি যে হয়ে গেল? মীনাবাজার থেকে ফিরে এসে নুরুউন্নিষার মহলে গিয়েছিলাম। সে পুতুলের বিয়ের সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। একেবারে বয়স অল্প ওর। না গেলে কান্নাকাটি করবে তাই গেলাম। সেখানে খানাপিনা ও নাচগানের ব্যবস্থাও ছিল। সারাদিনের ধকলের পর ক্লান্তই ছিলাম। যখন শয়নকক্ষে এলাম, তখন মনে হল আপনি পেছন ফিরে শুয়ে নাক ডাকছেন। তাই আর দ্বিধা না করে শুয়ে পড়লাম। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল বীরবলের ডাকে। আমি না বুঝে খুবই ক্ষেপে গিয়ে যাতা গালাগাল করেছি ওঁকে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, উনি না থাকলে ভুল বুঝে কত বড় ভুল করতেন আপনি।

—সত্যি বীরবল না থাকলে কালকের দুনিয়া আর দেখা হত না তোমাদের। ফলে অনুশোচনায় সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরতাম।

—এবার একটা কথা বলব বেগমসাহেবা? বললেন বীরবল।

—বলুন।

—যে কথা একদিন মেনে নেন নি আজ কিন্তু তার সত্যতা প্রমাণ করে দিলাম।

—কি রকম?

—যা চোখ দিয়ে দেখি তা অনেক সময় সত্য নাও হতে পারে।

—ঠিক ঠিক। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন সম্রাট। আর লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন বেগমসাহেবা।

—কি বিপদ বল দেখি বীরবল!

—কেন জাঁহাপনা কি হল?

—সিংহলের রাজার কাছ থেকে দূত এসেছে।

—দূত! কেন?

—সিংহলের রাজা এক অদ্ভুত প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন আমার সভায় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির অভাব নেই। সেজন্য আমার কাছ থেকে

তিনি একঘড়া জ্ঞান প্রার্থনা করেছেন।

—একঘড়া জ্ঞান! সে আবার কী?

—তা জানি না। মনে হয় আমাদের বোকা বানাতে চান তিনি। কিন্তু তুমি থাকতে আমরা কি হেরে যাব?

একটু চিন্তা করলেন বীরবল। চিরপরিচিত সেই দুষ্টু হাসিটি তাঁর ওষ্ঠে প্রকাশ পেল। বল্‌লেন, চিন্তা করবেন না সম্রাট। লিখে দিন, জিনিসটা দুষ্প্রাপ্য করেক সপ্তাহ সময় লাগবে পেতে।

—তারপর?

—তারপর যাবে একঘড়া জ্ঞান।

—কিন্তু সেটা কি করে পাঠাবে? আমার বুদ্ধিতে আসছে না।

—সেটা আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।

—দেখো, মান যেন বজায় থাকে।

—নিজের জান দিয়েও আপনার মান রাখব। আমাকে এখনি ছেড়ে দিন কয়েকদিনের জন্য।

—মঞ্জুর।

বাড়ী এলেন বীরবল।

—কি গো কি মতলব তোমার?

—সম্রাট কিছু পুরস্কার দিলেন। চল কয়েকদিনের জন্য বেড়িয়ে আসি।

---বাপের বাড়ী যাব?

—হ্যাঁ চল। অনেক দিন আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না। তুমি গোছগাছ কর। আমি বাগানে যাচ্ছি।

---মালী! মধুসূদন কোথায় গেল?

---সে একটু কাজে গেছে। আমাকে হুকুম করুন কি করতে হবে।

—বেশ! বাজার থেকে কয়েকটা সরুগলার মাটির ঘড়া নিয়ে এস।

---আমার সঙ্গেই আছে। মালী গোটা আটেক ঘড়া নিয়ে এল।

—হ্যাঁ ঠিক আছে। ঘড়ার দাম দিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওগুলো নিয়ে কুমড়ো ক্ষেতের দিকে এস। আমি একটা নিয়ে যাচ্ছি।

---আমাকে বলুন না কি করতে হবে?

—দেখোই না।

বীরবল খুব সাবধানে একটি কুমড়ো ফুলের ওপর ঘড়াটা উল্টো করে বসালেন।

—এইবার সব ঘড়াগুলো তুমি এভাবে বসাও। শোন আমি কয়েক

দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। তোমার ওপর এর ভার দিয়ে গেলাম। সব সময় তুমি আর মধুসূদন এদিকে লক্ষ্য রাখবে। কাউকে ছুঁতে দেবে না। সম্রাটের লোক আমার খোঁজে এলে কি বলতে হবে বলে যাব।

—ঠিক আছে।

—তুমি ফিরে এসেছ বীরবল? উঃ কি চিন্তাই যে করছিলাম। এর মধ্যে লোকও পাঠালাম তোমার কাছে। কিন্তু ফিরে এসে ওরা বলে তোমার অনুচরেরা নাকি বলেছে তুমি জ্ঞান সংগ্রহ করতে গিয়েছ। তা হয়েছে জ্ঞান সংগ্রহ?

—হয়েছে।

—কি জানি কি মতলব এঁটেছ আবার। এদিকে দূত অপেক্ষা করছে আশঙ্কা প্রকাশ পায় আকবরের কণ্ঠে।

—চিন্তা করবেন না জাঁহাপনা। দু'হাতে তালি দিলেন বীরবল।

এবার তাঁর একজন চাকর সুন্দর রূপার একখানা থালার ওপর একটা ঘড়া নিয়ে সভায় এল।

—এই যে আপনাদের রাজার জিনিস। কিন্তু পাত্রের ভেতরকার জিনিসটাই তাঁর। কাজেই আমাদের দামী এ ঘড়াটা ফেরত পাঠাবেন। দূতকে উদ্দেশ্য করে বললেন বীরবল।

—আর শুনুন, এর ভেতর যে জ্ঞানের ফলটি আছে তা তিনি অবশ্যই বার করে নেবেন কিন্তু পাত্রের যেন এতটুকুও ক্ষতি না হয়। এমনকি ফলের গায়েও যেন কোন আঁচড় না লাগে। আবার দূতকে বললেন বীরবল।

—আমি একটু চোখ বোলাতে পারি? দূতের প্রশ্ন।

—অবশ্যই। বীরবল ঘড়ার মুখ খুলে দিলেন।

দূতের চোখ দু'টি ছানাবড়া হয়ে গেল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি পেল বীরবলের। হাসি পেল আকবর এবং সভাসদ্দের। কিন্তু হাসলেই অপমানিত বোধ করবেন দূত। কিন্তু যারা হাসি চাপতে পারল না তারা সভাকক্ষ ছেড়ে পালাল। আকবরকে কুর্ণিশ পর্যন্ত জানাতে পারল না।

—আরো পাঁচঘড়া জ্ঞান আছে আমার কাছে। দরকার হলে নেবেন কিন্তু।

—মনে হয় আর দরকার হবে না। এই একটিই শিক্ষা পাবার পক্ষে

যথেষ্ট। খড়াটা নিতে নিতে বলেন দূত।

—এবার বিদায় দিন। আমাদের সব পরিকল্পনা বৃথা হয়ে গেল। বুদ্ধির খেলায় সিংহলের রাজার বিদূষক যে মহামান্য বীরবলের কাছে শিশু, সেকথা চিন্তা করা উচিত ছিল।

—কার? হেসে প্রশ্ন করেন আকবর।

—আজ্ঞে আমার। আমি সেই বিদূষক। দূত হয়ে এসেছি এখানে। ওনাকে জব্দ করবার জন্য রাজার কানে এ বুদ্ধিটা আমিই দিয়েছিলাম।

বিদায় নিয়ে গেলেন দূত।

সমস্ত সভা কক্ষ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। সম্রাট সিংহাসন থেকে নেমে জড়িয়ে ধরলেন বীরবলকে।

—হাজাম সাহেব, যদি আমাদের একটা উপকার কর, তাহলে এক থলে সোনা পাবে।

গিয়াসুদ্দীন এবং তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু এলেন সম্রাটের নাপিতের বাড়ী। এঁরা সকলেই দরবারের সম্মানিত ব্যক্তি।

—আপনারা আমার কাছ থেকে এমন কি কাজ চাইছেন যার দ্বারা আপনাদের উপকার হবে?

—বীরবলকে আর সহ্য করতে পারছি না। ওকে এ দুনিয়া থেকে না সরানো পর্যন্ত শান্তি নেই আমার। আজকাল আমি যে হাস্যরসের গল্পগুলো সম্রাটকে বলি, তা যেন ওনার আর মনেই ধরেনা। বললেন গিয়াসুদ্দীন।

—তা অবশ্য ঠিক। আপনার যন্ত্রণা বুঝতে পারছি। এবার বলুন কি করতে হবে?

গিয়াসুদ্দীন ফিস্‌ফিস্‌ করে কয়েকটা কথা বললেন।

প্রথমটা চমকে উঠলেও পরে মন দিয়ে সব শুনল সে। —বেশ রাজী আছি। কিন্তু অগ্রিম কিছু না দিলে কাজ করবনা।

—এই যে এনেছি। সে কথা স্মরণ করেই তিনটি মোহর দিয়ে গেলাম। কিন্তু কাজে সফল হওয়া চাই।

—আর বলতে হবেনা। কাল দরবারে গেলে সব বুঝবেন।

—দেখা যাক। চলে গেলেন গিয়াসুদ্দীন।

—হাঃ হাঃ করে হাসল হাজাম সাহেব।

—হ্যাঁগা সম্রাটের লোকেরা এসেছিল কেন?

—এই নাও পেয়ারী তিনটি মোহর। বলে বিবির হাতে মোহরগুলো দিল।

—সেকি! হঠাৎ মোহর কিসের জন্য?

—মোটে তিনটে মোহর দেখেই চমকে উঠলে? এরপর একথলে সোনা আনব ঘরে।

— চুরি করবে নাকি?

—এতদিন ঘর করে শেষ পর্যন্ত আমার সম্বন্ধে এই চিন্তা করলে? গাল ফোলায় হাজাম সাহেব।

—আহা! রাগ করছ কেন? মিঞার গায়ে ঢলে পড়ল বিবি।

—এই তোমার হাত দিয়ে ভীষণ আঁশটে গন্ধ বার হচ্ছে।

—মাছ কুটতে কুটতে উঠে এলাম যে।

—কেন? হাত ধোওনি?

—ধুয়েছি। তা এক শিশি আতরও তো আন না কোনদিন! আবার বলছ আঁশটে গন্ধ। এখন বিবির গোঁসা করার পালা।

—এবার নানা ধরণের আতর এনে দেব। বিবিকে কাছে টানে মিঞা। তারপর কানে কানে অনেক কথা বলে।

—এটা কি ঠিক হবে?

—আলবাৎ হবে। তুমি শুধু দেখে যাও। এবার তোমার গা ভর্তি গয়না গড়িয়ে দেব।

—গা ভর্তি গয়না! এ যে ভাবতেই পারি না?

—যখন পারবে তখনই বুঝবে সেটা কত সত্য। যাও পেয়ারী. মোহরগুলো বাক্সে রেখে দিয়ে এস।

—হ্যাঁ যাই। আনন্দে কোমর দোলাতে দোলাতে হাজাম সাহেবের বিবি ঘরে ঢোকে।

—বীরবল অনেক অসাধ্য সাধনই তো তুমি করেছ, এবার আর একটা সে ধরণের কাজ দিচ্ছি। মনে হয় এবারেও সফল হবে।

—সেটা কী জাহাঁপনা?

—শোন তোমাকে স্বর্গে যেতে হবে।

—স্বর্গে! এই রক্তমাংসের শরীর নিয়ে?

—শুনেছি মহাভারতে আছে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়েছিলেন, আর তুমি পারবে না?

– তা বটে! পৃথিবীতে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই সশরীরে

স্বর্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার কি ইহলোকের সব কাজ চুকে গেছে ?

—না না। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তোমার পার্থক্য একটু আছে বৈকি। তোমার যে এখানে অনেক কাজ এখনও বাকী। তিনি আর ফিরে আসেননি, কিন্তু তোমাকে আসতে হবে আবার। আমি একটা বিশেষ কাজে তোমাকে সেখানে পাঠাচ্ছি।

—কি কাজ। বিস্মিত স্বর বীরবলের কণ্ঠে।

—শোন বড় ইচ্ছা জাগছে আমাদের পূর্বপুরুষদের সংবাদ জানতে। তুমি এই উপকারটুকু একটু কর।

—আশ্চর্য। এ অভাবনীয় পরিকল্পনাটা আপনার মাথায় এল কেমন করে ?

—আমার মাথায় আসেনি। আমার নাপিতই এই বুদ্ধিটা দিয়েছে আমায়। শুধু তাই নয়, যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে একমাত্র তোমারই নাম উল্লেখ করেছে সে। ভেতরকার ব্যাপার কিছু বুঝেছ ?

—পারছি। বীরবলের কপালে চিন্তার রেখা দেখা দেয়।

—কী করবে ?

—আপনার আদেশ পালন করব। তবে যাবার আগে আমার পরিবারের একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই। সেজন্য আজ থেকে কয়েকদিনের ছুটি চাই।

—বেশ দিলাম। কিন্তু কোন পথ দিয়ে সেখানে যাবে জানোতো ?

—জী নেহি। সে বুদ্ধিটাও কি হাজাম সাহেব দিয়েছে ?

—হ্যাঁ। শেনি সাহেবের বাইরে একটি খোলা মাঠে হাজারটা খড়ের আঁটি একটার পর একটা সাজানো হবে। তারপর তুমি যখন খড়ের মাথায় উঠবে তখন তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে।

—তারপর ?

—তারপর ধোঁয়ার সঙ্গে বেহেস্তে গিয়ে পৌঁছাবে তুমি।

—বাঃ। চমৎকার পরিকল্পনা। ঠিক আছে। আপনি লোক লাগিয়ে শহরের বাইরে খোলা মাঠে খড়ের আঁটি জড় করার ব্যবস্থা করুন।

—বীরবল, তোমার ওপর কিন্তু অনেক ভরসা আমার।

—আশা করি ব্যর্থ হবোনা।

বিদায় নিয়ে বার হয়ে এলেন বীরবল। চিন্তা করলেন এই দুর্বুদ্ধি ঠিক নাপিতের নয়। টাকার লোভে এই পরিকল্পনাটি সে সম্রাটকে দিয়েছে। কাজেই ওকে জব্দ করতে হবে। ব্যাটাকে দেশছাড়া করতেই হবে।

—কিগো অসময়ে ফিরে এলে যে ? ঘরে প্রবেশ করে চিন্তান্বিত বীরবলকে

প্রশ্ন করে সুনয়না।

—আবার শক্ররা লেগেছে পেছনে।

—তোমাকে সম্রাট এত ভালবাসেন বলে অনেকেরই হিংসা তোমার ওপর। তাই না বাবা? এবার কথা বলে বারো বছরের মেয়ে রঞ্জিতা।

—হ্যাঁ মা, দুনিয়াটা বড় জটিল।

—তা এবার তোমার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র নেওয়া হয়েছে?

বীরবল সব বলে। শুনে সুনয়নার মুখ শুকিয়ে যায়।

—তাহলে কি করে এর থেকে পরিত্রাণ পাবে? কাঁদ কাঁদ স্বর সুনয়নার কণ্ঠে।

—উপায় একটা হবেই।

—মা তুমি সবটাতে ভয় পেও না। আমিও এখন এ ব্যাপারে বাবাকে পরামর্শ দিতে পারি।

—তুই পরামর্শ দিবি? বিস্মিত স্বর সুনয়নার কণ্ঠে। বীরবল কিন্তু তাকালেন মেয়ের দিকে। বুদ্ধিদৃপ্ত উজ্জল চেহারার এই বালিকাটি অনেক ব্যাপারেই এ পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে

—তোর মাথায় কি মতলব এসেছে? সস্নেহে বলেন বীরবল।

—মার সামনে বলব না। কোন সময়ে পাড়ার সঙ্গিনীদের কাছে গল্প করে ফেলবে। হাসতে হাসতে বলে মেয়ে।

কথাটা মিথ্যে নয়। তাই কপট রাগের ভঙ্গীতে সুনয়না বলে—বেশ! যাচ্ছি তোদের বাপ-বেটির পরামর্শ সভা থেকে। যখন পেটে টান পড়বে তখন আবার এই মাকেই প্রয়োজন হবে তোর।

সুনয়নার কথা শুনে হেসে ফেলে দু'জনে। তারপর মেয়ে এগিয়ে আসে বাপের কাছে। বলে, এ পরিকল্পনাটি কি ভাবে আমার মাথায় এল জান?

—কি পরিকল্পনা, তাইত জানলাম না এখনও!

মেয়ে তখন চুপিচুপি বল্‌ল কৌশলটির কথা।

সব শুনে বীরবল মুগ্ধ হলেন। বল্‌লেন—সত্যি অবাক করলি তুই আমাকে! এবার বল, এ পরিকল্পনার প্রেরণা পেলি কেমন করে?

—সম্রাটের এক কন্যা আশরফির সঙ্গে আমার যে দারুণ বন্ধুত্ব। আমি প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় সে। উৎসব দেখতে গিয়ে চিকের আড়ালে বসেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তারপর প্রায়ই বাঁদীকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠায় আমায়। ওর কাছ থেকেই প্রাসাদের

অনেক গুপ্তস্থানের কথা জেনেছি। তার থেকেই পরিকল্পনাটা মাথায় এসেছে।

—আমি ভাবছি কাল থেকেই বিশ্বস্ত কয়েকজন বন্ধুবান্ধব দিয়ে সুড়ঙ্গ পথটা খোঁড়া শুরু করে দেব।

—হ্যাঁ খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। শোন বাবা, যেখানে খড়ের আঁটিগুলো চুড়ো করে রাখা হবে, বাড়ী থেকে সে পর্যন্তই সুড়ঙ্গ পথটা খোঁড়া হবে। আর—।

—বল মা, থামলি কেন ?

—আর সুড়ঙ্গে ঢোকার পথের কাছেই তুমি নিজের শোবার জায়গা বেছে নেবে। আমি আগের দিন রাত্রে ওখানে গিয়ে কয়েক আঁটি খড় দিয়ে সুড়ঙ্গ পথটা ঢেকে রাখব।

—তাই হবে মা। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বীরবলের মুখ।

আজ বীরবলের স্বর্গে আরোহণ করবার দিন। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। কেউ কেউ চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করেছেন। সম্রাট যে কি ভুল করলেন, এখন বুঝতে পারছেন না। কিন্তু যখন শোকে অনুশোচনায় প্রকৃত ব্যাপারটা উপলব্ধি করবেন। বললেন একজন।

বীরবল এলেন। সুড়ঙ্গপথের কাছেই জায়গা বেছে নিলেন। বুদ্ধিমতী মেয়ে এমন সূক্ষ্মভাবে নিশানা রেখেছিল যে কোন অসুবিধা হল না।

—ওকি! তুমি ওখানে শুলে কেন ? খড়ের গাদির মাথায় গিয়ে ওঠ। বলল শত্রুপক্ষের একজন।

—সত্যি আপনি নির্বোধের মত কথাটা বললেন। খড়ের গাদির মাথায় চড়লে আগুন দেখে যদি ভয়ে লাফ মেরে পালিয়ে যাই ?

—হ্যাঁ তা বটে, তা বটে। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে সে।

—শুনুন, এখানে শুলাম। আপনারা খড়ের গাদিগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দিন, তারপর অগ্নিসংযোগ করুন। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেলে আমি স্বর্গে চলে যাব।

—ঠিক কথা। এবার সেই মত ব্যবস্থাই হল। খড়ের গাদিতে অগ্নি সংযোগ করা মাত্র নিমেষে জ্বলে উঠল। ভয়ে জনতা চিৎকার করে যে যেদিকে পারল ছুটল। কেউ দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখলেন সম্রাট আকবর। চোখদু'টি জলে ভরে

গেছে। তবুও তাঁর মন বলতে লাগল তাঁর বীরবল ঠিকই বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দেবে শত্রুপক্ষকে।

—উঃ! কি যে চিন্তা হচ্ছিল। স্বামী ও মেয়েকে সুড়ঙ্গ পথ ধরে ফিরে আসতে দেখে কথা কয়টি বলে সুনয়না।

—মা, বাবা কিন্তু এখন কয়েকমাস গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন। তুমি কিন্তু কারো কাছে কিছু গল্প কর না।

—আরে নারে বাবা না। তোরা ভাবিস কি আমায়?

—এখন আর কথা নয়। কয়েকমাস ফূর্তি করে নিই। বলেন বীরবল।

—এখানেই থাকবে তো? প্রশ্ন করে সুনয়না।

—মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমি আজ রাতেই আমার বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে কাছাকাছি একটা গ্রামে আশ্রয় নিচ্ছি। বলেন বীরবল।

—আমরা এখানেই থাকব? সুনয়নার প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, তা নাহলে লোকে সন্দেহ করবে। উত্তর দেন বীরবল।

—দিদিগো! কাঁদতে কাঁদতে একদল মহিলা প্রবেশ করে বীরবলের প্রাসাদে।

তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে বার হয়ে এলেন সুনয়না। আর সেই সুযোগে বীরবল সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

—দিদি, তোমার কপাল যে এভাবে পুড়বে ভাবতে পারিনি। উচ্চ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে মহিলারা।

—আমি কিন্তু কাঁদব না। তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলে সুনয়না।

—কেন? স্বামীর জন্য এতটুকুও শোক হচ্ছে না?

—না। আমি জানি, তিনি সেখান থেকে ফিরে আসবেনই।

সমবেত মহিলারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

দেখতে দেখতে চারটি মাস কেটে গেছে। সভার সবাই বেশ বুঝতে পারছে আর বীরবল ফিরে আসবেন না। ঠিক এমনি সময়ে একমুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে বীরবল রাজাকে হাসি হাসি মুখে কুর্ণিশ জানালেন। খাসা টাটকা জিনিস খেয়ে তাঁর শরীরও বেশ ভাল হয়ে গেছে।

—বীরবল! তুমি এসেছ? আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন সম্রাট। সভার কয়েকজন ছাড়া আর সকলের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শত্রুপক্ষ হতভম্ব হয়ে গেলেন।

—জী। স্বর্গ থেকে এই মাত্র এলাম। ওখানকার সব খবর ভাল। আপনার পূর্বপুরুষেরা আমাকে পেয়ে তো দারুণ খুশী।

—কেমন আছেন তাঁরা? আগ্রহ প্রকাশ পায় আকবরের কণ্ঠে।

—খুব ভাল, খুব ভাল। আপনাকে তাঁরা আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। এই বলে বক ফুল দেন সম্রাটের হাতে।

—আজ্ঞে বল্‌লেন এর বড়া খেতে দারুণ। বড়া খেলেই তাঁদের কথা মনে হবে।

—বেশ দাও। সাগ্রহে কাগজের ঠোঙাটা নিলেন আকবর।

—কিন্তু তুমি এক মুখ দাড়ি রেখেছ কেন? বললেন আকবর।

—আর বলবেন না জাহাঁপনা, স্বর্গে সব ভাল কেবল নাপিতের বড় অভাব। সেজন্য আপনার পূর্বপুরুষরা আপনার নাপিতকে সেখানে পাঠিয়ে দেবার কথা বলেছেন।

—অবশ্যই অবশ্যই। সঙ্গে সঙ্গে হাজামসাহেবকে আনা হল।

—তোমাকে আগামীকাল স্বর্গে যেতে হবে, কারণ সেখানে নাপিতের বড় অভাব।

—আজ্ঞে আমি কি করে যাব? কাঁপতে কাঁপতে বলে সে।

—কেন বীরবল যেভাবে গিয়েছিলেন?

—অ্যাঁ। প্রায় অজ্ঞান হবার যোগাড় তার।

—আপনারা আমাকে প্ররোচনা দিয়েছিলেন এবার বাঁচান আমাকে। সন্ধ্যেবেলা সর্দারের পায়ে কেঁদে পড়ল হাজামসাহেব ও তার বোরখা পরিহিতা বিবি।

—কেন? একথলে সোনা আর তিনটি মোহর তো আগেই দিয়েছি তোমায়। বিপদ থেকে উদ্ধার করার কথা তো কিছু হয়নি তোমার সঙ্গে।

—তবে কি হবে?

—আমি তার কি জানি?

—শালা বদমাইস। বলে সঙ্গে সঙ্গে বিবি একমুঠো ধুলো সর্দারের চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় তারপর মিঞার হতে ধরে ছুটতে থাকে।

—ভাগ্যিস একগা গয়না পরেই বার হয়েছি। অনেকদিনের খাওয়া পরার সমস্যা ঘুচল।

—সত্যি তুমি আমার পেয়ারী।

—এই চুপ। এখন মহব্বত করার সময় নয়। ছুট বাবো ছুট।

—হুসেন খাঁ, তুমি হচ্ছ বীর স্বয়ং সম্রাটের আকবর শ্যালক, তা তোমার এই অবস্থা কেন ? বলে আনোয়ার খান।

—কেন, কি হয়েছে ?

—তুমি থাকতে বীরবল কেন মন্ত্রীর আসনে থাকবেন ?

—ওঃ ! এই কথা ? তা বীরবলের স্থানে আমার যাবার মত যোগ্যতা কোথায় ?

—আছে আছে। সে তুমি বুঝবে কেমন করে।

—কিন্তু সম্রাট তাঁকে যখন সে পদে বহাল করছেন না তখন আর কি করব?

—একটা উপায় বলব ?

—বলুন।

—তোমার ভগিনী এখন সম্রাটের নয়নের মণি। সম্রাট এখন বেশীর ভাগ দিন তার মহলেই যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ সে কথা ঠিক। একদা অসুস্থ সম্রাটকে আমার ভগিনী যে সেবা করেছেন, সত্যি তার তুলনা নেই। সম্রাট নিজেই সে কথা সব সময় স্বীকার করেন। দেখি তাহলে ভগিনী ফতিমাকেই ধরি।

—সেই ভাল।

—জানি না নসিবে কি লেখা আছে ? ভগিনীর মহলের দিকে অগ্রসর হন হুসেন খাঁ।

—কি ব্যাপার বেগম। মুখটা এত ভার ভার ঠেকছে কেন ?

—আমার দুঃখে আপনার কি আসে যায় ? অভিমান জড়িত স্বর ফতিমার কণ্ঠে।

—সেকি ! হঠাৎ এ ধারণা হল কেন ? আজকাল তোমার মহলে আমি কি কম আসছি ?

—তা অবশ্য নয়। কিন্তু একবারও তো মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করেন না, আমার অন্তরের ইচ্ছাটা কী ?

—হ্যাঁ তা অবশ্য করিনি। কিন্তু তুমি নিজেও তো আমার কাছে ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে পার।

—করলেই কি রাখবেন ?

—রাখার মত হলে রাখব।

—বেশ, তাহলে বীরবলকে পদচ্যুত করে সেই স্থানে আমার ভাইকে নিয়োগ করুন।

—এটা কি একটা কথা হল? বীরবলের মত যোগ্যতা কার আছে?

—আমার ভাই-এর সে পরীক্ষা তো কোনদিনও নেননি।

—কিন্তু বিনাদোষে তাকে পদচ্যুত করব কেমন করে?

—হ্যাঁ সে চিন্তাও করে রেখেছি। তাঁকে তাঁর অসাধ্য কোন কাজ করতে দিন। না পারলে চাকরী খতম।

—কিন্তু কি অসাধ্য কাজ দেব তাকে? হেসে প্রশ্ন করেন সম্রাট।

—আগামীকাল প্রভাতে আপনি যখন বাগিচায় বেড়াবেন তখন তাঁকে বলবেন তিনি যেন আপনার কাছে আমাকে নিয়ে যান।

—তারপর?

—তারপর আর কি, আমি কিছুতেই যাব না। হুকুম না মানার অজুহাতে চাকরী চলে যাবে।

সম্রাট অতিকষ্টে হাসি সম্বরণ করলেন।

—বলুন কি হুকুম জাহাঁপনা?

—ফতিমা বেগম দারুণ মান করেছেন। পারবে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসতে? প্রভাতে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বললেন সম্রাট।

—কি ব্যাপার? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন বীরবল।

—ব্যাপার ট্যাপার বুঝি না। না আনতে পারলে কাল থেকে তোমার স্থানে বহাল হচ্ছে হুসেন খাঁ। বুঝেছ কিছু? অর্থপূর্ণ হাসি হাসেন সম্রাট।

—ও বুঝেছি। বীরবলও হাসতে হাসতে উত্তর দেন। তারপর ফতিমা বেগমের মহলে চলে যান। যাবার আগে অবশ্য অনুচরের কানে কানে কিছু বলে যান।

—বেগম সাহেবা, আমি বাদশাহের কাছ থেকে এক সংবাদ এনেছি। আপনি অনুগ্রহ করে সেখানে চলুন।

—না। চিকের আড়াল থেকে জবাব দিলেন বেগম।

—চলুন না অনুগ্রহ করে। সম্রাট অপেক্ষা করছেন।

—বললাম তো যাব না। কেন বিরক্ত করছেন?

—একি! তুমি কেন এখানে? হঠাৎ যেন অনুচরের প্রবেশে বিস্মিত হন বীরবল।

—আপনি কি বেগমসাহেবাকে ডাকতে এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ। কেন ?

—সম্রাট বললেন এখন কারো আসার দরকার নেই। তিনিই পাঠালেন আমায়।

—কেন কি ব্যাপার ?

—সেই যে সে এসেছে। একেবারে অপ্সরা। কিছু খাইয়ে সম্রাটকে একেবারে হাতের মুঠোয় করে ফেলবে। কথাগুলো আস্তে বললেও এমন ভাবে বলল অনুচর যেন ফতিমা বেগম শুনতে পান।

—ও আচ্ছা। তাহলে বেগমসাহেবা আপনার আর যাবার দরকার নেই। আমরা চললাম। চিকের উদ্দেশ্যে কথা ছুঁড়ে দিলেন বীরবল।

—অপ্সরা। তুক করবে ? কার কথা বলছে ওরা ? সঙ্গে সঙ্গে বোরখায় আবৃতা হয়ে বার হয়ে এলেন বেগম সাহেবা।

—দাঁড়ান, যাবেন না।

—কেন ?

—আমার হুকুম।

—বেশ।

—তুমি চলে যাও। অনুচরকে বলেন বীরবল।

—কি বলতে চান বেগমসাহেবা ?

—ওই ডাকিনীর হাত থেকে সম্রাটকে উদ্ধার করতে হবে।

—একবার অতিকষ্টে সুস্থ করেছি তাঁকে। আসুন আমার সঙ্গে।

—চলুন। হাসি সম্বরণ করেন বীরবল।

—কই। কোথায় সেই ডাকিনী ?

- ডাকিনী। কার কথা বলছ ? অবাক হন সম্রাট। চারদিক তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে যান ফতিমা।

—আমি কিন্তু কিছু বলিনি। ভাল মানুষের মত মুখ করেন বীরবল।

—বুঝেছি সব চালাকি ! কেমন কায়দা করে নিজের সঙ্গে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন ? চোখে প্রায় জল এসে পড়ে ফতিমার। বোরখার আড়ালে মুখখানি দেখতে পান না আকবর। তাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলেন—এঁকে হারানো কি এত সোজা ? নিজের মহলে ফিরে যাও বেগম। মনে দুঃখ পেওনা।

—আপনার কি বক্তব্য ?

—বলছিলাম বহুদিন ধরে হিন্দুমন্ত্রী তাঁর পদে বহাল হয়ে রয়েছেন, অথচ হুসেন খাঁ কোন সুযোগ পাচ্ছেন না।

আকবর তাকালেন ঈশান খাঁ নামে ওমরাহের দিকে। বুঝলেন বীরবলের আর এক শত্রু এ। কিছুতেই সহ্য করতে পারছেনা তাকে। এখন হুসেন খাঁ নিজের বোনকে ছেড়ে ঈশান খাঁকে ধরেছে।

—বেশ, সুযোগের ব্যবস্থা করছি। আবুল ফজলের দিকে তাকালেন আকবর। তারপর কানে কানে কি যেন বললেন। উঠে চলে গেলেন আবুল ফজল।

—ওদের দু'জনকে ব্রহ্মদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

—কেন ?

—একটা খুব জরুরী চিঠি আছে। সেটা ব্রহ্মদেশের রাজার হাতে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

—বেশ তাহলে ওদের প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিন।

ঠিক সেই সময় বীরবল এলেন।

—আজ আর সভায় থাকার দরকার নেই। তুমি বাড়ী থেকে তৈরী হয়ে এসো।

—কেন ?

—ব্রহ্মদেশে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে অবশ্য হুসেন খাঁ থাকবে। সেখানে কেন যাবে জান ?

—জী নেহি।

—ঠিক সেই সময়ে আবুল ফজল এলেন। হাতে তার শীলমোহর করা একটা চিঠি।

—এ চিঠি রাজার হাতে দেবে। সম্রাট বললেন বীরবলকে।

—তাই করব জনাব। উত্তর দেন বীরবল।

—ব্যাপারটা কিছু বুঝছ ? অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সম্রাট।

—চেষ্টা করছি। একটু মুচকি হাসি দিয়ে উত্তর দিলেন বীরবল।

হুসেন খাঁকে মন্ত্রী করবার জন্য এখনও কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাহলে ষড়যন্ত্র করছে ? সম্রাটের অর্থপূর্ণ দৃষ্টির অর্থ বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেন বীরবল।

—এটা কি করে সম্ভব ? এর মানেটা কি ? চিঠিটা পড়ে বলে উঠলেন ব্রহ্ম দেশের রাজা।

—কি হয়েছে মহারাজ ? উদ্বিগ্ন হলেন মন্ত্রী।

—হিন্দুস্থানের বাদশাহ চান যে পূর্ণিমার রাত্রে আমি তাঁর প্রেরিত লোক দুটোকে যেন ফাঁসি দিই।

—আশ্চর্য তো ? এর মধ্যে মনে হয় সন্দেহজনক কিছু আছে। উনি তো ওদের আগ্রাতেই ফাঁসি দিতে পারতেন।

—হ্যাঁ আমারও মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। আপনি কি মনে করেন ?

—আমার মনে হয় সম্রাটের সভায় ওদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তাই তিনি চান না যে অন্যেরা জানুক সম্রাট ওদের অনিষ্ট করেছেন।

—এই দু'টি লোককে দরবার যদি সমর্থন করে, তবে আকবরের পর যারা ক্ষমতা পাবে, তারা তাদের দুই নেতাকে মেরে ফেলার জন্যে আমাদের ওপর রেগে যাবে। আগে আমাদের ওদের সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে হবে।

—এখন তাহলে কি করা কর্তব্য ?

—মন্ত্রী মহাশয়, এখন যদিও ওদের ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা রাখবেন, কিন্তু নজরবন্দী থাকবে তারা।

—নজরবন্দী ?

—হ্যাঁ যেন পালাতে না পারে।

—তাই হবে মহারাজ।

অভিবাদন জানিয়ে চলে যান মন্ত্রী।

—বীরবল, তুমি বিচক্ষণ লোক। আমাকে বাঁচাও ভাই। আমি চিরকাল তোমার অনুগত হয়ে থাকব।

—সে নয় থাকবে। কিন্তু বুদ্ধিতে আসছে না চিঠির মধ্যে এমন কি লেখা হয়েছে যার ফলে আমরা নজরবন্দী হলাম ?

—বীরবল। তুমি হতাশ হয়ে পড়লে আমি যে সব অন্ধকার দেখব। একটা যা হোক কিছু উপায় চিন্তা কর।

—আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে রেখ, আমার কথার ইঙ্গিত বুঝে দরকার মতো তোমাকেও সায় দিতে হবে।

—কে ?   চমকে ওঠেন হুসেন খাঁ ।

— ও মন্ত্রী মহাশয়, আসুন । হেসে অভ্যর্থনা জানান বীরবল ।

—আপনাদের মধ্যে কার নাম বীরবল ?

—আমারই নাম ।

—আপনার নাম হুসেন খাঁ ?

—জী ।

—আপনাদের ওপর সম্রাট এত রুষ্ট কেন ?

—রুষ্ট ! কই না তো ? তিনি আমাদের দু'জনকে খুবই ভালবাসেন । হেসে বলেন বীরবল ।

—তাই যদি হবে তবে কেন তিনি পূর্ণিমার রাত্রে আপনাদের ফাঁসি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ?

কথাটা শুনে হুসেন খাঁ থর থর করে কেঁপে উঠলেন । অবশ্য মন্ত্রী মহাশয় দেখতে পেলেন না । কেননা তাঁর মুখটা বীরবলের দিকে ফেরান ছিল ।

—আমাদের বাদশা খুব দয়ালু এবং ন্যায়বান । আপনি দয়া করে তাঁর আদেশ মতো কাজ করুন ।

আকুতি ফুটে ওঠে বীরবলের কণ্ঠে !

এতক্ষণ ভয়ে মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছিল হুসেন খাঁর । বীরবলের কথা শুনে তাঁর উপদেশটি মনে পড়ে গেল । সেই সায় দিয়ে কথা বলা । তাই সেও বল্‌ল ,—ঠিক কথা তো পূর্ণিমার রাত্রে ফাঁসি দিতেই হবে আমাদের ।

এবার ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবার পালা মন্ত্রী মহাশয়ের ।

তিনি দ্রুত এলেন রাজার কাছে ।

—কি ব্যাপার মন্ত্রী মহাশয় ?   মুখের চেহারা এমন কেন আপনার ?

—মহারাজ, এই লোক দুটো পূর্ণিকার রাত্রে ফাঁসি যাবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত । প্রস্তুত বললেও ভুল বলা হল । তারা ফাঁসি যাবার জন্য পাগল । এর মধ্যে নিশ্চয় একটা কিছু ব্যাপার আছে ।

—সত্যি আশ্চর্য তো ? সব কিছু না জেনে ফাঁসি দেওয়া উচিত নয় । আবার আদেশ পালন না করলে হিন্দুস্থানের বাদশা চটে যাবেন । দারুণ সমস্যার মধ্যে পড়া গেল ।

চিন্তিত মুখে বসে রইলেন রাজা এবং মন্ত্রী ।

—বীরবল, ওরা যদি সত্যি আমাদের ফাঁসি দিয়ে দেয় ?

উদ্বিগ্ন স্বর প্রকাশ পায় হুসেন খাঁর কণ্ঠে ।

হুসেন খাঁর দিকে তাকালেন বীরবল ।   বেচারার মুখের দিকে আর

তাকানো যাচ্ছে না। বয়স যেন হাজারগুণ বেড়ে গেছে।

—বধ্য ভূমি পর্যন্ত যেতে হবে। হেসে বলেন বীরবল।

—তারপর?

—শোন, এত চিন্তা করছ কেন? আমার ওপর যখন আস্থা রেখেছ তখন নিজেকে যদি বাঁচাতে পারি, তোমাকেও পারব।

—কিন্তু।

—বল, থামলে কেন?

—আমি যে তোমার পদচ্যুতির জন্য কত চেষ্টা করেছি, তুমি কি পারবে আমায় মার্জনা করতে?

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠেন বীরবল।

—আমি তোমার কৃতকার্যের প্রতিশোধ নেব বলে মনে হচ্ছে তোমার?

—জানিনা, কি ইচ্ছে তোমার? তবে এ যাত্রা যদি পরিত্রাণ পাই তোমার বুদ্ধির জোরে, তবে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করলাম।

—থাক থাক, অত বলতে হবে না। শোন পূর্ণিমার রাত্রে যখন ফাঁসি যাবার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে তখন আমি বলব, আমাকে আগে ফাঁসি দিতে। কিন্তু তুমি বলবে তোমার ফাঁসি আগে হবে। এ নিয়ে দু'জনে তর্কাতর্কি শুরু করে দেব।

—তাই হবে।

দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট রাত এসে গেল। দু'জনকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য।

—বীরবল, কি হবে? কাঁদ কাঁদ স্বরে প্রশ্ন করে হুসেন খাঁ। স্বর নিম্ন হলেও ভর্ৎসনা করে ওঠেন বীরবল।

—কি হচ্ছে হুসেনখাঁ? তুমি কি সব পণ্ড করে দিতে চাও? হাসি মুখ করে থাক শীঘ্রি।

—কি হল, আপনাদের মধ্যে এত রাগারাগি হচ্ছে কেন? এগিয়ে এলেন রাজামশাই ও মন্ত্রী।

—দেখুন মহারাজ, সম্রাট আকবরের চিঠিটা আমিই আপনার হাতে দিয়েছি, সেজন্য আগে আমার ফাঁসি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু সম্রাটের শ্যালক উনি, তাই দাবী করছেন ওর ফাঁসি আগে হোক।

বলুন তো কি অন্যায় ?

—মহারাজ আপনিই বলুন, বাদশাহের শ্যালক হয়ে এই দাবী করা অন্যায় কিনা ? এবার কথা বলেন হুসেনখাঁ।

—না মহারাজ, আমাকে আগে ফাঁসি দিন। বলেন বীরবল।

—না আমাকে। বলেন হুসেনখাঁ।

—না আমাকে।

—না কিছুতেই আমার আগে আর কারো ফাঁসি হতে পারে না।

দারুণ তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেছে, প্রায় হাতাহাতি হবার যোগাড়। রাজা, মন্ত্রী, জনতা এমন অভাবনীয় দৃশ্য আগে দেখেনি।

—শোন বীরবল, তুমিই বল কি কারণে আগে ফাঁসি যাবার জন্য তোমরা প্রায় খণ্ডযুদ্ধ শুরু করে দিয়ে ? মনে হচ্ছে এর পেছনে কোন একটা কারণ আছে।

—সে বলতে পারব না।

—হুসেন খাঁ, তুমিই বল।

—সে বলা যাবে না।

—কেন কি কারণ ? আরো কৌতূহলী হন সম্রাট এবং অন্যান্যরা।

—বেশ বলতে পারি এক শর্তে। বললেন বীরবল।

—কি শর্ত ?

—আগে বলুন, তাহলে আমায় আগে ফাঁসি দেবেন ?

—একেবারে কথা দেই কি করে ? ইতস্তত: করেন রাজা।

—সেকি। তাহলে বলব না।

—আমি কিন্তু বলব না। এমন খবর শুনলে আমি জানি আপনি কিছুতেই ফাঁসি কাঠে ঝোলাবেন না। এবার আন্দাজেই সত্যিকারের বুদ্ধিমানের মত কথা বলে হুসেন খাঁ।

—কি, কি এমন কথা ? উত্তেজিত হন রাজা।

—শুনুন আপনাদের সম্রাটের আদেশের কারণ বলতেই হবে, না বলা পর্যন্ত কিছুতেই ফাঁসি দেওয়া হবে না আপনাদের। এবার দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন মন্ত্রী।

—অগত্যা বলতেই হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বীরবল। তারপর বলেন—শুনুন গণনার দ্বারা জানা গেছে, যে আগে এখানে নিহত হবে, সে পরের জন্মে এ দেশের রাজা হবে। তাই আমার একান্ত অনুরোধ আমায় আগে ফাঁসি দিন। বললেন বীরবল।

—সেকি! রাজা, মন্ত্রী ও জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

—মন্ত্রী মহাশয় শুনুন। রাজার আহ্বানে বধ্য ভূমির একটু নিভৃত স্থানে এলেন মন্ত্রী।

—এতক্ষণে বুঝলেন, কেন ফাঁসি যেতে ওরা আগ্রহী?

—খুব ভাল করেই বুঝলাম।

—তাহলে কি করব, স্থির করুন।

—শুনুন, আপনি হিন্দুস্থানের বাদশাহকে লিখে দিন আপনি যখন এ দু'টি মানুষের অপরাধ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তখন এদের ফাঁসি দিতেও অপারগ। কাল ভোরেই এদের হিন্দুস্থানের পথে রওনা করিয়ে দিচ্ছি। আজ রাতটা কড়া পাহারার মধ্যে রাখতে হবে।

—এরা যদি সুযোগ মত আত্মহত্যা করে! উদ্বিগ্ন হন রাজা।

—তা যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করছি। একেবারে সম্রাটের হাতে তুলে দিয়ে তবে আমাদের লোক ফিরে আসবে।

—সেই ভাল মন্ত্রী মহাশয়। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাজা মহাশয়।

—ব্রহ্ম দেশের সব খবর ভালত? কেমন লাগল? হাসতে হাসতে সম্রাট প্রশ্ন করলেন বীরবলকে।

—জী বহুত আচ্ছা। আমাদের সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ণ করা হয়েছিল। দিনরাত প্রচুর খেয়েছি। কত যে সম্মান লাভ করেছি বলার নয়। গদ্‌গদ্‌ ভাবে উত্তর দেন বীরবল।

—হুসেন খাঁ, তোমার কেমন লাগল?

—কেমন লাগ্‌ল? শুধু জান নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি এই মহামান্য বীরবলের বুদ্ধির কৌশলে। উঃ! এখনও সব ভাবলে চোখে মুখে অন্ধকার দেখি। ব'লে সব ঘটনা বর্ণনা করেন।

সম্রাট এবং সভার সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

—এখনও তোমার মন্ত্রী হবার সাধ আছে? হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করেন সম্রাট।

—না জাহাঁপনা। ও পদ বীরবলেরই যোগ্য। তাঁর বিচক্ষণতার তুলনা নেই। বড় আনন্দেই আজ সর্বসমক্ষে তাঁর কাছে পরাজয়ের কথা ঘোষণা করছি। সমস্ত সভা উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

—মহামান্য বীরবল, আপনি আমাকে বাঁচান। আকবরের পরিচারক এসে কেঁদে পড়ল বীরবলের পায়ে।

—কেন, কি হল ?

—একবার এক ফকির সাহেব সম্রাটকে একটি পাখি উপহার দেন। সম্রাট পাখিটি আমার হাতে দিয়ে বলেন—খুব উঁচুদরের পাখি। এক ফকিরের উপহার। সাবধানে ওর সেবাযত্ন করবে। ও বেঁচে নেই, এ কথা কেউ যদি আমার কানে দেয়, তাহলে তার মুণ্ডু কাটা যাবে।

—তা পাখিটার কিছু হয়েছে নাকি ?

—আজ্ঞে সে কথা বলতেই তো আসা। আমি সাধ্যমত ওর সেবা যত্ন করেছি, পাখিটা তবু মরে গেল।

—এ জন্য চিন্তা ? আরে ব্যাপারটা সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। খবরটা আমিই সম্রাটকে দেবো।

—আপনি ? কিন্তু।

—ভয় নেই আমার মাথা কাটা যাবে না।

—পুণ্যাত্মা পাখি ! কি বলছ তুমি ?

—ঠিকই বলছি জাহাঁপনা। আমি নিজে দেখলাম আকাশের দিকে মুখ করে চোখ বুজে ধ্যান করছে সে। এ পাখিকে পুণ্যাত্মা বলব না, তো কাকে বলব ?

—তোমার কথা শুনে আশ্চর্য লাগছে। বেশ সভার কাজ শেষ হলে পাখির খোঁজে যাব।

—পাখির খোঁজে যাবেন কেন ? প্রতিহারীকে বলছি এখানেই পাখিটাকে নিয়ে আসবে।

—তাই হোক।

প্রতিহারী ভয়ে ভয়ে খাঁচাটা নিয়ে এল।

—কাছে এস। খাঁচাটা আমার চোখের সামনে তুলে ধর। প্রতিহারী তাই করল।

সম্রাট অনেকক্ষণ খাঁচার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন—বীরবল।

—বলুন জাহাঁপনা।

—তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হতে পারো, কিন্তু সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে। পাখিটা মরে গেছে। আর এমন নয় যে সেটা তুমি জানতে না।

—জানতাম, কিন্তু আমার মুণ্ডটা আমি ঘোচাতে চাইনি।

—মানে? হঠাৎ পরিচারকের দিকে চোখ গেল আকবরের। মনে পড়ল পাখির মৃত্যু হলে কি শাসিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

হেসে ফেললেন আকবর। তারপর বীরবলের দিকে ফিরে বললেন—সাবাস্ বীরবল, আর একজনের মাথাও তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ। এ জন্যই তো তোমাকে এত পছন্দ করি।

—কী হয়েছে বলুন তো? এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন আপনাকে?

—আমার মান সম্মান সব গেল। বীরবলের প্রশ্নে প্রায় কেঁদে ফেলেন রাজধানীর সেরা চিত্রকর।

পথ চলতে চলতে কথা হয় বীরবল ও রাজধানীর সেরা চিত্রকরের মধ্যে।

—আপনি কাঁদছেন কেন?

—আমার বাড়ী চলুন, সব বুঝবেন।

বাড়ী এলেন দু'জনে। চিত্রকর একজন আমীরের পাঁচখানা ছবি নিয়ে এলেন।

হাতে নিলেন বীরবল সব ছবিগুলো। তারপর চিত্রকরকে প্রশ্ন করলেন, একজন আমীরেরই সব ছবিগুলো তো?

—আপনার কি মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। একমাস আগে এই আমীর আমার সঙ্গে বাজী রেখেছিল যে কিছুতেই আমি ওঁর নিখুঁত প্রতিকৃতি আঁকতে পারব না। আমি বলেছিলাম, পারবই। তাঁকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকি। ছবি শেষ হলে তুলি বুলিয়ে যেই পরদিন ফেরৎ দিতে যাই, দেখি চেহারার অদল বদল করছেন। কখনও দাড়ি রাখছেন, কখনও রাখছেন না। কখনও গোঁফ রাখছেন, কখনও রাখছেন না, কখনও আবার পাগড়ির পরিবর্তন করছেন। কিছুতেই আর নিখুঁত প্রতিকৃতি আঁকা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এভাবে পরাজয় স্বীকার করে নেব তাঁর কাছে?

—মোটেই না। শুনুন যা বলছি করুন, এবার সাধ্য নেই ওঁর আপনাকে

অপদস্ত করার। চুপিচুপি কয়েকটা কথা বল্লেন বীরবল চিত্রকরকে।

পরদিন চিত্রকর এলেন আমীরের কাছে।

—পাঁচবার হেরে গিয়েও আর ছবি আঁকার সাধ আছে তোমার?

বিদ্রূপের স্বর আমীরের কণ্ঠে।

—আজ্ঞে হার স্বীকার করব না বলেই সে অভিলাষ এখনও আছে।

—বেশ তৈরী হও। এক্ষুনি আসছি।

আধঘন্টা পরে আমীর এলেন নিজেব চেহারা এবং সাজগোজের একটু অদল বদল করে। চিত্রকর দেখলেন।

—আপনি আপনার নিখুঁত প্রতিকৃতিই দেখতে চেয়েছেন, তাই না?

—হ্যাঁ তাই।

—তবে দেখুন। থলের ভেতর থেকে আয়না বার করলেন চিত্রকর। তারপর সেটা আমীরের মুখের সামনে ধরলেন।

—আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? রাগে লাল হয়ে ওঠেন আমীর।

—আপনার নিখুঁত প্রতিকৃতি একমাত্র আয়নাই দিতে পারে। এই-ই দেখাতে সক্ষম হবে আপনি যখন যেমন।

—ওঃ! শেষ পর্যন্ত হেরে গেলাম তোমার কাছে?

—চালাকির দ্বারা কোন বড় কাজ হয় না যে। হাসতে হাসতে বলেন চিত্রকর।

—ঠগ! জুয়াচোর! এক্ষুণি এপথ থেকে বিদায় নাও। নইলে জুতো মারতে মারতে বিদায় করব তোমায়। আমার বাড়ীতে চারটে চাকর আছে, জান?

—আমার জানার দরকার নেই, যা দেখেছি আপনার হাতে, তাই বলেছি। সেজন্য অত চটে উঠলেন কেন?

—ব্যাটা বুজরুক, লোক ঠকিয়ে পয়সা গুণতে শিখেছ দেখছি?

—দেখুন, গাল দেবেন না অযথা।

—একশোবার দেবো, হাজারবার দেবো। তোমার প্রত্যেকটা দাঁত সাঁড়াশি দিয়ে তুলে নেব।

কথাটা শোনামাত্র গণকঠাকুর তার তল্পি তল্পা নিয়ে উঠে পড়লেন। যাবার সময় কাঁদ কাঁদ ভাবে বলে গেলেন, আমার পয়সা থাকলে এ অপমান সহ্য করতাম না।

পথ চলতে চলতে বীরবল দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। ভদ্রলোকটিকে তিনি জানেন। এর স্বভাবই হল গণকঠাকুর দেখলেই হাত দেখাতে বসে যাওয়া। আজও পথ চলতে চলতে গণকঠাকুর দেখতে পেয়ে রাস্তায় বসে গিয়েছিলেন।

কিন্তু গণকঠাকুরের কথা শুনে দারুণ ক্ষেপে উঠেছেন। বীরবল দ্রুত গণকঠাকুরের পিছু নিল।

—কি ব্যাপার! ওই ভদ্রলোক এত রেগে গেছেন কেন?

—ওঁর কোষ্ঠীতে দেখলাম একের পর এক আত্মীয় বিয়োগ। সেকথা বলেছি কি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। অথচ আমি সত্য কথাই বলেছি।

—বুঝেছি। কিন্তু তেতো কথায় একটু মধু মাখিয়ে নিতে পারলে না?

—মানে?

—বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি। আগামীকাল ছদ্মবেশে ঠিক ওই জায়গায় বসবে। তারপর আজকের কথাগুলোই বলবে কিন্তু মধু মাখিয়ে। যেমন··· কানে কানে বলে দেন বীরবল।

—ওঃ! ভাগ্যিস দেখা পেলাম আপনার। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গণকঠাকুরের মুখখানি।

—এ আবার কে? হ্যাঁ নতুন গণকঠাকুরই মনে হচ্ছে। এগিয়ে এলেন উক্ত ভদ্রলোকটি।

—বাবাঠাকুর! কি এত মন দিয়ে আঁকি বুঁকি কাটছ?

গণকঠাকুর তাকালেন ভদ্রলোকটির দিকে।

—ওরে বাপ্স। এযে দেখছি রাজার কপাল নিয়ে জন্মেছে!

ভদ্রলোকটি খুশী হয়ে এগিয়ে এলেন। উবু হয়ে বসলেন গণকঠাকুরের সামনে।

—একটু হাতটা দেখে দিন বাবা।

প্রসারিত হাত টেনে নিয়ে গণকঠাকুর দেখলেন, তারপর বল্লেন—সুদীর্ঘদিন বাঁচবেন। কী সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কোন আত্মীয় স্বজনই টেকা দিতে পারবে না আপনাকে। কি করে পারবে, একশো বছর পরমায়ু আপনার।

গদগদ হয়ে উঠলেন ভদ্রলোকটি। পকেট থেকে বার করলেন গণক-ঠাকুরের পারিশ্রমিক।

—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। হাত পেতে পারিশ্রমিক নিতে নিতে বললেন গণকঠাকুর।

—আপনাকে পালাতে দিলে তো পালাবেন?

—কিন্তু রোজ এক রাস্তায় তো বসি না।

—তবে আবার কবে দেখা পাব?

—চিন্তা করবেন না। সময় মত আবার আসব।

—এই নিন গণকঠাকুর। আবার অর্থ ব্যয় করতে উদ্যত হন ভদ্রলোকটি।

—আবার কেন?

—বাঃ! এত সুন্দর কথা শোনালেন মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। অথচ এক ব্যাটা ভণ্ড জ্যোতিষী গতকাল কিসব বাজে কথা বলেছিল। দিয়েছি ব্যাটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। অথচ দেখুন আজ আপনার কথা শুনে মনটা এত প্রসন্ন হয়ে উঠল যে নিজে থেকেই পারিশ্রমিক ছাড়া আরো কিছু দিতে মন চাইল। এ দিয়ে মিষ্টি খাবেন কিন্তু।

—অবশ্যই অবশ্যই। হাসতে হাসতে বলেন গণকঠাকুরটি। মনে মনে সহস্র ধন্যবাদ নিবেদন করেন বীরবলের প্রতি।

—সত্যি নুরুন্নেসা বেগম, অনেক রূপসী বেগম আমার হারেমে আছে, কিন্তু তোমার কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। মনে হয় বেহেস্তের হুরী যেন বেগম হবার জন্য ধরায় নেমে এসেছে। তুমি আমাকে শাদি করে সুখী তো?

—সেকি! ভাবতেও পারিনি আল্লা আমার নসিবে এত সুখ লিখবেন? তবে একটা ব্যাপারে প্রাণে বড় ব্যথা পাই।

—কেন বলত?

—আমার ভাইজান কাবুলে থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের কারো প্রায় দেখা সাক্ষাতই হয় না। আপনি যদি তার একটা নোকরীর ব্যবস্থা করে দিতেন তবে সকলেই আনন্দ পেতাম। আমার আব্বাজানও বৃদ্ধ হয়েছেন। আম্মাজানের শরীরও ভাল নয়। কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে বেগমের।

—মন খারাপ করো না নূর। দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি। তোমার

তাই কি যুদ্ধ জানে ?

—জী নেহি। খুন খারাপির কাজগুলো তাকে দিয়ে নাই বা করালেন ?

—শাহী মালখানায় কাজ করতে পারবে ?

—জী নেহি। সেতো মস্ত হিসাবের কাজ জাহাঁপনা।

—হ্যাঁ খুব জটিল হিসাব। এতটুকুও ভুল হলে গর্দান যাবার সম্ভাবনা।

—ও বাবা! তবে দরকার নেই।

—তাহলে ?

—এমন কোন নোকরী নেই যার সম্মান আছে অথচ দায়িত্ব নেই। বিপদ নেই অথচ পদমর্যাদার ও তন্‌খার জৌলুশ আছে ?

—তাই তো! আলবোলায় অম্বুরী তামাকে টান দিতে দিতে চিন্তামগ্ন হলেন ভারত ঈশ্বর সম্রাট আকবর। সুগন্ধী অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হল। ভাবতে ভাবতে বাদশাহের মস্তিষ্ক কল্কেতে থাকা জলন্ত টিকার মতই উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু তবু এমন কোন নোকরীর সন্ধান তিনি করতে পারলেন না। চকিতে বীরবলের কথা মনে উঁকি দিল। ওঃ! বীরবল থাকতে আমার চিন্তা কী! এই কৌন্ হ্যায়—তালি বাজালেন সম্রাট।

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভুঁই ফুঁড়ে খোজা ফকিরুদ্দীন এসে হাজির। আভুমি কুর্নিশ করে প্রভুকে অভিবাদন জানালো সে। বলল, বান্দা হাজির খোদাবন্দ।

—এত্তেলা দাও।

—কাকে! বিস্মিত স্বর বান্দার কণ্ঠে।

—কাকে! কেন জানোনা ? অন্দর মহলে যখন তখন কাকে ডেকে পাঠাই আমি ?

—মাপ করে দিন হুজুর। এবার বুঝেছি। কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেল সে।

—বেগম, তুমি কিছুক্ষণের জন্য পর্দার আড়ালে যাও। বীরবল আসছে। একমাত্র সেই পারবে এই জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে।

সামনেই রেশমী পর্দা টাঙানো ছিল। সুন্দরী নুরন্নেসা তার সুগঠিত দেহটি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—বেগম, তোমার মুখ দেখলে জগৎ সংসার ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। মুগ্ধ চোখে নুরন্নেসার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা কয়টি বললেন সম্রাট।

—সত্যি ?

—সত্যি বলেই তো তোমার ভাই-এর জন্য চিন্তা করছি। কেন

তুমি কি বোঝনা ?

—বুঝি সম্রাট। বুঝি বলেই তো আব্দার করি।

—এবার পর্দার আড়ালে যাও পেয়ারী।

—যাই।

বীরবল এলেন। কুর্নিশ জানাতেই বাদশাহ বসতে ইঙ্গিত করলেন। বীরবল বসলেন মখমলে মোড়া আসনে।

—কি জন্য তলব করেছেন জাহাঁপনা ?

আলবোলার নল নামালেন আকবর।

—ছোটি বেগম নূরুন্নেসার ভাই বুড়বক খাঁকে শাহী দরবারে কাজ দিতে হবে। সম্মানজনক কাজ, অথচ দায়িত্ব থাকবে না। বলে অর্থ পূর্ণ হাসি হাসলেন।

ফকিরুদ্দীন এল। কুর্নিশ জানিয়ে বাদাম পেস্তা দেওয়া দু'গেলাস সরবৎ ধরল দু'জনের সামনে।

দিল খুশ হয়ে গেল দু'জনের। সরবতের খালি গেলাস ফিরিয়ে দেওয়া হল ফকিরুদ্দীনের হাতে। সে আবার কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেল।

—কিছু চিন্তা করলে ?

—জী।

—বল বল। উৎসাহিত হন সম্রাট।

—আমার প্রধান সহকারী করে দিন তাঁকে। দায়িত্ব থাকবে আমার। অথচ টাকা পয়সা, মান মর্যাদা সবই পাবেন তিনি।

—বহুত আচ্ছা। সেজন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠালাম। ছোটি বেগমের কাছে আমার মান বজায় রইল।

—এবার আমি বিদায় হই ?

—হ্যাঁ। বুড়বক খাঁ যে পদে প্রতিষ্ঠিত হল তার জন্য শাহী ফরমান বার কর, আর তাকে সসম্মানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।

অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন বীরবল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উচ্ছাসে ঝলমল করতে করতে বার হয়ে এলেন বেগম।

—কি নূর খুশী তো ? আবেগভরে তাকে কাছে টেনে নেন সম্রাট।

—হ্যাঁ। খুব খুশী। সম্রাটের বুকে মাথা রাখলেন বেগম। শাহী দরবারে কিংখাপের পোশাক পরে আর দশজন আমীর ওমরাহের সঙ্গে বসবে তার ভাই একি চাট্টিখানি কথা ? ভাইজান জানবে, বহিন তার জন্য কি অসাধ্য সাধনই না করল।

—কি হয়েছে ভাইজান। এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?

—আমি এখান থেকে চলে যাব। ব্যথিত স্বর বুড়বকের কণ্ঠে।

—কেন? বিস্ময় প্রকাশ পায় নুরুন্নেসার কণ্ঠে।

—কি হবে আর এখানে থেকে? আমার কথা আর কে চিন্তা করে?

—সে কি ভাইজান! সম্রাটকে বলে কয়ে এতবড় পদে প্রতিষ্ঠিত করলাম তোমাকে অথচ—

—প্রতিষ্ঠিত? নুরুন্নেসার কথা শেষ হবার আগেই বুড়বক খাঁর কণ্ঠ থেকে বিদ্রূপের স্বর বার হয়ে আসে।

—কেন ভাইজান কিসের জন্য এ দুঃখ তোমার?

—দুঃখ। হ্যাঁ বড় যন্ত্রণা এ বুকে। সম্রাট সব সময়েই বীরবলের সঙ্গে পরামর্শ করেন, রসালাপ করেন, তাঁর কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েন। আমীর ওমরাহরাও হয়েছে তেমনি, হাঃ হাঃ করে হাসছে তো হাসছেই। দরবারের গম্ভীর আলোচনায় কিছুক্ষণের জন্য ছেদ পড়ে যায়। আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

—এতে তোমার কি ক্ষতি হচ্ছে ভাইজান?

—হচ্ছে না? আমি বীরবলের প্রধান সহকারী বিদূষক। অথচ দরবারে আমাকে অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে হয়।

—বাদশাহ কি তোমার সঙ্গে কোনরকম পরিহাস করেন না? করেন না কি ছল-চাতুরীর প্রশ্ন?

—করেছিলেন।

—তবে?

—কি জানি কেন আমার জবাব তাঁর এবং সভাসদদের মনঃপুত হয় না। আমার জবাব শোনার পর সম্রাট গম্ভীর হয়ে যান।

—আর আমীর ওমরাহরা কি করেন?

—তাঁরা ভয়ে কাঠ মেরে যান।

—তাহলে সম্রাট এখন আর তোমাকে তেমন আমল দেন না?

—না।

—ঠিকমত বেতন পাও তো?

—হ্যাঁ সেদিক থেকে এতটুকুও ত্রুটি নেই।

—বীরবলের তোমার প্রতি ব্যবহার কেমন?

—না সেদিক থেকেও ত্রুটি নেই। বীরবল আমাকে যথেষ্ট খাতির করেন, মান্যগণ্য করেন। কিন্তু বহিন, আমি যে ভুলতে পারি না বাদশাহের শ্যালক হয়েও তাঁকে মনিব বলে মানতে হয়।

—আমার মনে হয় তোমার কথাবার্তাগুলো বীরবলের মত মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও সরস হয় না। তেমন হলে নিশ্চয় বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতে তুমি।

—ও রকম কথা যে আসে না। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয় বুড়বক খাঁ।

—পারতেই হবে। নিজেকে এখন থেকে সেভাবে তৈরী কর। তারপর সুযোগমত বীরবলের অনুপস্থিতিতে এমন ভাবে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দাও যা শুনে বাদশাহ মুগ্ধ হন। তোমার কথা শুনে তিনি ও সভাসদ্‌রা যেন হেসে গড়িয়ে পড়েন।

—তাই করব তাহলে?

—হ্যাঁ তাই কর।

—কিন্তু তুমিও এ ব্যাপারে সম্রাটকে কিছু বল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কাজ আমি ঠিকই করব।

—তিনি কি রোজ তোমার মহলে আসেন?

—না। রোজ আসবার সময় হয় না। তবে প্রায়ই আসেন। আমার তো মনে হয় আমার মহলেই বেশী আসেন।

—এটা ঠিক নয়। তিনি তাঁর প্রধানা বড়ি বেগমসাহেবার কাছেই বেশীর সময় ভাগ কাটান। তাঁর গুণের তুলনা নেই, তাঁর হৃদয় বড় উদার।

—তা সেই বড়ি বেগমসাহেবার কাছে গেলেই পার, তাহলে আর আমার কাছে আসছ কেন?

—দেখ বহিন মন মেজাজ ভাল নয়, এ সময় ভুল বুঝে গোঁসা করো না। তোমার জন্যই সুদূর কাবুল থেকে এখানে এসে এ পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছি, এ কথা যে কোনদিনও ভুলব না।

—ঠিক আছে দেখি কি করতে পারি?

—সে আমি জানি বহিন। হাসি হাসি মুখে বলে বুড়বক খাঁ।

—ওহে বীরবল, আমার হাতখানা দেখো তো।

—হাত! সম্রাটের কিন্তু এ ধারণাটা ঠিক নয়। হাত আমি দেখতে জানি না। বলেন বীরবল।

—আরে কি মুস্কিল! আমি কি হাতের রেখা গোণার কথা বলেছি? আমার প্রশ্ন আমার হাতের তালুতে কেন লোম গজাচ্ছে না?

বাদশাহের কথা শুনে সভাসদ্‌রা হাসতে থাকেন। অনেকে ভাবেন বীরবল এবার জব্দ হবেন। কিন্তু তাঁকে জব্দ করা এত সহজ নয়। তাই চট্‌পট্‌ উত্তর দেন—

—জাহাঁপনা, এর কারণ অতি সুস্পষ্ট। দরিদ্রকে আপনি নিয়ত ভিক্ষা দেন, জ্ঞানীগুণীকে সর্বদা উপহার দেন। সেই সমস্ত সামগ্রীর নিত্য ঘর্ষণের ফলে আপনার তালুতে লোম গজাতে পারে না।

—এটা ঠিক হল না। এ চাটুবাক্য ছাড়া কিছু নয়।

—কেন সম্রাট?

—তা নয়তো কী? তাই যদি হবে, তোমার হাতের তালুতে লোম দেখি না কেন?

বীরবল হেসে গড়িয়ে পড়েন।

—হাসছ কেন? উত্তর দাও। উত্তেজিত হন সম্রাট।

—হাসব না? দিবারাত্র আপনার হাত থেকে স্নেহের উপহার নিচ্ছি। ফলে লোম গজাবার অবকাশ পাচ্ছে কোথায়?

এবার সভাসদ্‌রা হেসে উঠলেন সকলে। সম্রাট কিন্তু পরাজয় স্বীকার করলেন না। বল্‌লেন—বেশ! তোমার কথা মেনে নিলুম। কিন্তু এবার বলতো রাজদরবারের সভাসদ্‌দের হাতে লোম নেই কেন? প্রশ্ন করেই মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসতে থাকেন সম্রাট।

এবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন বীরবল। বল্‌লেন—এতো সোজা জিনিসটা সত্যি কি বুঝলেন না?

—না। গম্ভীর স্বর সম্রাটের। সভাসদ্‌রা উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন বীরবলের দিকে।

—হিংসে! হাসতে হাসতে বলেন বীরবল।

—হিংসে! কারা হিংসে করে? এ কথার মানে কী?

—মানে ওই সভাসদ্‌দের হিংসে। আপনি যখন আমাকে উপহার দেন, ওঁদের অসহ্য বোধ হয়। ওঁরা তখন পাগলের মতন নিজের দুহাত ঘষতে থাকেন, আমাকে ছিঁড়ে ফেলতে চান। কাজেই ওঁদের হাতের তালুতে লোম গজাবে কেমন করে?

এবার সভাসদ্‌দের মুখ কালো করার কথা। বীরবল যে এভাবে তাঁদের অপদস্থ করবেন ভাবতেই পারেন নি কেউ। অনেকেই কট্‌কট্‌ করে তাকালেন বীরবলের দিকে। কিন্তু উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লেন সম্রাট।

—ওঃ! সত্যি বীরবল তোমাকে পরাজিত করে কার সাধ্য? তা একবার

বিকেলের দিকে বড়িবেগমের মহলে এস তো ?

—আসব জাহাঁপনা।

—কেন জিজ্ঞাসা করলে না ?

—গেলেই যখন জানতে পারব তখন আর এখন জানার প্রয়োজন কী ?

—বেশ তাই যেও। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই সোজা ঢুকে পড়।

—তাই যাব। সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে চলে যান বীরবল।

সূর্য অস্তমিত হবার আগেই বড়ি বেগমের মহলে এলেন বীরবল। প্রসাদের বারান্দায় বসে তখন সম্রাট ও প্রধানা বেগমসাহেবা আম খাচ্ছিলেন। আম খেতে খেতে সেগুলোর খোসা আর অাঁটিগুলো ক্রমশঃ জড়ো হচ্ছিল বেগমের হাতের পাশে।

বীরবলকে ওভাবে ঢুকতে দেখে একটু লজ্জাই পেলেন বেগম। তিনি তো আর জানেন না স্বয়ং সম্রাট এ দৃশ্যটি দেখাবার জন্য এ সময় আহ্বান করেছেন বীরবলকে।

—বস বীরবল আমার পাশে। বড় মিষ্টি আম। ঝুড়ি থেকে তোল আর খাও।

বীরবল বসলেন। আম তুলে নিয়ে খেতেও শুরু করলেন।

—দেখছ বীরবল, বেগম কি পেটুক ? ওঁর পাশে দেখ রাশীকৃত খোসা আর অাঁটি। উঃ! মেয়েরা কি করে এত খেতে পারে বুঝি না। হাসতে হাসতে বলেন সম্রাট।

—কি এত বড় কথা ? দারুণ চটে উঠলেন বেগমসাহেবা।

—বস বেগম বস। এত রাগ করছ কেন ?

—না আর আম খাব না। আপনি নিজেই জোর করে আম খাওয়াচ্ছেন আমায়। আবার পেটুক বলছেন ? কেন আপনি কি কিছু কম খেয়েছেন ?

বীরবল সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝলেন। সম্রাট শুধু বেগমকে নয়, প্রকৃত পক্ষে তাঁকেও অপদস্থ করতে চাইছেন। তাই হেসে বলেন—জাহাঁপনা, মানুষকে কেনা যায় তার সঙ্গী সাথী দেখে। বুঝলেন তো ?

—তার মানে ? তোমার কি ধারণা আমার জন্যই উনি পেটুক হয়েছেন ?

—হুজুর ! সতী সাবিত্রীরা চিরদিনই স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

—কিন্তু আমি পেটুক নই। নিজেই দেখো খোসা আর অাঁটি সবই ওঁর পাশে। বললেন সম্রাট।

—কি আবার অপমান? ফোঁস করে ওঠেন বেগম।

—আপনি উত্তেজিত হবেন না বেগমসাহেবা। আমি সম্রাটকে এর উত্তর দিচ্ছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বল। উৎসাহিত হন সম্রাট।

—সেই কথাই বলছি জাহাঁপনা। বেগমসাহেবা কেবল রসটুকুই খেয়েছেন, আপনি নিজে কিন্তু খোসা, আঁটি কিছুই বাদ দেননি।

এবার হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন বেগমসাহেবা।

—সত্যি কথাই বলেছেন। আপনি সামনে না থাকলে এগুলোও ওঁর পেটে যেত। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন বেগমসাহেবা।

—এঃ! দিলে তো এবারেও গাধার টুপী পরিয়ে? প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও পরে হাসতে হাসতে বল্‌লেন সম্রাট।

—নিন, আম খান যত ইচ্ছে। এক্ষুনি সরবত আর মিঠাই আনিয়ে দিচ্ছি। সত্যি মান রক্ষা করলেন আমার।

হাসতে হাসতে বললেন বেগম। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বীরবলের মুখ।

সুগন্ধি অম্বুরী তামাকের গন্ধে ভরে আছে কক্ষটি। সম্রাট আকবর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক টানছেন আর অপরূপা বেগমের দিকে তাকাচ্ছেন। বেগম গায়ের ওড়নাটার একটি কোণে বার বার গিঁট দিচ্ছেন আর খুলছেন, খুলছেন আর গিঁট দিচ্ছেন। মুখখানি থম্‌থম্‌ করছে বিষাদের বেদনায়।

শেষ হলো তামাক সেবন।—উঠে বসলেন সম্রাট। তারপর আর কিছু না বলে জড়িয়ে ধরলেন বেগম নূরুন্নেসাকে তারপর কাছে টেনে নিয়ে এলেন।

—সুন্দর মুখখানি বেদনায় এমন বিধুর কেন? কি হয়েছে পেয়ারী?

—আমার ব্যথা বেদনায় আপনার আর কি আসে যায়?

ব্যথায় ছলছল করে ওঠে নূরুন্নিসার হরিণের মত সুন্দর চোখ দুটি।

—সেকি! একথা বলছ কেন? বল তোমার মনের কোন ইচ্ছেটা পূরণ করিনি?

—হ্যাঁ করেছেন ঠিকই, কিন্তু মনের সাধ মিটল কোথায়?

—বেশ, কোন সাধটা বাকী আছে বল?

—আমার সাধের কথা ঠিক বলছি না, বলছি ভাইজানের কথা। আপনার

শ্যালক হয়েও তাকে বীরবলের অধীনে থাকতে হয়। এ জন্য খুব দুঃখ করছিল বেচারা।

হাসলেন আকবর। বললেন—রাগ করনা বেগম, তোমার ভাই ভীষণ মাথামোটা। বীরবলের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না—বীরবল যেন খাপখোলা ঝকঝকে তলোয়ার। এমন জ্ঞানী ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে তোমার ভাই এর তুলনাই চলে না।

—ভাইজান নূতন চাকরীতে ঢুকেছে। সুযোগ দিলে দেখবেন ওরও কোনও বিষয়ে একটুকুও কমতি নেই।

—দেখো বেগম, বুড়বক খাঁ নয়, তোমার ওই মনভোলানো রূপ আমার সব ওলোটপালট করে দেয়। ঠিক আছে বুড়বককে সুযোগ দিচ্ছি। আগামী-কাল থেকে বীরবল ছুটি নিয়েছে।

—দেখবেন জাহাপনা নিশ্চয় সে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারবে।

—দেখি। তারপর হেসে চিবুকটি তুলে ধরেন নুরুন্নেসার, বলেন : এবার একটু হাস পেয়ারী। তোমার মিষ্টি হাসি না দেখলে যে দিল আমার ভরে না।

সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে হেসে সম্রাটের বুকের ওপর গড়িয়ে পড়েন নুরুন্নেসা। আর প্রশান্তিতে আকবরের সমগ্র মুখখানি ভরে ওঠে।

আকবর বাদশাহের শাহী দরবার বসেছে। দূর দূরান্তর থেকে কত লোক এসেছে, এসেছে কাবুল, গজনী কান্দাহার থেকে, এসেছে, বঙ্গদেশ থেকে, এসেছে উৎকল, দাক্ষিণাত্য থেকে, এসেছে মদ্র বিদর্ভ কোশল কলিঙ্গ থেকে। কেউ বিচার চায়, কেউ আশ্রয় চায়, কেউ চায় শাহী অনুগ্রহ। যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়েও কথা বলতে চায় কেউ কেউ।

আমীর ওমরাহে গিজগিজ করছে দরবারকক্ষ। একপাশে মর্যাদার আসনে বসেছেন নবরত্ন। বীরবল ছুটি নিয়েছেন। তাঁর আসনে বুক চিতরে বসে আছে বুড়বক খাঁ। তার পরনে ঝকঝকে পোশাক, কিংখাপের কুর্তা, গায়ে এঁটে বসা মখমলের শেরওয়ানী, কোমরে স্বর্ণখচিত কোমরবন্ধ। মাথায় বাহারী উষ্ণীষ। গর্বে আনন্দে ঝলমল করছে সে। সুগন্ধী কিমাম দেওয়া বেনারসী পান খেতে খেতে মিঞা তানসেনের গান শুনছিল সে তন্ময় হয়ে।

বাদশাহ এতক্ষণ জগৎ সংসার সব ভুলে তানসেনের গানের মধ্যে ডুবে ছিলেন। গান শেষ হতেই তাকালেন নবরত্নের দিকে। বীরবলের স্থানে

বুড়বককে দেখেই ধক্ করে উঠল বুকটা। অসন্তোষের ছাপ পড়ল মুখে। কিন্তু মনে পড়ল নিজেই আদেশ দিয়েছেন যে ক'টাদিন বীরবল না আসে সে কটাদিন বুড়বক সে স্থানে বসতে পারে। এ আদেশটা দিয়েছেন সুন্দরী নুরুন্নেসার মুখ চেয়ে।

—বুড়বক খাঁ।

—হুকুম করুন জাহাঁপনা। উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানায় সে।

—বলো তো মানুষের কাছে সব চেয়ে প্রিয় কি?

—আঙুর। হাসি হাসি মুখ করে বলে বুড়বক খাঁ।

সভাসদ্‌দের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সম্রাটের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

মহামান্য বীরবলের স্থানে এ বোকাটাকে বসালেন সম্রাট? ভীড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল। লাল হয়ে গেল বুড়বক খাঁ-এর মুখ।

—তুমি আঙুর খেতে খুব ভালবাস তাই না?

—জী হুজুর।

—সেজন্যই বোধ হয় আমার প্রশ্ন শুনে এ উত্তরটা মনে এসেছে। কিন্তু যার আসনে বসেছ সে এখানে উপস্থিত থাকলে ঠিক জবাব পেয়ে যেতাম। তার জবাব সকলকে আনন্দ দিত।

এবারে অপমানে বুড়বক খাঁ মাথা হেঁট করলেন।

—না না লজ্জা পাবার কিছু নেই। তোমাকে এখনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। আগামীকাল এর উত্তর পেলেই চলবে।

—বহুত মেহেরবানি আপনার। আগামীকাল এর সঠিক জবাব দিতে পারবই।

—বেশ। হাসলেন সম্রাট।

—বহিন, ভীষণ বিপদ বাঁচাও।

—আবার কি হল?

বুড়বক তখন সমস্ত ঘটনাটা বলল। পারস্যের মোটা জাজিমের ওপর বসে দুই ভাই বোন চিন্তা করল অনেকক্ষণ ধরে।

—বহিন আমার মান বুঝি রক্ষা করা যাবে না। আজই সকলের সামনে ইজ্জত নষ্ট হয়েছে। তুমি একটা ব্যবস্থা কর।

—আমি! আমি যে কি ব্যবস্থা করব বুঝতে পারছি না। তুমিও কোন কাজের নও। যেহেতু আঙুর খেতে ভালবাস অমনি তার কথাই বললে?

—কিন্তু এর জবাব কি হবে ?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

—বহিন, একটা উপায় আছে। তবে তুমি কি আর করবে ?

—কি উপায় ভাইজান ? তোমার জন্য আমি কি না করছি ?

—তাহলে কথা দাও আজও যে উপায়টা বলব সেটা করবে ?

—আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব অবশ্যই করব, কথা দিলাম।

—হ্যাঁ এতেই হবে। তাহলে দেরী না করে এক্ষুণি বীরবলের প্রাসাদে চলে যাও। গিয়ে জবাবটা জেনে এস, অবশ্য কায়দা করে।

বুড়বকের প্রস্তাব শুনে আঁতকে ওঠেন নুরুন্নিসা।

—তুমি কি পাগল হলে ? হারেমের বাইরে বীরবলের প্রাসাদে আমি যাব ? সম্রাট জানলে খুন করে ফেলবেন যে ?

—দেখো বহিন, এখন সম্রাটের দরবারে কি হচ্ছে না হচ্ছে বীরবল্ জানেন না। ছুটিতে থেকে দিব্যি মজায় আছেন: দিল মেজাজও খুশ আছে। এ সময় এ প্রশ্নের জবাবটা জেনে এসে উপকার কর বহিন।

—না ভাইজান। এ অসম্ভব প্রস্তাব রক্ষা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

—কথা দিয়েও কথা রাখছ না বহিন ? তোমার ধর্মের কি কোন ভয় নেই ?

—ভাইজান ? চিৎকার করে ওঠে নুরুন্নিসা।

—ভয় নেই, কারো অমঙ্গল চাই না তবে তোমার ভাইজানকে চিরদিনের জন্য হারাবে। আত্মহত্যা ছাড়া কোন উপায় নেই আমার।

—না না না। কেঁদে ওঠে নুরুন্নেসা। আমি এক্ষুণি ওনার প্রাসাদে যাচ্ছি। আমাকে পৌঁছে দাও।

তাড়াতাড়ি বোরখা টেনে নেয় নুরুন্নেসা।

—আমি কিন্তু দূর থেকে প্রাসাদটা দেখিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি ওদের বাড়ীর নোকরকে দিয়ে এত্তেলা পাঠাবে।

—তাই করব।

—বেগমসাহেবা। আপনি আমার প্রাসাদে ? শিগ্রী ভেতরে আসুন। বিস্মিত বীরবল বেগমসাহেবার আসার সংবাদে ছুটে আসেন।

—আপনার নোকরকে বলে দেবেন একথা যেন আর কারো কাছে না বলে।

—কোন কথা ?

—এই আমার এখানে আসার কথা।

—না না সে কাউকে বলবে না। অতি বিশ্বস্ত লোক সে। আসুন ভেতরে বেগমসাহেবা।

—না, শুধু একটা প্রশ্নের জবাব নিয়েই ফিরে যাব।

—কি প্রশ্ন?

—মানুষের কাছে সব চেয়ে প্রিয় জিনিস কি?

হাসলেন বীরবল। বললেন, এ তো অতি সোজা জবাব। মানুষের কাছে তার নিজের স্বার্থই সবচেয়ে প্রিয়।

—ইস্! এতো সোজা উত্তর মাথায় এল না?

ফট্ করে বলে ফেলেন নুরুন্নেসা।

—কার মাথায় এল না বেগমসাহেবা?

—না না কারো নয়। মানে এই আমার কথাই বলছি। আচ্ছা চলি।

—একা যাবেন? বাঁদীকে সঙ্গে আনেন নি?

—এটুকুই পথ। এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। পাল্কিতে উঠে পড়েন বেগমসাহেবা। দ্রুত প্রস্থান করে নুরুন্নেসাবেগম, হতভম্ব হয়ে বীরবল দাঁড়ালেন। একটু পরেই চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গোঁফের ফাঁকে দেখা দিল হাসির রেখা। বুড়বক খাঁ লক্ষ্য করেনি তাঁকে। কিন্তু তাঁর নজর এড়াতে পারেনি সে।

—জাহাঁপনা! অনেক সময় অতি সহজ উত্তর চট্ করে মাথায় আসে না। তাই গতকাল আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। আজ অবশ্যই পারব। কুর্নিশ জানিয়ে কথা কয়টি বলে বুড়বক খাঁ।

—বটে? কি জবাব শুনি?

—জাহাঁপনা, মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে নিজের স্বার্থ।

আকবর তাকালেন বুড়বকের দিকে। মনে মনে চিন্তা করলেন, এ জবাব কি সত্যি এর মাথা থেকে বার হয়েছে? এতে যে বীরবলী বীরবলী গন্ধ লেগে রয়েছে। তাই একটু রগড় করবার জন্য বললেন—এটুকু বললেইতো হবে না। আমাকে বোঝাতে হবে কেমন করে, কি ভাবে আমরা এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারি।

আবার মুখ শুকোবার পালা বুড়বকের। এর উত্তর তো তার জানা নেই। এখন কি হবে? সে মাথা চুলকোতে থাকে।

—কি হল? মাথার উকুনগুলো বিরক্ত করছে নাকি?

—উকুন। কই আমার মাথায় তো কোন উকুন নেই।

—ও! আমি ভাবলাম উকুনগুলোর দস্যিপনার জন্য ঠিকমত জবাবটা সাজাতে পারছনা। সভার সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

বুড়বক খাঁ-এর মুখ লাল হয়ে যায়। তবুও পরিত্রাণ পাবার আশায় বলে : জাহাঁপনা! মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে আমার। আমাকে আজ দয়া করে ছেড়ে দিন। কাল ঠিক উত্তর পাবেন।

—শরীর খারাপ থাকলে তো সত্যি মুস্কিল। তাহলে আজকে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আগামী কাল জবাব দিও। অতিকষ্টে হাসি চেপে কথা কয়টি বল্‌লেন সম্রাট।

—বহুত মেহেরবানি আপনার। কুর্নিশ জানিয়ে চলে যায় বুড়বক খাঁ।

সে চলে যেতেই আকবর মানসিংহকে ডাকলেন। তারপর কি যেন কানে কানে তাকে বল্‌লেন।

—আপনি চিন্তা করবেন না জাঁহাপনা। আপনার হুকুমমত সব ব্যবস্থা রাখছি।

কুর্নিশ জানিয়ে বাইরে বার হয়ে এলেন মানসিংহ। তারপর তাঁর বিশ্বস্ত একটি লোককে কি যেন কানে কানে বল্‌লেন। সে মানসিংহকে অভিনন্দন জানিয়ে সোজা চলে গেল বেগম হুরুন্নেসার মহলের দিকে। সেখানে একটা উঁচু গাছের ওপর বসে লক্ষ্য রাখতে লাগল। বেশ অনেকক্ষণ পর বুড়বক খাঁ চিন্তিত মুখে বার হয়ে এল। প্রভুর নির্দেশে এবার সে বুড়বক খাঁকে অনুসরণ করল।

পথ চলতে চলতে বুড়বক খাঁ যে কিছু চিন্তা করছে স্পষ্ট বোঝা গেল। কেননা দু'তিনবার গরুর গাড়ীর সম্মুখে পড়ে গিয়েছিল সে।

—হুজুরের কি তবিয়ৎ ভাল নেই? এবার বুড়বকের পাশে এসে দাঁড়ায় সে।

—কে? চমকে ওঠে বুড়বক খাঁ।

—আমি একজন সাধারণ মানুষ। পথ চলতে চলতে দেখলাম দু'তিনবার আপনি বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছিলেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—তুমি আমাকে চেন?

—সেকি! চিনব না? একেই সম্রাটের শ্যালক, তায় নবরত্নের অন্যতম রত্ন মহামান্য বীরবলের সহকারী আপনি, আপনাকে কে না চেনে?

—'অন্যতম রত্ন বীরবলের সহকারী' কথাটা কিন্তু আমার একদম ভাল লাগছে না।

—কেন ?

—সেখানে আমার স্থান যে পেছনেই রয়ে যাচ্ছে।

—সেজন্য দুঃখের কি আছে ?

—তোমরা চাষাভূষা শ্রেণীর মানুষ এসব বুঝবে না।

—তা ঠিক হুজুর। শরীর যখন খারাপ তখন পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন কেন ?

—বাড়ী তো যাচ্ছি না। যাচ্ছি সওদা করতে।

—ভালই হল আমিও সে পথে যাচ্ছি।

—কি গো কত রকমের আচার আছে তোমার ? প্রশ্ন করেন বুড়বক খাঁ। এই বৌটির তৈরী আচারের কথা তখন শহরের চারিদিকে লোকের মুখে মুখে ফেরে। একবার কিনলে তাকে আবার আসতে হয়।

—হুজুর একটা কথা বলব ? মানসিংহের সেই বিশ্বস্ত লোক অমরনাথ বলে।

—বল।

—সম্রাটের মহামান্য শ্যালক আপনি। আপনার কি এখানে এ ভাবে দাঁড়িয়ে আচার কেনা শোভা পাচ্ছে ? এ পোশাকে দরবার ছাড়া আর কোথাও মানায় না।

—কিন্তু কি করি ? ভগিনীকে রাজী করাতে এর চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর কিছু নেই।

—তা আমরা থাকতে আপনার চিন্তা কী ? আপনি বলুন কি কি লাগবে—আপনার, আমি যথা সময়ে পৌঁছে দিচ্ছি।

—বেশ, তাই কর তবে। আমি বাজারে ঢোকার বাঁদিকে যে বকুল গাছটা আছে সেখানে অপেক্ষা করছি। সব রকম আচার নিয়ে চলে এস। আর ওদিকের দোকানটা থেকে মেয়েছেলের একটা বোরখা নিয়ে চলে আসবে। একেবারে সাধারণ বোরখা বুঝেছ ? থলি কিনে তার মধ্যে সব ঢুকিয়ে আনবে।

—আর কি আনব হুজুর ?

—হ্যাঁ পেস্তার বরফি নিয়ে আসবে একবাক্স। ভগিনী দারুণ ভালবাসে। এই বলে তংখা বার করে দিয়ে চলে যায় সে।

—আজ আপনি ঘোড়ায় চড়ে আসেন নি ? পথ চলতে চলতে বুড়বক খাঁ

কে প্রশ্ন করে অমরনাথ। থলি ভর্তি জিনিস বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সে।

—না। ঘোড়া পায়ে একটু চোট পেয়েছে। দু'দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। গাড়ী করেই সভায় এসেছিলাম। আজ আর সন্ধ্যের আগে বাড়ী যাব না।

নুরুন্নেসা বেগমসাহেবার মহলেই ভোজন সারবেন নিশ্চয় ?

—হয়ত। তবে তার একটা ব্যাপারে রাজী হওয়ার ওপর সব নির্ভর করছে। তাকে রাজী করবার জন্যই তো এত জিনিস কিনলাম। অবশ্য সম্রাটের বেগম সে। অভাব তার কিছুই নেই। তবে এ ধরণের মুখরোচক আচার তো আর পাবে না।

—আপনাদের ভাই বোনের মধ্যে এত টান দেখে খুব ভাল লাগছে।

—সে কথা একেবারে অস্বীকার করছি না। কিন্তু তাঁর গভীরতার প্রমাণ আজ পাওয়া যাবে।

—এ বোরখাটা কিনলেন কার জন্য ? এত সস্তাদামের বোরখা কে পরবে ?

—ওই পরবে—তবে কিছুক্ষণের জন্য। দামী বোরখা পরে মহল থেকে বার হলে সকলের আকর্ষণ সেদিকে থাকবে। গতকাল নাকি দামী বোরখা পরাতে অনেকে পাল্কি থেকে নামার সময় তার দিকে তাকাচ্ছিল। আর আমিও নিজ চোখে সেটা দেখেছি।

অমরনাথ হাসল মনে মনে। এ জন্যই দরবারের সকলে এর নাম দিয়েছে 'সাদা গাধা'। এত মাথামোটা যার, সে নাকি মহামান্য বীরবলের স্থানে বসতে চায় ? তাঁর সহকারী হবার কোন যোগ্যতাই তো নেই এর। নেহাৎ বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে সম্রাট রাজী হয়েছেন। কিন্তু মুখে বলে —নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে আপনার মাল বহন করে নিয়ে আমার জন্য। নুরুন্নিসা বেগমসাহেবার মহল এসে গেছে। আমি তবে যাই ?

—বাঁদী। ডালি বাজার বুড়বক খাঁ।

—জী! সঙ্গে সঙ্গে বাঁদী রূপমালা এসে অভিবাদন জানায়।

এগুলো তোমার মালকিনের কামরাতে পৌঁছে দাও। আর জিজ্ঞাসা কর, বাইরে অপেক্ষা করব, না বাড়ী ফিরে যাব ?

চলে যায় বাঁদী।

—তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? এবার বুড়বক প্রশ্ন করে অমরনাথকে।

—জী, মালকিন যদি সেই কি একটা ব্যাপারে রাজী না হন তবে আপনাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব। আপনি আমার ওখানেই দু'টি খাবেন।

—তার দরকার হবে না। বড় নরম মন ভগিনীর। এক্ষুণি ডেকে পাঠাবেন।

—আপনি আসুন। সঙ্গে সঙ্গে রূপমালা আহ্বান জানায় তাকে।

হেসে অমরনাথের দিকে তাকায় বুড়বক খাঁ। তারপর বাঁদীর সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে।

সুচতুর অমরনাথ তখনই ব্যাপারটার অনেক কিছুই বুঝে ফেলে। তাড়াতাড়ি পথে বার হয়ে আসে সে।

তখনও ঠিক সাঁঝের আঁধার নামেনি। ফতেপুর সিক্রীর মসজিদে মসজিদে আজান ধ্বনিত হচ্ছে। বীরবলের খুশবাগে ফুলের মেলা বসেছে। পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের রঙের খেলা।

হঠাৎ পরিচিত সবুজ বোরখাটা দেখতে পেল অমরনাথ। বীরবলের বাড়ীর কাছে গাছের ওপর বসে সবই লক্ষ্য করতে লাগল সে। মাথা মোটা বুড়বকের কথায় ধরণেই সে ধরে নিয়েছে নুরুন্নেসাবেগম আজ এখানে আসবেই।

—আপনার কথা বল্‌লাম। কিন্তু মালিক বলছেন, তিনি বাগিচায় এখন বেড়াচ্ছেন, আপনার প্রয়োজন থাকলে আপনি সেখানে যান।

কথা কয়টি বল্‌ল বীরবলের নোকর।

বিস্মিত হন বেগম। তবু বলেন—আমি প্রকৃত পক্ষে কে, সে কথা বলেছিলে?

—জী। গতকাল জমকালো বোরখা ছিল, আর আজ সাধারণ বোরখা, তবুও আপনাকে চিনতে অসুবিধা হয়নি।

—আমার আসার সংবাদ পেয়েও তোমার মালিক এলেন না?

—জী নেহি।

—কী, এত বড় স্পর্ধা তোমার মনিবের। আমাকে এভাবে অপমান?

—আমিও সে কথা চিন্তা করছি, মনে হয় দেখা না করে আপনারা ফিরে যাওয়াই ভাল।

—তুমিও হাসছ? শুধু নিজে নয়, নোকর দিয়েও তোমার মনিব অপমান করছেন আমাকে? ঠিক আছে, উচিত সাজাই পাবেন তিনি।

এই বলে চলে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু দু'পা অগ্রসর হয়ে আবার ফিরে আসেন। নোকর বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—বেশ, নিয়ে চল তোমাদের মনিবের কাছে। গরজ যখন আমাদের তখন অপমান সহ্য করেও কাজ করে যেতে হবে।

—চলুন। সসম্মানে বাগানে তাকে নিয়ে এল নোকর।

—এবার তুমি যাও। আমি তোমার মালিকের সঙ্গে কথা বলে নিজেই

চলে যেতে পারব।

—বহুত আচ্ছা। কুর্নিশ জানিয়ে চলে যায় নোকর। বীরবল দ্রুত বাগানে পায়চারী করছিলেন। বেগমকে দেখে থামলেনও না বা সম্মান প্রদর্শনও করলেন না।

খুবই দুঃখিত হলেন বেগম। কিন্তু উপায় নেই। তাই বীরবলের পেছন পেছন দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বলেন :

—গতকাল আপনি আমায় যে প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন সেটায় আরো একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বীরবল উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকেন। বেগমও তাঁর পেছন পেছন হাঁটতে থাকেন।

বীরবলের নোকরের সঙ্গে আগেই দোস্তি পাতিয়ে রেখেছে অমরনাথ। এবার তারই ইঙ্গিতে বাগানের ঝোপের আড়ালে বসে সব লক্ষ্য করে সে।

—শুনুন, আপনি বলেছেন মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় তার নিজের স্বার্থ। এবার আমার প্রশ্ন—সেটা কেমন করে ?

বীরবল কিন্তু উত্তর না দিয়ে হাঁটতেই থাকেন। বেগমসাহেবাও হাঁটতে থাকেন। বীরবলের জবাব না পেয়ে চোখে তাঁর প্রায় জল এসে গেছে।

—আমি প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করছি তবুও কোন জবাব দিচ্ছেন না কেন ? প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম তাঁর।

—শুনুন, এখন আমার ধূমপানের মৌতাতের সময়। আমার নোকরটা টিকে জেলে কলকে সাজিয়ে আলবোলাটা নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে আর আমি লম্বা নল মুখে দিয়ে সুখে তামাক খেতে খেতে ফুলবাগানে টহল দেই। তা নোকরটা আজ কেন যে আসছে না কে জানে ?

—আমিই ওকে বারণ করেছি।

—কিন্তু বেগমসাহেবা, তামাক না পেলে যে আমার বুদ্ধি খুলবে না। বুদ্ধি না খুললে প্রশ্নের জবাব দেব কেমন করে ?

বেগমসাহেবার তাড়া আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ধরার বক্ষে নেমেছে। এসময় প্রাসাদে ফেরা একান্ত প্রয়োজন। হঠাৎ বাদশাহ যদি তাঁর কক্ষে আসেন ? তাই মরীয়া হয়ে বলেন—বাঁদীকে সঙ্গে আনিনি। তাই আমি নিজেই তামাক সেজে আনছি।

—তোবা তোবা ! আপনি আমার জন্য তামাক সাজবেন ? এতক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়লেন বীরবল।

—তাতে কি হয়েছে? আপনার নোকরকে বল্লে সেই সব দেখিয়ে দেবে। চট্ করে সেজে আনছি আমি।

—কিন্তু তামাক সাজলেই তো হবে না। গড়গড়াটা হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে যে।

—তাও ঘুরব। আপনি শুধু তাড়াতাড়ি বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন বেগম।

সেই সুযোগে অমরনাথও অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়া প্রস্তুত। ছুটে চলে গেল সে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বেগম নুরুন্নেসা গড়গড়া হাতে বীরবলের পেছনে পেছন ঘুরছেন, আর লম্বা নল মুখে দিয়ে বীরবল অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছেন। কিন্তু প্রশ্নের আর জবাব মিলছে না।

—অনেকক্ষণ তো তামাক সেবন করলেন এবার বলুন। কাতর কণ্ঠে বলেন বেগম।

—অপেক্ষা করুন, মেজাজটা আসছে। শিগ্রীই জবাব দিচ্ছি।

কেটে গেল আরো পাঁচ মিনিট।

—আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে!

—কেন? দাঁড়িয়ে পড়েন বীরবল।

—আমার হাত পা ব্যথা হয়ে গেছে।

—তা বটে তা বটে! আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

—আবার পেছন পেছন চল্লেন বেগম।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সেখানে এসে হাজির হলেন খোদ সম্রাট আকবর। বেগম নুরুন্নেসাকে এভাবে গড়গড়া বইতে দেখে তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। একি ব্যাপার? ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল বাদশাহের।

ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে ওঠেন বেগম।

—তোমাকে এখানে এ অবস্থায় কেন দেখছি শিগ্রী জবাব দাও। মিথ্যা বললে মৃত্যুদণ্ড।

কেঁপে উঠলেন বেগম। তবুও উত্তর দিতে বাধ্য হলেন।

—আমি ভাই এর জন্য আসতে বাধ্য হয়েছি। তাড়া থাকায় নোকরের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই তামাক সেজে এঁর পেছন পেছন ঘুরছি।

কেঁদে ফেল্লেন বেগম।

—আমার গোস্তাখী মাপ করবেন বেগমসাহেবা। আমি উদাহরণ সহযোগে আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম।

নতজানু হয়ে বেগমের উদ্দেশ্যে কথা কয়টি বললেন বীরবল।

—কি রকম? এবার কৌতূহলী হন বাদশা।

—জাহাঁপনা, মানুষের সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে নিজের স্বার্থ। আপনার প্রশ্ন ছিল—কি করে? জবাবটা সচক্ষেই দেখলেন। স্বয়ং বেগমসাহেবার হাতে গড়াগড়া, আর আমি সেই আলবোলায় টান দিচ্ছি। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এইভাবেই বেগমসাহেবা বাঁদীর কাজ ও পোশাক পরতে পিছু হঠলেন না। এই আমার জবাব।

—কিন্তু এতে তো বেগমের স্বার্থসিদ্ধি প্রকাশ পাচ্ছে না। আমি দেখছি তিনি যা করেছেন সব বুড়বকের জন্য। বললেন সম্রাট।

—বুড়বক যে তাঁর নিজের ভাই। তাও বৈমাত্রেয় নয়, একেবারে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর সকলে অমর নয়। আপনার বয়স হয়েছে। বুড়বক খাঁ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হলে আপনার অবর্তমানে বেগম-সাহেবার কোন দিক থেকেই অসুবিধা হবে না। নিজের ভবিষ্যৎ যে সকলেই গুছিয়ে নিতে ভালবাসে।

—সাবাস্ বীরবল। এই নাও আমার কণ্ঠেরএই মুক্তোমালা। বলে নিজের হাতে তা পরিয়ে দিলেন বীরবলের গলায়। তারপর বল্লেন—তোমাদের বেগমকে অন্দরমহলে নিয়ে বসাও। তারপর পাল্কির ব্যবস্থা কর। আমি এখন যাচ্ছি। আমার ঘোড়া প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সম্রাট। আর সসম্মানে বেগমকে অন্দরমহলে নিয়ে এলেন বীরবল।

—কিরে নুরুন্নেসা, এত কাঁদছিস কেন? বল বহিন কি হয়েছে? সস্নেহে কাছে টেনে নেন বড়ি বেগমসাহেবা।

—আমাকে চিরদিনের মত এ প্রাসাদ ত্যাগ করে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

—সম্রাট আদেশ দিয়েছেন? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বড়ি বেগমসাহেবা।

—জী।

—কিন্তু কেন?

—সে বড় লজ্জার কথা। আমি কোন মুখে বলব! আবার কাঁদতে থাকেন নুরুন্নেসা।

—বল বহিন, আমার সব খুলে। তুই কতদিন পরে আমার মহলে

এসেছিল, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পেস্তার সরবত তৈরী করিয়েছি, একটু মুখে দে। তারপর তোর কথা শোনার পর ব্যবস্থা করব এর কোন সমাধান করতে পারি কিনা।

—সব কথা বলব বলেই তো এসেছিলাম। কিন্তু এখন লজ্জায় কণ্ঠ রোধ হয়ে যাচ্ছে।

—নে, সরবতটা গলায় ঢাল তো?

নিজের হাতে তাঁকে সরবত পান করালেন বড়ি বেগম। তারপর বললেন—এবার বল। কোন কিছু গোপন করবি না।

—না করব না। কথা কয়টি বলে নুরুন্নেসা তার ভাই এর জন্য কি করতে বাধ্য হয়েছেন সবই বলেন।

—বুঝলাম এতক্ষণে, কেন সম্রাট এ কঠিন আদেশ দিয়েছেন। কখন

— চলে যাবার কথা বলেছেন?

—আজই মধ্যাহ্নে। তাই বিদায় নিতে এসেছি।

—সত্যিই কি চলে যাবি?

—কি করব, সম্রাটের হুকুম। আবার কাঁদতে থাকেন নুরুন্নেসা।

—কাঁদিস না। একটু চিন্তা করতে দে।

বড়ি বেগম জানালার কাছে এসে দাঁড়ান।

—খুব ভাল পাকা আম আছে। কেটে দেব বেগমসাহেবা? বাঁদীর প্রশ্নে 'আম' কথাটা থাকায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বেগমসাহেবার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে বীরবলের কথা মনে পড়ে যায়। এই আমের ব্যাপার নিয়েই বীরবল একদিন সম্রাটকে অপদস্ত করে তাঁর মানরক্ষা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন—আম কাটিস পরে। এখন তুই শিগ্রীই বীরবলকে খবর দে। বল গিয়ে, দারুণ দরকার। এক্ষুণি যেন আমার মহলে চলে আসেন।

—তিনি তো ছুটিতে আছেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সে কথা জানি। তুই পাল্কি নিয়ে এক্ষুণি চলে যা।

—এখনি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ কতবার বলব?

—যাচ্ছি বেগমসাহেবা। তসলিম্ জানিয়ে চলে যায় সে।

—বীরবল এলে নিশ্চয় একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কিন্তু যখন জানবেন আমার জন্যই ডেকেছেন তখন তো কোন উপায় বাতলে দিতে রাজী হবেন না।

—তাঁকে এখনও চিনিসনি তাই এমন কথা বলছিস। তাঁর বুদ্ধির কাছে

আমাদের সম্রাট চিরদিন হেরে গেছেন। তাই তো এত ভালবাসেন তিনি বীরবলকে।

—জাহাঁপনা! নুরুন্নেসা চলে যাচ্ছে কিছুতেই মার্জনা করবেন না তাকে? বলেন বড়ি বেগমসাহেবা।

—না। গম্ভীর স্বর সম্রাটের।

—এতদিন রইল প্রাসাদে, এত প্রিয় সে আপনার, অথচ এমন ভাবে চলে যেতে হবে তাকে?

—হ্যাঁ। তবে—।

—বলুন সম্রাট, চুপ করে গেলেন কেন?

—বলছিলাম ওর যদি এ. প্রাসাদের কোন সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণ থাকে তবে তা যেন নিয়ে যেতে পারে।

—শুনেছিস নুর, কি বললেন সম্রাট?

মাথা নাড়েন নুরুন্নেসা।

—তোর আর কোন ইচ্ছে আছে?

আবার মাথা নেড়ে ইচ্ছে প্রকাশ করে সে।

—ওকে ওর ইচ্ছের কথা প্রকাশ করতে বল বেগম।

—সম্রাট! বিদায়ের আগে নিজের হাতে তৈরী করে আপনাকে সরবত পান করাতে চাই। জানি না এ জন্মের মত এই শেষ সেবা কিনা আমার। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন নুরুন্নেসা বেগম।

—বেগম, ওকে বল সরবত আনতে। বড়ি বেগমসাহেবার দিকে তাকিয়ে কথা কয়টি বলেন সম্রাট।

সম্মতি পেয়ে তাড়াতাড়ি নুরুন্নেসা ভেতরের ছোট্ট ঘরটিতে চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে আসেন সরবত নিয়ে।

সম্রাট পান করলেন। তৃপ্তিতে ভরে উঠল তাঁর সমগ্র মুখখানি।

—বেগম, এবার ওকে যেতে বল।

—আমি প্রস্তুত। কণ্ঠ এখনও ভারভার রয়েছে নুরুন্নেসা বেগমের। যেতে গিয়ে বড়ি বেগমসাহেবার চোখের দিকে তাকালেন। দেখলেন পরম আশ্বাসের বার্তা ফুটে উঠেছে সেখানে। নিশ্চিন্ত মনে নুরুন্নেসা পাল্কিতে উঠলেন।

—বেগম! আবার বড়ি বেগমসাহেবার দিকে তাকালেন সম্রাট।

—বলুন জাহাঁপনা।

—নুরুন্নেসাবেগম চলে গেছে?

—জী। জানালা দিয়ে দেখলাম এই মাত্র পাল্কিতে উঠল।

—ওর কি কসুর হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে না?

—নিশ্চয় এমন কিছু অন্যায় করেছে যার ফলে এত কঠিন শাস্তি দিলেন তাকে।

—হ্যাঁ বেগম, ওর অপরাধ মার্জনা করা যায় না। আজই তোমাকে সব বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু এত ঘুম পাচ্ছে বলার নয়। মধ্যাহ্নের এই গুরুপাক ভোজনের পর সরবতটা পান করলাম। সমস্ত শরীরটা যেন বিশ্রামের জন্য আঁকপাঁক করছে। কাল পরশু বলব কেমন?

—তাই বলবেন জাহাঁপনা।

—আমি এখন ঘুমোব।

শয্যায় নিজের শরীরটা এলিয়ে দিলেন সম্রাট। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

বীরবল প্রস্তুত ছিল। বাঁদী খবর দেওয়া মাত্র সে লোকজন নিয়ে এল। নিদ্রিত সম্রাটকে একটি পাল্কিতে উঠিয়ে দেওয়া হল। ছুটে চল্‌ল দুটি পাল্কির বাহকেরা।

—একি বেটি! এমন অসময়ে গরীব আব্বার বাড়ীতে তুই?

—জী। কিন্তু আমি একা নই। স্বয়ং সম্রাটও এসেছেন।

—কি বলছিস তুই। আমার বাড়ীতে সম্রাট স্বয়ং?

—জী। এখন তিনি গভীর ঘুমে মগ্ন। জেগে ওঠার আগে একটা ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

—এক্ষুণি করছি। আনন্দে ঝলমল করে নুরুন্নেসার মায়ের মুখ।

—এর পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে? কি হয়েছে বলবি? প্রশ্ন করেন নুরের পিতা।

—আর বলনা আব্বাজান, সে অনেক কথা। সব কিছুর জন্য দায়ী ভাইজান। ওরই জন্য সম্রাট প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন আমায়।

—তাড়িয়ে দিয়েছেন? শঙ্কিত হলেন তাঁর মা। এই মাত্র দাসীকে ঘর গুছোবার নির্দেশে দিয়ে এলেন তিনি।

—তাড়িয়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বড়ি বেগমের অনুরোধে বীরবল যে ব্যবস্থা করলেন তার ফলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তবে নাক মলছি আর ভাইজানের কথা শুনে বীরবলকে অশ্রদ্ধা করব না। আজকে তিনি বুদ্ধি না দিলে সম্রাটের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে যেত আমার। এই বলে নুরুন্নেসা সব কথা বলতে থাকেন তাঁদের।

ভোরের আলো সবে ফুটি ফুটি করছে। পাখীর কল-কাকলি শুনতে পেরে ধরমড় করে উঠে বসলেন সম্রাট।

—বেগম! তানসেনের কি হয়েছে বলতো? এখনও গান আরম্ভ করছে না কেন সে?

—তানসেন! খিল খিল করে হেসে উঠলেন নুরুন্নেসা।

—তানসেনকে এখানে পাবেন কোথায়?

—একি! তুমি এখানে কেন? তোমার আব্বার কাছে ফিরে যাওনি?

—এটাইতো আমার আব্বার বাড়ী।

—তোমার আব্বার বাড়ী! বিস্মিত হয়ে সম্রাট চারিদিকে তাকান। সত্যি এ কার বাড়ী? এ কার ঘরে শুয়ে রয়েছেন তিনি?

—আমি এখানে এলাম কি করে? রাগত কণ্ঠে বলেন সম্রাট।

—আপনারই হুকুমে।

—আমার হুকুমে! কি বলছ তুমি?

—রাগ করবেন না সম্রাট। আপনিই তো বলেছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয়বস্তুকে আমি সঙ্গে নিয়ে আব্বার কাছে আসতে পারি। আপনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু সম্রাট।

—বটে?

তার পরেই হো হো করে হেসে উঠলেন। এরপর সস্নেহে নুরকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন—এবার বলতো পেয়ারী, কৌশলটি কার কাছ থেকে শিখলে?

সম্রাটের বুকে মাথা রাখেন নুরুন্নেসা। বুঝতে পারেন মেঘ কেটে গেছে। তাই বলেন, আপনার রাজ্যে এমন সুন্দর কৌশল শেখাবার মানুষ আর কজন আছেন সম্রাট?

—এবার বুঝতে পারছ তো বীরবলকে কেন এত ভালবাসি? কেন তার জায়গায় আর কাউকে আনতে আমি নারাজ?

—বুঝেছি জাহাঁপনা, আর বলতে হবে না। এবারের মত মাফ করে দিন আমায়।

—আমার ব্যবহারেও বুঝছ না মাপ করে দিয়েছি কিনা? আরো নিবিড় ভাবে বেগমকে জড়িয়ে ধরলেন সম্রাট।

আনন্দে স্বামীর বুকে মাথা রেখে কেঁদে ফেল্লেন নুরুন্নেসা।

—বীরবল।

—বলুন জাহাঁপনা।

—তোমাকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেন বলতো?

—আপনার দিল তো এখন খুশীতে সব সময় ভরপুর থাকে। সে জন্যই এ ইচ্ছা জাগছে।

—এ খুশীর কারণটা কি সেটাইতো জানতে চাইছি?

—ফতেপুর সিক্রীতে যবে থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছেন তবে থেকেই আপনার দিল খুশীতে ভরপুর হয়ে রয়েছে। আর আজ বিশেষ খুশীর কারণ হল, আমি যে গতকাল আপনার নূতন ধর্ম 'দীন ই ইলাহী' গ্রহণ করেছি, সে জন্যই আমাকে বুকে জড়াতে মন চাইছে আপনার।

—ঠিক বলেছ বীরবল। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন আকবর। তার পরেই যেন বিষাদে ভরে গেল তাঁর মুখখানা। বললেন—সকল ধর্মের সার এই ধর্মে সংরক্ষিত হয়েছে কিন্তু তবুও আমাকে নিয়ে মোটে নয়জন ছাড়া আর কেউ এই ধর্ম গ্রহণ করলেন না। অবশ্য আমি এ জন্য কাউকে জোর করিনি বা বল প্রয়োগ করিনি। ব্যথিত কণ্ঠেই কথা কয়টি বললেন সম্রাট। অন্যান্য পদস্থ মন্ত্রীরা মাথা নত করে ফেল্‌লেন। সভাসদরা এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন বীরবল।

—হাসছ কেন বীরবল? অবাক হলে সম্রাট এবং অন্যান্য সকলে।

—একজন্য আপনি দুঃখ করছেন? তাহলে দেখছি এই সকল মহামান্য ব্যক্তিদের এবং সভার অন্যান্য সকলের মনের কথা আপনি টের পাননি। অথচ সে কথা জানতে আমার বাকী নেই।

সকলে রোষদৃষ্টিতে তাকান বীরবলের দিকে। কেউ কেউ আবার ভয়ে কাঁটা হয়ে যান। কেননা সম্রাটের এই নূতন ধর্ম প্রচারকে কেন্দ্র করে অনেকেই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করবার ব্যবস্থা করছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে। সর্বনাশ! বীরবল কি সব টের পেয়ে গেছেন। এখন উপায়?

—বল বীরবল এঁদের মনের কথা কী? আমি সম্রাট তার উপযুক্ত ব্যস্থা নেব।

—অপরাধ নেবেন না। উঠে দাঁড়ালেন আবুলফজল।

—ওনার মনের কথাটাই যে সত্য হবে তার প্রমাণ কী?

—আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি। তাই বলছি আমি যে কথাটা বললাম তা খুব ভুল বলিনি। সম্রাটের বেদনা আমাকে ব্যথা দিচ্ছে বলেই কথাটা

বললাম। বললেন বীরবল।

—সেজন্য ত আপনিই দায়ী? বললেন আবুল ফজল।

—একেবারেই নয়। হাসি খুশী ভাব বীরবলের নয়।

—আপনাদের তর্কাতর্কি বন্ধ করুন। আবুল ফজল, আপনি নিজে আসনে বসুন। বীরবল, এবার তুমি বল এঁদের মনের কথা।

—আমি কি এক একজনের মনের কথা আলাদা করে ধরিয়ে দেবো না সকলের মনের কথা এক কথাতেই বলব?

—এক কথায় যদি বলতে পার, মন্দ কি?

অনেকে ভয়ে ও অশান্তিতে কাঠ হয়ে রইলেন। তাঁদের মুখে চোখে ভয়ানক উৎকণ্ঠা। ষড়যন্ত্রকারীরা মনে মনে প্রার্থনা জানায়:

এবারকার মতো বাঁচিয়ে দাও আল্লা। ভবিষ্যতে আর কোনদিনও মানুষের উসকানিতে ভুলব না। শুধু একবার পরীক্ষা কর আল্লা। মুসলমানের কাছে মুখের জবানটাই সব চেয়ে বড়। একবার তার পরীক্ষা হোক। জান যাবে যাক তবু আর কোনদিনও সম্রাটের বিরুদ্ধে যাব না।

আবুল ফজল, ফৈজি, মানসিংহ এঁরা কিন্তু এ চিন্তা করছিলেন না। তাঁরা ভাবছিলেন যে বীরবলকে তাঁরা নিজেরাও এত ভালবাসেন, সামান্য একটা ধর্মের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কেন আজ তিনি শত্রুর মত আচরণ করছেন? কেন সম্রাটের মন বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন? কি উদ্দেশ্য রয়েছে ওঁর?

সবাই যেন ভীষণ এক সংকটের সামনে দাঁড়িয়েছে, প্রতি মুহূর্ত গুণছে সবাই। রাজসভা নিস্তব্ধ।

—বল বীরবল, দেরী করছ কেন?

সকলের দিকে একটু দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন বীরবল, তারপর একটু হেসে বললেন—আপনি কাউকে জোর জুলুম করেননি অথচ মোটে নয় জন ছাড়া আর কেউ আপনার নতুন ধর্মমত গ্রহণ করেন নি সেজন্য বেদনা বোধ করা ঠিক নয়। কারণ এঁদের সকলের মনের কথা হল—আকাশ সূর্য চন্দ্র যতদিন, ততদিন আপনার রাজ্যে আনন্দ, মহিমা ও কল্যাণ বিরাজ করুক। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে?

সকলের দম আটকে এসেছিল এতক্ষণ। এবার চারিদিক যেন ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন আবুল ফজল, ফৈজি ও মানসিংহের মুখ। সম্রাট উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। লাফ দিয়ে উঠে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে।

—কখন ইচ্ছেটা জেগেছিল আর এতক্ষণে তা পূরণ করলেন?

—সবাইকে যে জাদু দেখিয়ে দিলে তুমি। আর সেই জাদু দেখেই মুগ্ধ হয়ে ইচ্ছেটা এতক্ষণে পূর্ণ করতে সমর্থ হলাম।

এবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল সমগ্র সভাকক্ষ।

—বিয়ের সেই তিনমাস পর এলাম বাপের বাড়ী অথচ বাপুজী তুমি যেন গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন। কি হয়েছে বলতো?

—আর বলিস না সম্রাটের খেয়ালের কথা। এখন তাঁর সাধ হয়েছে দু'টি এমন জন্তুকে একসঙ্গে দেখবেন যার মধ্যে একটি হবে স্বভাব কৃতজ্ঞ, আরেকটি জাত অকৃতজ্ঞ, না দেখাতে পারলে কঠিন শাস্তি দেবেন।

—সত্যি অদ্ভুত খেয়াল! তা এর জন্য এত চিন্তার কি আছে? সত্যি কি তুমি এমন জন্তুর সন্ধান পাওনি?

—পেয়েছিরে পেয়েছি। কিন্তু সে ধরণের দু'টি জন্তুকে এক সঙ্গে রাজ সভায় নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা ভাবছি। এর মধ্যে যে মান অপমানের ব্যাপার থাকছে।

—মান অপমানের ব্যাপার? ওঃ! বুঝেছি। হেসে লুটিয়ে পড়ে মেয়ে। সেজন্য চিন্তা নেই। ওদিকটা আমিই ব্যবস্থা করছি। কাল দরবারে সেই ধরণের দু'টি জন্তু নিয়ে যেতে পারবে।

—আমি ঠিকই জানতাম বেটি, এ বিষয়ে তুই আমায় সাহায্য করবি।

সাম্রটের দরবারে আজ লোকে লোকারণ্য। বীরবলের পরাজয় এবং শাস্তি স্বচক্ষে দেখবার জন্য অনেকেই উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। এমন সময় দরবারে এসে প্রবেশ করলেন বীরবল। সঙ্গে তার একটি যুবক ও একটি কুকুর। সিংহাসনে সম্রাট উপবিষ্ট ছিলেন।

—একি! সভার মধ্যে কুকুর! ছিঃ ছিঃ বীরবল! একি করলে তুমি?

সভার সকলের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডাক শুরু করে দিল।

কুর্নিশ জানালেন বীরবল সম্রাটকে। তারপর বললেন—আপনার আদেশেই তো দু'ধরণের জন্তু নিয়ে এলাম।

কুকুর কিন্তু ডেকেই চলেছে।

—আঃ! কেন এমন করছিস? এবারে কুকুরের উদ্দেশ্যে বললেন বীরবল।

—ঘেউ ঘেউ ঘেউ। উত্তর দিল কুকুর।

—ও বুঝেছি। শুনুন সম্রাট ও বলছে, মনিবঠাকুর, তুমি ভালবেসে নিয়ে এলে কি হবে? এরা আমায় চিনল না। আমি আসাতে সকলেই অসন্তুষ্ট। তাই চলে যেতে চাই। বীরবল হাত বোলালেন ওর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল ও।

—আমার সঙ্গে এখন এমন বেয়াড়া রসিকতা কর না বীরবল। তোমার কুকুর আমার মাথা গরম করে দিচ্ছে। এক্ষুনি শাস্তি দিয়ে ফেলতে পারি।

—প্রসন্ন হোন সম্রাট, এ আমার সত্যি তামাশা নয়। দয়া করে শুনুন। এই দু'টি জন্তুর একটি হল আমার জামাই। পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ উপহার শ্রেষ্ঠ বাক্য, শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ এই জামাই শ্রেণীর লোকদের দিন, তবু ওদের লোভ মিটবে না, তবু কৃতজ্ঞ থাকবে না। এত বড় জাত-অকৃতজ্ঞ জন্তু পৃথিবীতে আর কে আছে সম্রাট? কিন্তু এই কুকুরটার দিকে চেয়ে দেখুন, মূর্তিমান কৃতজ্ঞতা। বিপদে সম্পদে সমানে প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক, অনাহারে থাকুক—সৃষ্টি রসাতলে যাক,—প্রভুকে ছাড়বে না কখনো।

রাজসভা স্তব্ধ। আকবরের মুখে এবার ফুটে উঠল প্রসন্নতার আভাস। শুধু বললেন; অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির ঠাঁই নেই এ রাজ্যে। আমি এখুনি জল্লাদকে দিয়ে তোমার জামাইকে কোতল করাবার ব্যবস্থা করছি।

এবার মুখ শুকিয়ে গেল জামাই এবং সভার সকলের। কিন্তু বীরবল মিটিমিটি হাসতে লাগলেন, বললেন, শুনুন সম্রাট। আপনি পৃথিবীর ঈশ্বর, আপনার হুকুম পৃথিবীর সকল অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরই জন্য। কিন্তু জাহাঁপনা, আমরা যে প্রত্যেকেই কারো না কারো জামাই। আপনিও এর থেকে বাদ যাননি। এখানে আমরা সকলেই জাত-অকৃতজ্ঞ।

হো হো করে হেসে উঠলেন সম্রাট। সঙ্গে যোগ দিল সভাসদরা। সমগ্র সভা শুধু নয় চিকের আড়ালে বেগম এবং বাদশাহজাদীরাও এ ওর গায়ে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সকলের হাসি দেখে কুকুর আবার ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে।

—আবুল ফজল। আপনি অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি। তাই আজ আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

—বলুন জাহাঁপনা।

—লোকে আমাকে বলে দিল্লীশ্বরো, জগদীশ্বরো। এটা কি ঠিক?

—কসুর মার্জনা করবেন। সম্রাটের মনে আজ এতদিন পর হঠাৎ এ প্রশ্ন জাগল কেন?

—তার কারণ, আমি ভাবছি প্রকৃতপক্ষে কে বড়?

—আপনার অপর প্রতিদ্বন্দ্বীটি কে?

—কেন ঈশ্বর!

—ঈশ্বর! কি বলছেন আপনি? বিস্মিত হন আবুল ফজল।

—হ্যাঁ ঠিকই বলছি। আপনিই বলুন আমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়?

—গোস্তাকি মার্জনা করবেন। আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আবার আসনে উপবেশন করলেন আবুল ফজল।

—ফৈজি। আপনার কাছ থেকে কি এ প্রশ্নের জবাব পেতে পারি?

—পারেন। তবে এর জন্য কি অপরাধ নেবেন?

—না না, আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।

—ঈশ্বর এ জগতের সৃষ্টিকর্তা। আমরা সামান্য মানুষ। তাই এ ধরণের খেয়ালী প্রশ্নগুলো আমাদের মনে উদিত না হওয়াই ভাল।

—বুঝলাম আপনি ঈশ্বরকেই বড় বলছেন। কিন্তু ঈশ্বর যদি জগতের সৃষ্টিকর্তা হন তবে লোকে আমাকে জগদীশ্বরো বলে কেন?

—প্রজাদের চোখে যে আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

—আপনি আসনে উপবেশন করুন। আমার মন কিন্তু এখনও সন্তোষ লাভ করেনি।

—এবার আপনাদের মধ্য থেকে কেউ কিছু বলুন?

সভাসদদের দিকে তাকালেন সম্রাট। তাকালেন অন্যান্যদের দিকে।

কিন্তু সকলেই মাথা নীচু করে নিলেন।

বীরবল কিন্তু মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

—তোমারও কি সেই একই মত?

—একদম নয়। আমার মতে ঈশ্বরের চেয়ে অনেক শক্তিমান আপনি।

—সেকি! সভার সকলেই প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন।

—একি বলছ বীরবল? বিস্মিত সম্রাট প্রশ্ন করলেন।

—ঠিকই বলছি জাহাঁপনা। আপনি যা পারেন, ঈশ্বর তা পারেন না।

বিস্মিত হয়ে সকলে তাকিয়ে রইলেন বীরবলের দিকে।

—জাহাঁপনা। মার্জনা করুন। মহামান্য বীরবল যা বলছেন একেবারেই

ঠিক নয়। তিনি আপনার প্রিয়পাত্র। তাই আপনার মনের সন্তোষ বিধানের জন্য একথা বলছেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। বললেন মানসিংহ।

—শুনলে তো বীরবল? আবার তাকালেন সম্রাট বীরবলের দিকে।

—শুনলাম।

—এবারেও কি সেই একই কথা বলবে?

—আমার মত পালটায় না।

—কিন্তু আমি যে ঈশ্বর অপেক্ষা বড় সেটা কী কোনপ্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পার?

—অবশ্যই পারি।

—বেশ দাও।

—সম্রাট আপনি কি কোনও ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দিতে পারেন?

—গুরুতর অপরাধ হলে পারি।

—কিন্তু ঈশ্বর তা পারেন না। গম্ভীরভাবে বলেন বীরবল।

—মানে?

—মানে আমি বলতে চাই—ঈশ্বর এ বিশ্বপৃথিবীর সর্বময় কর্তা। তিনি সর্বব্যাপী। সর্বত্র তাঁর অধিকার। সুতরাং গুরুতর অপরাধ করলে মানুষকে তিনি কোথায় নির্বাসন দেবেন? সেইজন্যই বলছি—আপনি যা পারেন, তিনি তা পারেন না।

এতক্ষণে সমস্ত সভা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হেসে উঠলেন আকবর।

উঃ! কি বুদ্ধি এনার। কেমন গুরুগম্ভীরভাবে সম্রাটের মন রক্ষা করে প্রকারান্তরে ঈশ্বরকেই মহাশক্তিমানরূপে ঘোষণা করে দিলেন। ফৈজি চুপি চুপি কথাটা আবুল ফজলের কানে কানে বললেন।

আবুল ফজল হেসে সম্মতি জানালেন।

—কানে কানে নয়। জোরেই কথাটা বলুন। হাসতে হাসতে বলেন সম্রাট।

—প্রয়োজন হবে না। এতক্ষণে সকলে প্রাণখুলে একটু হাসতে পারছি। কথাটি বললেন মানসিংহ।

—বীরবল!

—বলুন জাহাঁপনা।

—তোমার কাছে হেরে গেলাম। তবে একটা প্রশ্নের জবাব কিছুতেই পাচ্ছি না।

—বলুন জাহাঁপনা।

—প্রশ্নটা তোমাকে নয়, মানসিংহকে করতে চাই।

—বলুন জাহাঁপনা। সম্মানসহকারে জবাব দিলেন মানসিংহ।

—ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এমন কোন কোন কাহিনী প্রচলিত আছে, যা বিশ্বাস করা কঠিন।

—সে কেমন জাহাঁপনা?

—হাতির ডাক শুনে তিনি ছুটতে ছুটতে বার হয়ে গেলেন। কেন তাঁর চাকর বাকর ছিল না?

প্রশ্ন শুনে মানসিংহ হতভম্ব হয়ে গেলেন।

—কি হল, পাচ্ছেন না জবাব দিতে?

—মার্জনা করবেন। আপনি বেছে বেছে এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন করেন যে এর জবাব দেওয়া মুস্কিল হয়। তবে আমি না পারলেও মনে হয় মহামান্য বীরবলই উচিত জবাব দেবেন।

—বেশ! বীরবল তুমি জবাব দেবে?

—দেব। কিন্তু সভাভঙ্গের পর আপনাকে আমার সঙ্গে বাইরে যেতে হবে।

—কেন সভায় বসে কি তার জবাব দেওয়া যায় না? বিদ্রূপের স্বর সম্রাটের কণ্ঠে।

—আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই যে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি তা কিন্তু ব'লিনি। একটা জিনিস দেখাবার জন্য নিয়ে যেতে চাই। শীতে মিষ্টি রোদে হাঁটতে ভালই লাগবে।

—কি জিনিস?

—সেটা নিয়ে আসবার জন্যই ঘণ্টা খানেকের ছুটি চাইছি।

—কেন আর কেউ আনতে পারবে না?

—মাপটা কি সকলের জানা নেই।

অভিবাদন জানিয়ে চলে যান বীরবল।

—তুমি কিন্তু এক ঘণ্টার ছুটি নিয়েছিলে। আর সে জায়গায় ফিরে এলেছ আরো আধঘণ্টা পরে।

—সে জন্য মার্জনা চাইছি হুজুর। ছোট্ট ছেলেটা বায়না ধরেছিল। তাই তাকে ভোলাচ্ছিলুম। বড্ড জেদী ছেলে।

—কি বাজে বকছ ? আমাকে বোকা বানাচ্ছ ? ছেলেকে শান্ত করবার জন্য কি তোমার হাতের কাছে কোন খেলনা ছিল না ?

—হুজুর ঘ্যানঘেনে ছেলেতো দেখেননি, তাই একথা বলছেন।

আকবর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকালেন বীরবলের দিকে।

—জাহাঁপনা, আপনি প্রজাগণের পিতা, আপনি আমারও পিতৃতুল্য। বলতে বলতে শিশুর মত কঁাদতে আরম্ভ করলেন বীরবল। কঁাদতে কঁাদতে দামী গালিচার ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সম্রাট এবং সভার সকলে হতভম্ব। বীরবলের মত হাস্যরসিক মানুষ কঁাদছে। এ যে অতি অভাবনীয় ব্যাপার ? নিশ্চয় তঁার পারিবারিক জীবনে কিছু একটা ঘটেছে। সম্রাট হন্তদন্ত হয়ে সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। বীরবলের গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বল্লেন—শান্ত হও বীরবল। কী হয়েছে তোমার বলতো ?

কিন্তু জবাব না দিয়ে বীরবল উচ্চৈস্বরে কঁাদতে আরম্ভ করলেন। সমগ্র রাজসভা একেবারে হতচকিত।

—বীরবল, বল কি হয়েছে ? সস্নেহে প্রশ্ন করলেন সম্রাট।

—আমি আখ খাব।

একথা শুনে সকলে অবাক।

তৎক্ষণাৎ সম্রাটের আদেশে আখ এসে গেল। সম্রাট নিজের হাতে ভালো দেখে একটা আখ নিয়ে বীরবলকে দিলেন।

—কেটে দিতে বলুন। আবার কেঁদে উঠলেন বীরবল।

টুকরো টুকরো করে তখনই আখ কেটে দেওয়া হল।

—একটা টুপির মধ্যে আখ রেখে খাব। কেঁদে কেঁদে বল্লেন বীরবল।

সঙ্গে সঙ্গে তাই করা হল।

—এ টুপি নয়। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বীরবল সেটা। আমি ভালো টুপিতে রেখে আখ খাব।

সঙ্গে সঙ্গে আকবর নিজে মখমলের টুপিতে আখের টুকরোগুলো রেখে নিয়ে এলেন তাঁর কাছে।

—নাও বীরবল খাও। হঠাৎ তোমার কি হল কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কেন আখটা ও ভাবে টুকরো করলেন ? ওগুলো আবার জোড়া দিয়ে দিন। আবার কান্না শুরু হয়ে যায় বীরবলের।

—বীরবল, অমন করে না। এই টুকরোগুলো কি করে জোড়া লাগাব, তুমিই বল ?

—তাহলে আমার কান্না কি করে থামবে ?

—এ যে শিশুরও অধম। হঠাৎ এমন জেদী আর এমন একগুঁয়ে কেন হয়ে উঠলে বীরবল ? হতাশায় বেদনায় বাদশাহের সমগ্র মুখখানি ভরে গেছে।

সেদিকে তাকিয়ে বীরবল ফিক্ করে হেসে ওঠেন।

—এবার বুঝছেন তো সম্রাট একগুঁয়ে শিশুকে বাগে আনা কি কঠিন ?

—ও তাহলে আমাকে জব্দ করবার জন্য এতক্ষণ ধরে একগুঁয়ে শিশুর অভিনয় করছিলে ?

বিস্মিত সম্রাটের দিকে তাকিয়ে এবার বীরবল বলেন—

—তাহলে বুঝতে পারছেন এ ধরণের একগুঁয়ে শিশুকে খেলনা দিয়ে ভোলানো যায় না ?

—খুব বুঝেছি, ষোলো আনা বুঝেছি। উঃ! কি ভয়টাই না দেখিয়ে দিয়েছিলে।

সমস্ত সভা হাসির তোড়ে যেন ভেসে যাচ্ছে। লজ্জা পেয়ে সভা ভঙ্গ করে বীরবলের সঙ্গে সম্রাট বাইরে বার হয়ে এলেন।

সরোবরের দিকে সম্রাটকে নিয়ে চলেছেন বীরবল। হঠাৎ সম্রাট দেখলেন রাজাবাড়ীর এক ভৃত্য পা পিছলে জলে পড়ে গেল। এই ভৃত্যটি সেলিমের ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই এদিকে বেড়ায়। আজও দূর থেকে তাঁর মনে হল তাঁর নাতিকে নিয়েই ভৃত্যটি জলে পড়ে গেল।

—কি সর্বনাশ! সম্রাট স্থান কাল ভুলে পাগলের মত জলের দিকে ছুটলেন। বীরবলের বারণ না শুনে নাতিকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি নিজেই জলে ঝাঁপ দিলেন। তারপর একটা মোমের পুতুল নিয়ে উঠে এলেন।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন বীরবল। বল্‌লেন—জাহাঁপনা, ভালবাসার সামগ্রীর জন্য মানুষ পাগল হয়ে নিজের পদ মর্য্যাদাও ভুলে যায়। হাতিটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়। তাই তিনি ডাক শুনেই ছুটতেন।

—ওঃ! তাহলে তোমারই এ কারসাজি ?

—সে কথা অস্বীকার করি কি করে ? আপনার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমি সোজা চলে গেলাম মোমের পুতুলের দোকানে। সেখান থেকে আপনার নাতির মত মাথায় লম্বা পুতুল কিনে ভৃত্যটির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাইতো একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল।

—তারপর দেরী হওয়ার অজুহাতটি দিতে গিয়ে এক চমৎকার অভিনয়ও

তো করে ফেল্লে ?

—তা না করলে আপনি যে রেগে যেতেন। সে কথা থাক। আশা করি এখন মহামান্য মানসিংহকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার জবাব আমি দিতে পেরেছি ?

—পারনি আবার! খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হেসে উঠলেন সম্রাট।

— আপনি আমাকে বাঁচান। ঘুম ভেঙে বাগানে পায়চারী করতে করতে নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করেছিলেন বীরবল। এমন সময় বাদশাহের পেয়াদার সঙ্গে হীরাচাঁদ নামে এক বণিক এসে তাঁর পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল।

—কি ব্যাপার! কি হয়েছে ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন বীরবল।

—সম্রাট ওর কোতলের আদেশ দিয়েছেন। বলল পেয়াদা।

—কেন ?

—ওঁর মুখ দেখলে নাকি মানুষের সারা দিন অন্ন জোটে না।

—কে বলেছে কথাটা ?

—লোকের মুখে কথাটা শুনেছিলেন সম্রাট। কিন্তু গতকাল সম্রাট নিজেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন। তাই আজ ভোরেই হুকুম হয়েছে ওঁকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য।

—সম্রাট প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন! কি প্রমাণ ? বিস্মিত হন বীরবল।

—বলছি। কিন্তু গতকাল আপনি কি সভায় যাননি ?

—না। শুধু গতকাল নয়, আমি পাঁচদিনের ছুটি নিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যেবেলা দেশ থেকে ফিরেছি। আজ অবশ্য যাব। কেন গতকাল কি কিছু অঘটন ঘটেছে ?—

—সব বলছি। এর পরেই হীরাচাঁদের দিকে তাকায় পেয়াদা, বলে : তোমার ভাগ্যটা ভাল বলেই মহামান্য বীরবলের দেখা পেয়ে গেলে।

—হ্যাঁ ভালই বটে! তাই বিনাদোষে কোতলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে বলে বণিক।

—বেশ! তুমিই বল কি ঘটেছে। হীরাচাঁদকে লক্ষ্য করে বলেন বীরবল।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করে বাদশাহ সবেমাত্র রসুইমহলের দিকে যাচ্ছি-

লেন ঠিক সেই সময় ফতিমা বেগমের বাঁদী এসে খবর দিল, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। সম্রাটকে একবার দর্শনের জন্য কান্নাকাটি করছেন।

খবরটা শোনামাত্র সম্রাট ফতিমা বেগমের মহলে চলে গেলেন। হাকিমকে ডেকে পাঠালেন। হাকিমসাহেব বেগমকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করলেন। তিনি সন্তানসম্ভবা। হাকিমসাহেব দাওয়াই দিলেন ঠিকই। কিন্তু বললেন—তার চেয়েও ভাল কাজ হবে সম্রাট যদি বেগমকে ফেলে সেদিনকার মত অন্য কোথাও না যান।

একদা এই বেগমই সম্রাটকে দিবারাত্র সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, সে কথা তিনি ভোলেননি। তাই খুব মন খারাপ করে সারাদিন বেগমের কাছে রইলেন আর আল্লার কাছে দোয়া ভিক্ষা করতে লাগলেন। সারাদিন তাঁর আর রাজসভায় যাওয়াই হল না। বেগমের চিন্তায় খাওয়ার কথাও তাঁর মনে আসেনি।

সন্ধ্যার পর তিনি সুস্থ হলে জোর করে ফতিমা বেগম সম্রাটকে বড়ি বেগমসাহেবার মহলে পাঠিয়ে দিলেন। কেননা তিনি ব্যতীত আর কেউ তাঁকে জোর করে খাওয়াতে পারবে না।

ফতিমা বেগমসাহেবার অনেক অনুরোধের পর সম্রাট বড়ি বেগমসাহেবার মহলে এলেন ঠিকই, কিন্তু সারাদিন খালিপেটে থাকার জন্য তাঁর পেটটা কেমন যেন মোচড় দিতে লাগল।

সম্রাটের সারাদিন খাওয়া হয়নি। তাই রসুইমহলে গিয়ে বড়ি বেগমসাহেবা নানারকম সুখাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। বেগমের অনুরোধে খেতে বসলেন তিনি। হঠাৎ কোথা থেকে একটা টিকটিকি পাতে পড়ল। দূর ছাই খাবই না আজ—বলে উঠে পড়লেন সম্রাট। অবশ্য তাঁর পেটও ব্যথা করছিল খুব। এসেই শয্যায় শুয়ে পড়লেন। বড়ি বেগম তাড়াতাড়ি হাকিমকে খবর দিলেন।

হাকিম এসে বললেন—না খেলে কোন ক্ষতি নেই। সম্রাটের প্রয়োজন ঘুমের। তিনি যন্ত্রণা কমার ও ঘুম আসার দাওয়াই দিলেন।

—কিন্তু উনি যে সকাল থেকে কিছুই খাননি?

—মানুষ একদিন না খেলে তার কোন ক্ষতি হয় না। বরং পেটটাকে মধ্যে মধ্যে আমাদের সকলেরই বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন।

চলে যান হাকিমসাহেব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যান সম্রাট।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল মিঞা তানসেনের গানে। কিন্তু তখন

সম্রাট দারুণ ক্ষুধা অনুভব করছেন। শয্যা ছেড়ে বাইরে এলেন তিনি। তারপরেই আমায় নির্দেশ দিলেন হীরাচাঁদকে ধরে আনবার জন্য। সম্রাট অবশ্য নিজেই আমায় সব খুলে বলেছেন। থামল পেয়াদা।

—আর কি বলেছেন? প্রশ্ন করেন বীরবল।

—বলেছেন হীরাচাঁদের মুখ দেখলে সত্যি অন্ন জোটে না। এই কথা-টার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবার পরে ওর মত ব্যক্তির আর স্থান নেই এ পৃথিবীতে। তাই সম্রাটের নির্দেশেই এসেছিলাম হীরাচাঁদকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু এমন কান্নাকাটি করছে ও যে সহ্য করতে পারছি না। সত্যি তো ওর মুখ দেখলে যে অন্ন জোটে না তার জন্য তো দায়ী ওর ভাগ্য। এর জন্য একেবারে কোতলের নির্দেশ দিয়ে দিলেন তিনি?

—ওর জন্য তোমার দুঃখ হচ্ছে? বীরবল প্রশ্ন করলেন পেয়াদাকে।

—তা হচ্ছে বৈকি। আজ আমার মুখ দেখে এরকম অঘটন কিছু ঘটলে হয়ত আমাকেও কোতল করাবেন। সম্রাট আমাদের চোখে ঈশ্বর কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে তাঁর খেয়ালীপনার অন্ত নেই। তাই অনেক চিন্তা করে আপনার কাছে নিয়ে এলাম। আপনি ভিন্ন আর কেউ রক্ষা করবার নেই একে।

—বুঝলাম। পেয়াদা, তুমি একটু তফাৎ যাও। আমি একে কয়েকটা কথা বলে দিতে চাই। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যেও।

—বহুত মেহেরবাণি আপনার। পেয়াদা সেলাম ঠুকে একটু সরে দাঁড়াল।

বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হল বণিককে।

—তোমার অন্তিম ইচ্ছা কী বল? প্রশ্ন করলেন পদস্থ একজন রাজ কর্মচারী।

—সম্রাটকে দর্শন।

—কি বলছ তুমি? সে হয় না।

—আমার অন্তিম ইচ্ছা এটাই।

—বুঝেছি কিছু বলতে চাও তাঁকে। কি বলতে চাও বল, আমরাই খবর পাঠিয়ে দেব তাঁকে।

—রাজদর্শনই আমার অন্তিম কামনা ভাই।

—কি মুস্কিলে পড়লাম!

—তাই আমার অন্তিম কামনা পূর্ণ করুন। নইলে আমার অন্তিম কামনা পূর্ণ না করার জন্য তোমাদের আত্মাও শান্তি পাবে না।

—আপনি সম্রাটকে খবর পাঠান। এবার কথা বলে জল্লাদ।

—সম্রাট রেগে যাবেন না? বললেন রাজকর্মচারী।

—একেই তো দিনের পর দিন মানুষের জান নিয়ে হাত কলঙ্কিত করছি। তারপর এর অন্তিম কামনা পূর্ণ না করে ফাঁসি কাঠে ঝোলালে বালবাচ্চার ওপর সেই অভিশাপ নেমে আসবে। সম্রাট মহানুভব। খবর পাঠালে নিশ্চয় তিনি আসবেন। কাতর অনুরোধ জানায় জল্লাদ।

—অগত্যা তাই করি। সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারী গিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন।

কি ব্যাপার! কেন তুমি আমার দর্শন চাও? ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এসে বণিকের সামনে দাঁড়ালেন সম্রাট।

—আপনি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, তাই আপনার কাছে একটা বিচার চাই জাঁহাপনা।

—বিচার! সময়ে?

—আজ্ঞে তা নাহলে মরেও আমার আত্মা শান্তি পাবে না। প্রেত হয়ে ঘুরে ঘুরে আপনাদের আরো সর্বনাশ করে ফেলব।

—আরো সর্বনাশ! কি বলছ ঠিক বুঝছি না তো?

—বাঃ! আমার মুখ দেখে উঠলে কারো সেদিন অন্ন জোটে না সেই অপরাধেই যখন ফাঁসি হচ্ছে তখন আমার অশান্ত প্রেতটাকে দর্শন করলে আপনাদের শুধু অন্ন নয় আরো অনেক কিছুই তো জুটবে না? তাই বিচারটা ঠিকমত হলে শান্তি নিয়ে মরতে পারব।

—বেশ বল কার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ?

—আপনার বিরুদ্ধে। নির্ভীক স্বর বণিকের।

—আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ! কি বলছ তুমি?

—ঠিকই বলছি জাহাঁপনা। আমার মুখ দর্শন করে উঠলে লোকের অন্ন জোটে না, এই অজুহাতে আমাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হচ্ছে, আপনি নিজেও গতকাল ভোরে আমার মুখ দেখে উঠে কি ফল পেলেন তাও অজানা নয়। কিন্তু আমি গতকাল সর্বপ্রথম কার মুখ দর্শন করি

জানেন ? আমার মুখ দেখে উঠলে লোকের খাওয়া হয় না, আর আপনার মুখ দেখে উঠলে মানুষকে ফাঁসির দড়ি গলায় বাঁধতে হয়।

—কি, কি বললে ! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ? রাগে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মুখখানা।

—মহানুভব সম্রাটের কাছে ন্যায় বিচারই চেয়েছি। শান্তকণ্ঠে বলে বণিক।

সমবেত জনতা কর্মচারীদের মধ্যে তখন গুঞ্জন আরম্ভ হয়ে গেছে।

—শিগ্‌গী বীরবলকে খবর পাঠাও।

—হাজির হুজুর। শুনলাম এ বধ্যভূমিতে কি যেন একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। তাই নিজেই উপস্থিত হলাম। বীরবল যেন প্রস্তুতই ছিলেন।

—এ লোকটার এত বড় স্পর্দ্ধা বলে কিনা আমার মুখ দেখে উঠে তাকে যখন মৃত্যুদণ্ড নিতে হচ্ছে তখন আমারও নাকি একই দণ্ড হওয়া দরকার। কেননা গতকাল সর্বপ্রথম ও নাকি আমারই মুখ দর্শন করেছিল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেন সম্রাট।

বীরবল সম্রাটের কথার উত্তর না দিয়ে মুখখানা কেমন যেন বেচারা বেচারা ভাব করে তাকিয়ে থাকেন।

—কি হল চুপ কেন ?

—ভাবছি লোকের মুখ চাপা দেব কেমন করে ?

—মানে ?

—মানে মন্দ সংবাদ বাতাসের আগে ভেসে যায় তো ? যখন পৃথিবীর লোক জানবে সম্রাটকে প্রথম দর্শন করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে হয়, তখন আপনার এই 'মহামতি সম্রাট' নামের সার্থকতা থাকবে কোথায় ? লোকের চোখে আজ আপনি ঈশ্বর। নিদ্রাভঙ্গের পর মানুষ ঈশ্বরকেই সর্বপ্রথম দর্শন করতে চায় যাতে সুখে দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে দর্শন করে যদি ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়…। নাঃ ! আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। ভীষণ চিন্তিত হয়ে চুপ করে গেলেন বীরবল।

এবার বাদশাহের চিন্তা করবার সময়। তিনি দু'মিনিট পায়চারি করলেন।—হ্যাঁ কথাটা মিথ্যা বলনি তোমরা। সত্যি আমারই ভুল হচ্ছিল। আমি সর্বসমক্ষে এই মৃত্যুদণ্ড রদ করলাম। চেঁচিয়ে কথা কয়টি বললেন সম্রাট।

—জয় সম্রাট আকবরের জয়। জয় মহামান্য বীরবলের জয়। হর্ষ-

ধ্বনি করে ওঠে বণিক। অনন্তা সুর মেলায় তার সঙ্গে।

—ওহে শোন! পরশু রাত্রে তোমাকে যখন আমার প্রাসাদে নিয়ে এলাম তখন মনে হচ্ছিল তুমি একেবারেই চালাক চতুর নও। কিন্তু আজ তোমাকে দারুণ বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে। এর কারণ কি বলতে পার?

বণিককে উদ্দেশ্য করে কথা কয়টি বললেন সম্রাট।

নতজানু হল বণিক সম্রাটের কাছে এসে। তারপর হেসে বলে: অবশ্যই পারি। যে রত্নটি না থাকলে আপনি দুনিয়া অন্ধকার দেখেন যে রত্নের জ্যোতির ছটা আপনার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে, যে রত্নটি এখনও আপনার পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন তিনিই আমার ত্রাণকর্তা, বুদ্ধিদাতা।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন আকবর।

—শুধু এর নয়, আমারও ত্রাণকর্তা তুমি। তা নাহলে সত্যি খেয়াল বশে মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলতে যাচ্ছিলাম। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন জানালেন সম্রাট বীরবলকে।

—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বেগমসাহেবা?

কুর্নিশ জানিয়ে বড়ি বেগমকে প্রশ্ন করেন বীরবল।

—খুব একটা জরুরী দরকারেই অসময়ে আহ্বান করেছি।

—হুকুম করুন বান্দাকে।

—দেখুন সম্রাটকে কে যেন অতি সুন্দর কামজের কাপড় উপহার দিয়েছেন। সম্রাট বলছেন ওটা দিয়ে আমারই কামিজ তৈরী হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে হবে না। তাই একজন ভালো দর্জির সন্ধান চাই। কেননা সেই মাপ নিয়ে বলতে পারবে ওইটুকু কাপড়ে হবে কিনা।

—ভালো দর্জির সন্ধান আছে ঠিকই, কিন্তু মুস্কিল হল এক ধরণের কারিগর আছে যাদের আপনি কিছুতেই বাগে আনতে পারবেন না। তারা আপনাকে ঠকাবেই ঠকাবে স্যাকরা, দর্জি প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। যত চোখই রাখুন এদের ওপর, এরা ঠকাবেই। শেষ পর্যন্ত দেখবেন আবার আপনাকে ওই কাপড় কিনতে হবে।

—দোকানে ঐ কাপড় পেলে তো ভালই হত। আমি ফতেপুর সিক্রি আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি অনেক জায়গার দোকানেই লোক পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু

কোন দোকানেই এই ধরণের কাপড় পাওয়া গেল না। এটা সম্ভবতঃ বাইরের মাল। তাই মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে।

—ওঃ! এই কথা?

—কি ব্যাপার কি নিয়ে তোমাদের আলোচনা? বলতে বলতে সম্রাট এসে বেগমের পাশে বসেন।

—সেই কামিজের কাপড়ের কথা বলছিলাম। বীরবল বলছেন দর্জি ঠকাবেই। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন সম্রাট।

—এটা ঠিক কথা নয়। এত অল্প কাপড় যে দর্জির সাধ্য নেই ঠকায়।

—বেশ পরীক্ষা হোক। গুলাব দর্জিকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ওর মত দর্জি এ তল্লাটে বিরল।

দূত নিয়ে এল গুলাবকে। বেগমসাহেবা চিকের আড়ালে গেলেন।

—এই রেশমের টুকরো দিয়ে বড়ি বেগমসাহেবার একটা ঢিলে কামিজ তৈরী করতে হবে, পারবে?

—আমাকে মাপটা দেখতে হবে হুজুর। এই বলে মাপ দেখার পর বলল, আমি পারব। এ কাপড়েই বেগমসাহেবার জন্য সুন্দর ঢিলে কামিজ করতে সক্ষম হব।

—জামাটা কিন্তু রাজপ্রাসাদে বসেই তৈরী করতে হবে। কাজ শেষ না করে এখান থেকে বার হতে পারবে না। খানাপিনা সব এখান থেকেই দেওয়া হবে। এবার কথা বললেন বাদশাহ।

—তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বেগমসাহেবার কামিজ তৈরী করতে যে কয়েকটা দিন সময় লাগবে, সে কয়দিন কি বাড়ী ছেড়ে থাকতে হবে?

—হ্যা হবে। একবারই বলে দিয়েছি কামিজ শেষ না করে রাজ-প্রাসাদ থেকে বার হবে না।

—জো হুকুম হুজুর। তবে কি কাল থেকে কাজে আসব?

—না আজই এক্ষুনি কাজে লেগে যাও। খেয়ালী সম্রাটের খেয়ালী নির্দেশ।

—এখনি?

—হ্যাঁ। তোমার বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। বীরবল, এবার তোমার যা করণীয় কর।

কুর্নিশ জানিয়ে গুলাব দর্জিকে নিয়ে প্রাসাদের একটি কক্ষে আসেন বীরবল। তৃ'জন বান্দাকে ডেকে ঘরের দরজায় বসিয়ে দেন।

এরপর কামিজ তৈরীর সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে উদ্যত হন।

—তোমরা কিন্তু একে একা ফেলে কিছুতেই যাবে না। রাত্রের জন্য আরো দুজন বান্দাকে নিযুক্ত করে যাচ্ছি। সাবধান। একে একা ফেলে যাবে না। আর যেদিন কামিজ তৈরী শেষ করে বাড়ী যাবে সেদিন ওর জামা-কাপড় খুলে দেখে নেবে কোথাও কোনও জামার টুকরো লুকানো আছে কিনা।

চুপি চুপি কথা কয়টি বলে বীরবল চলে যান।

—তুই কে রে? প্রশ্ন করে ফটকের প্রহরী।

—আমি গুলাব দর্জির ছেলে। চারদিন ধরে বাবা বাড়ী যাচ্ছে না, তাই খোঁজ নিতে এসেছি।

—যা ভেতরে ঢোক।

দশ বছরের ছেলে ফরিদ গুলাব দর্জির সেলাইঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

—এই কি চাস? প্রশ্ন করল বান্দা।

—দেখনা আব্বা চারদিন ধরে বাড়ীর বাইরে, আমাদের চিন্তা হয় না? ছেলের গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে এল গুলাব।

—কেন আমি যে এখানে বেগমসাহেবার কামিজ তৈরী করছি তা কি তোরা জানিস না?

—জানব না কেন? কিন্তু বলিহারী তোমার আক্কেল। ফেরো বাড়ী, দেখবে আম্মা কি করে?

—এই হতচ্ছাড়া! তোকে কে এখানে পাঠিয়েছে? বেরো বেরো। রেগে ওঠে গুলাব।

—তোমাকে না নিয়ে বার হব না। ভারী একটা কামিজ, তারজন্য একেবারে চারদিন সময়?

—দেখ হারামজাদা, এটা তোর বাড়ী নয়। এখানে গলাবাজি করবি না। মনে রাখিস এ তোর আম্মার জামা নয় যে দু'ঘন্টায় শেষ হয়ে যাবে। যা বাড়ী যা।

—দেখো আব্বা, সেই থেকে গালাগালি দিয়ে কথা বলছ আমায়। এর ফল ভাল হবে না।

—কি কি করবি, কোতল করবি?

—দরকার হলে তাই করব।

—শয়তান! বেরো বেরো। নইলে তোর আজ শেষদিন, নয় আমার।

বাপের রাগ দেখে ছেলে তফাতে গিয়ে ভেংচি কাটল। আর রাগ সামলাতে না পেরে গুলাব জুতো ছুঁড়ে মারল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে জুতোটা নিয়ে ছুট লাগাল।

এতক্ষণ দু'জন বান্দা বাপ ছেলের ঝগড়া দেখে হেসে কুটোপাটি হচ্ছিল। এখন ছেলে জুতো নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে তাদের আরো মজা লাগল।

—তোমরা হাসছ ভাই। এদিকে ছেলে আমার একপাটি জুতো নিয়ে চলে গেল যে। আমি কেমন করে বাড়ী যাব? যাওনা ভাই ওকে ধরে নিয়ে এস।

—না বাবা মহামান্য বীরবলের আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারব না।

—বেশ তো একজন অন্ততঃ গিয়ে ধরে নিয়ে এস।

—ও টাট্টু ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে পারব না। তুমি চিন্তা কর না তোমাকে রাগাবার জন্য জুতো নিয়েছে আবার নিজেই দিয়ে যাবে। বল্‌ল আরেকজন।

—হতচ্ছাড়া! দিল মনটা নষ্ট করে। আবার গুলাব কাজে মন দিল।

এদিকে ছেলে জুতোটা প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে ফেলে দিয়ে ফটক পার হয়ে বাইরে বার হয়ে গেল।

সন্ধ্যে নাগাদ জামা শেষ হয়ে গেল।

—আব্বা রাগ করেছে? এই নাও জুতো। ওকে দিয়ে দাও। বলে বান্দার হাতে জুতো দিয়ে চলে যায় ফরিদ।

—কি বলিনি ও নিজেই ফেরত দিয়ে যাবে? গুলাবকে তার জুতো ফিরিয়ে দিতে দিতে বলে বান্দা।

—মহামান্য বীরবল আপনি? অভিবাদন জানাল গুলাব।

—হ্যাঁ জানাতে এলাম তোমার তৈরী জামা পেয়ে বড়ি বেগমসাহেবা খুব খুশী হয়েছেন। তিনি বলেছেন জামার ছাঁটকাট আর সুন্দর কারু-কার্যের তুলনা নেই। তাই তোমার পারিশ্রমিকের অনেক বেশী টাকা দিয়েছেন।

—আপনাদের মেহেরবাণি। গদ্‌গদ্‌ হয় গুলাব। চলে যান বীরবল।

—কিন্তু এখনই তুমি বার হবে না। আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে তোমাকে একটু দেখতে চাই। বল্‌ল একজন বান্দা।

—আমাকে! কেন? অবাক হয় গুলাব।

—নির্দেশ আছে ভাই।

—তাহলে এস ভেতরে।

ঢুকে পড়ল দুজনে ঘরের ভেতর।

—কিছু তাহলে পেলে না? হাসতে হাসতে বলে গুলাব।

—রাগ করছ কেন? নির্দেশ ছিল তাই পালন করেছি।

—আদাব তাহলে।

—আদাব। চলে গেল গুলাব।

—আজ আপনাদের কাছে একজনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছি—আপনারাই তার বিচার করবেন।

সভার মধ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন আকবর।

—সেকি! সেকি! কার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ? কি অপরাধ করেছে সে? সভার মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল।

আকবর তাকালেন সকলের দিকে। তারপর বললেন—আমি সঙ্কল্প করেছি আর দাড়ি রাখব না। অবশ্য সিদ্ধান্ত বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই নিয়েছি।

—সেকি! দাড়ি রাখবেন না? ইসলাম ধর্ম অনুসারে দাড়ি না রাখলে যে পাপ হয়। বলেন আবুল ফজল।

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার নতুন ধর্ম দীন ইলাহির কথা। তা যদি বলেন তাহলে তো ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টির উপাসনা করা বৈধ নয়। অথচ আমি তো সকাল, সন্ধ্যা সূর্যের উপাসনা করি। তাহলে দাড়ি না রাখলে কি অপরাধ হয়?

আবুল ফজলের মুখ গম্ভীর হয়। আর কিছু বলেন না তিনি।

—আপনি কিছু বলবেন? মানসিংহের দিকে তাকালেন আকবর।

—জী। কুর্নিশ জানালেন মানসিংহ।—শাহজাদা সেলিম বলছিলেন প্রজারা খুব অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

—কেন?

—তিনি বলছিলেন সারা বিশ্বের মুসলমানদের মূলমন্ত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং হজরত মোহাম্মদ আল্লাহরই প্রেরিত পয়গম্বর। কিন্তু আপনি আপনার নতুন 'কালেমাহ' চালু করলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ'। এতে আপনার মুসলমান প্রজারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে।

—আমার কাছে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই সমান। কোনটা করলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হবে আর কোনটা না করলে মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হবে তা দেখার আমার দরকার নেই। আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে যা ভাল মনে করেছি তাই করেছি।

সভার আবহাওয়া কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

—দূর! এসেছিলাম এক মনোভাব নিয়ে আর কোথা থেকে চলে যাওয়া হল অন্য কথায়।

—এর জন্য আমিই দায়ী। কসুর মার্জনা করে দিন। বললেন আবুল ফজল।

—আমাকেও মার্জনা করে দিন। নতজানু হলেন মানসিংহ।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, যা বলছিলাম। একজনের বিরুদ্ধে আমার দারুণ অভিযোগ রয়েছে, সে আমার দাড়ি টেনেছে।

আবার দাড়ির প্রসঙ্গ! তবুও সকলে বলেন, কে কে? কার এই কাজ?

—আসামীর নাম এক্ষুণি বলছি। কিন্তু আপনারাই বলুন তার শাস্তির কি ব্যবস্থা করব?

—পাঁচশো ঘা বেত মারুন। বললেন একজন ওমরাহ।

—উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে তিনশোবার তার মুখে জুতো মারুন। বললেন আরেকজন।

—ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দিন শয়তানের গায়ে। উত্তেজিত হয়ে বলেন একজন মন্ত্রী।

এইভাবে অনেকেই অনেক পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেন। বীরবল কিন্তু চুপ। আকবর তাকালেন তাঁর দিকে।

—একি! বীরবল, তুমি চুপ কেন?

—আসামীর শাস্তির কথাই চিন্তা করছিলাম। গম্ভীর মুখে বলেন বীরবল।

—বল বল কি শাস্তি দেব তাকে? আগ্রহ প্রকাশ পায় সম্রাটের কণ্ঠে। সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে আবার আকবরের দিকে তাকালেন বীরবল।

—বলব? লজ্জাজড়িত স্বর তাঁর কণ্ঠে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বল। অস্থির হন সম্রাট।

—একটি সশব্দ চুমো।

—সেকি! সেকি! সকলে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

—এ তুমি কি বলছ বীরবল? বিস্ময়ের ভাব করেন সম্রাট।

—আপনার স্নেহের নাতির জন্য এর চেয়ে যোগ্য শাস্তি আর কি হতে পারে? নইলে একমাত্র দু তিন বছরের শিশু ছাড়া আর কার সাধ্য আপনার দাড়ি নিয়ে টানাটানি করে?

সম্রাট বীরবলের বুদ্ধি দেখে আনন্দে বিগলিত হয়ে গেলেন। সিংহাসন থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তারপর বললেন, পুরস্কারটা তবে তোমাকেই আগে দেওয়া যাক।

এই বলে তাঁর কপালের ওপর সশব্দে চুমো খেলেন তিনবার। সমস্ত সভা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কে বলবে একটু আগে এখানে অশান্তির মেঘ জমা হয়েছিল।

—আমরা দুজনেই হেরে গেলাম।

—কার কাছে?

—কেন বীরবলের কাছে।

—সে পরাজয় তো সব স্বীকার করে নিচ্ছি, এখন নতুন করে কি ঘটল তাই বল।

অপরাহ্নে বাগিচায় বসে কথা হচ্ছিল বড়ি বেগমসাহেবার ও সম্রাটের মধ্যে।

—শুনুন জাহাঁপনা, বীরবল একদিন বলেছিলেন একবর্ণের কারিগর আছে যারা জিনিস সরাবেই, কথাটা যে মিথ্যা নয় তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি।

—কি করে?

—আমার সেই সুন্দর কামিজের মত আরেকটা কামিজ আরেকজনকে পরতে দেখেছি।

—অসম্ভব। এ হতেই পারে না। মোট চারজন বান্দা নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা বীরবলের নির্দেশ মত ঠিকমত পাহারা দিয়েছে। দুজন বান্দাতো সর্বক্ষণই তার দিকে নজর রেখেছে। কামিজ শেষ হবার পর রীতিমত তার কাপড় জামা তল্লাসী করে তবে ছাড়া হয়েছে।

—জাহাপনা, আমার দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ নয়। গতকাল অপরাহ্নে পাল্কি করে যমুনার তীরে বেড়াতে যাবার পথে তাকে দেখেছি। বাঁদী লাইলিই সর্বপ্রথমে তাকে দেখতে পায়।

—তুমি কি করলে তখন?

—সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীকে পাঠালাম। সে তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়ে

জেনে নিল, গুলাব দর্জির বিবি সে।

—কি আশ্চর্য! কি করে এ সম্ভব হল? আমি এক্ষুণি গুলাব দর্জি ও তার বিবিকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

—সেটা কি ভাল হবে?

—তবে কি করতে বল?

—লাইলিকে ভোরবেলা যমুনার তীরে পাঠিয়েছিলাম তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য। গুলাববিবি নাকি প্রত্যহ যমুনার তীরে ভোরে আর সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে আসে। লাইলি চালাক মেয়ে।

—তা কিছু রহস্যের উদ্ঘাটন হল?

—হল বৈকি। বেশ ভাল ভাবেই হল।

এমন সময় কুর্নিশ জানিয়ে সামনে দাঁড়ালেন বীরবল।

—আমাকে ডেকেছেন বেগমসাহেবা?

—হ্যাঁ পরাজয় স্বীকার করবার জন্য। এত পাহারা সত্ত্বেও গুলাব দর্জি কিন্তু কামিজের কাপড় সরিয়ে নিজের বিবির জন্য একটা কামিজ বানিয়ে দিয়েছে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি, নিজের চোখে দেখলাম।

—কেমন করে এ সম্ভব হল?

—গুলাব আমাদের থেকে অনেক চালাক। তাই কাপড় পেয়েই সে কিছুটা কাপড় তার জুতোর মধ্যে রেখে দেয়। বাপের উপযুক্ত শিক্ষা বহুদিন আগেই ছেলে পেয়ে গেছে। তাই সে সকলের সামনে এমন ঝগড়া শুরু করে দিল যে গুলাব জুতো ছুঁড়ে মারল আর ছেলে জুতো নিয়ে চম্পট দিল। অবশ্য অনেক পরে কাপড়খানা বার করে আবার ছেলে তাকে জুতো ফেরত দিয়ে গেল। বাঁদী লাইলি সত্যি কাজের মেয়ে। গুলাবের বিবিকে হাত করে সব খবর সংগ্রহ করেছে।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন বীরবল। বললেন, এর পরেও মনের ভ্রান্ত ধারণাটা কি আর পুষে রাখবার ইচ্ছে আছে জনাব?

—এই শিক্ষা পাবার পরেও? পরাজয়ের ভঙ্গীতে বলেন সম্রাট।

সম্রাটের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন বেগমসাহেবা।

—এবার ফিরুন সম্রাট, নইলে রোদ উঠে যাবে।

—হ্যাঁ চল।

প্রাতঃভ্রমণে বার হয়েছিলেন সম্রাট এবং বীরবল। বীরবলের নির্দেশে এবার ফিরে চললেন প্রাসাদ অভিমুখে। এ সময় হেঁটেই মুক্তবায়ু সেবন করেন দু'জনে।

—আমি একটা কথা কয়দিন ধরে চিন্তা করছি।

—সেটা কি জাহাঁপনা?

—ভাবছিলাম এবার থেকে হিন্দু প্রজাদের বলব, তারা চিঠির ওপর যে লেখে 'শ্রীশ্রীরাম সহায়', সেটা না লিখে যেন আমার নাম লেখে। তোমার এ বিষয়ে কি মত?

—হঠাৎ এমন ইচ্ছে জাগল কেন?

—বাঃ। এদিকে তারা আমাকে জগদীশ্বর বলবে, আর ওদিকে চিঠির মাথায় থাকবে রামচন্দ্রের নাম?

—তা করতে পারেন, কিন্তু তার আগে যমুনার জলে একখণ্ড পাথর ফেলতে হবে আপনাকে।

—পাথর। কেন কিসের জন্য?

—আপনার নির্দেশে দেখবেন পাথরখানা জলে না ডুবে দিব্যি ভাসতে থাকবে।

অসন্তুষ্ট হলেন সম্রাট। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—এরকম মুর্খের মত কথা বল না বীরবল। হঠাৎ এ ধরণের কথা কেন আমায় বলছ? একটা ছোট শিশুও জানে জলের ওপর পাথর ভাসে না।

—আপনি জগতের সম্রাট, আপনার হুকুমে জলের ওপর পাথর ভাসতে বাধ্য। শান্ত কণ্ঠে বলেন বীরবল।

—মিথ্যে কথা! এ কোনদিনও, কোনকালেই হয়নি। রেগে উঠলেন সম্রাট।

—হয়েছে জাহাঁপনা। শ্রীরামচন্দ্রের আমলে তাঁর নাম স্মরণ করলে অসাধ্য সাধন হত। তাঁর আমলেই জলের ওপর পাথর ভেসেছিল। সেজন্য হিন্দুদের চোখে তিনি পরম দেবতা। আর সেজন্যই চিঠির মাথায় আজও হিন্দুরা পরম ভক্তিভরে তাঁর নাম লেখেন।

অসন্তুষ্ট হলেও আর কোন প্রতিবাদ করলেন না সম্রাট। অগ্রসর হতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা নেই দু'জনের। বীরবল মনে মনে হাসেন।

—শুনছ বীরবল ?

—বলুন জাহাঁপনা ?

—বড় গরম লাগছে, আমার এ ভারী জামাটা তুমি কাঁধে নেবে ?

—অবশ্যই নেব। আরো আগেই দিলে পারতেন ?

—ভারী জামা, তোমার কষ্ট হবে বলেই দেইনি।

—আপনার সেবার জন্যই তো আমরা রয়েছি। কাঁধে সম্রাটের জামা ফেলে পথ চলতে চলতে বলেন বীরবল।

আবার চুপচাপ চলেছেন দু'জনে। প্রাসাদের কাছাকাছি এলেন।

—এবার তো তুমি বাড়ী যাবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আকবরের নির্দেশে বান্দা এসে জামাটি বীরবলের কাঁধে থেকে নিয়ে নিল।

—খুব ভারী মনে হচ্ছিল জামাটা তাই না ? তা কতটা বোঝা হবে বলতো ? এতক্ষণে হেসে কথা কয়টি বল্‌লেন সম্রাট।

—তা একটা গাধার বোঝা হবে বৈকি। হাসি ফিরিয়ে দিতে দিতে বল্‌লেন বীরবল।

সম্রাট স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভালমানুষের মত মুখ করে তাঁকে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিলেন বীরবল।

—তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম। একমাত্র তুমি ছাড়া এ জিনিস কেউ সংগ্রহ করতে পারবে না।

কুর্নিশ জানালেন বীরবল। তারপর বললেন—হুকুম করুন জাহাঁপনা।

কয়েকদিন ধরেই বীরবলের প্রতি একটু অসন্তুষ্টভাবাপন্ন হয়েছিলেন সম্রাট। তাই তাঁকে জব্দ করবার কৌশল খুঁজছিলেন।

এই সময় তাঁকে ইন্ধন জোগাল লক্ষ্মণ পাণ্ডে নামে ধূর্ত একজন চিকিৎসক। বীরবলের ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটা ছিল। কেননা তার ধূর্তামি বেশ কয়েকবার বীরবল বানচাল করে দিয়েছেন। এখন সুযোগ পেয়ে বাদশাহের চোখে যাতে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হন তারই মতলব করল।

ধূর্ত চিকিৎসকের পরামর্শ মত সম্রাট বললেন—শোন, কয়েকদিন ধরে আমার শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে। তাই লক্ষ্মণ চিকিৎসক বলছে ষাঁড়ের

দুধ মিশিয়ে আমাকে ওষুধ খেতে। এক গেলাস দুধ হলেই চলবে। তাই তোমাকে কাল সকালে যেমন করে হোক এক গেলাস ষাঁড়ের দুধ দিতেই হবে। কি পারবে তো?

—ষাঁড় আর গাভীর তফাৎটা মনে হয় সম্রাটের অজানা নেই? বিনীতভাবে বললেন বীরবল।

—তা অজানা নেই ঠিকই, সেকথা বলেওছিলাম লক্ষ্মণকে। কিন্তু সে বলল—মহামান্য বীরবলের পক্ষেই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল বীরবলের কাছে। লক্ষ্মণ চিকিৎসক তো তার ওপর হাড়ে হাড়েই চটা। এদিকে সম্রাটও অসন্তুষ্ট। কাজেই ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা।

—পারবে তো আনতে?

—সম্রাটের হুকুম যখন তখন অবশ্যই পালন করব।

—শোন গোরু বা মোষের দুধ এনে ষাঁড়ের দুধ বলে চালাবার চেষ্টা করো না। তা যদি কর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করব তোমায়।

বীরবল বুঝতে পারেন সম্রাট বেশ ভালরকমই চটে আছেন তার ওপর তাই বলেন—ষাঁড়ের দুধ যখন বলেছেন, তখন তাই-ই আনব।

সভাভঙ্গের পর বীরবল এলেন বাড়ী।

—শুনছ, তোমার নাতি বড় হয়ে ঠিক তোমার মতই হবে। আদর করতে করতে নাতিকে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন সুনয়না।

বীরবল-কন্যা রঞ্জিতা শিশুপুত্রকে নিয়ে মাসখানেকের জন্য বাপের বাড়ী এসেছে। সে লক্ষ্য করল তার বাপুজী দারুণ অন্যমনস্ক। তাহলে কি আবার রাজদরবারে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে? মনে মনে চিন্তা করে রঞ্জিতা। তারপর বলে—

—বাপুজী! সত্যি করে বলতো আবার কি উদ্ভট সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হয়েছে তোমাকে?

—শুনে আর কি করবি? এ সমস্যার সমাধান আমরা কেউই করতে পারব না। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বীরবল।

—আহা! বলই না? বলা তো যায় না, কার মাথায় কি বুদ্ধি চট্‌ করে এসে যেতে পারে।

তখন বীরবল বললেন সব কথা। রঞ্জিতা গালে হাত দিল। আর সুনয়না নাতিকে বিছানায় শুইয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

—আঃ! কি হচ্ছে? আমি কি এখনই ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছি?

রেগে ওঠেন বীরবল।

—এখন খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যের পর আমরা বাপ বেটিতে চিন্তা করব। বলল রঞ্জিতা।

—হ্যাঁ কত তোমার বাপুজী সন্ধ্যের সময় বাড়ী থাকেন। সব সময় তো সম্রাটের কাছেই রয়েছেন। তোমার বাপুজীকে সকাল সন্ধ্যা না দেখলে তাঁর যে সাধ মেটে না।

সম্রাটের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ পায় সুনয়নার।

—ঠিক আছে আমাকেই চিন্তা করতে দাও। তবে আজ আর কিন্তু তোমার নাতিকে দেখতে পারব না। আগামীকাল সকালের আগে কোন ব্যাপারে ডাকবেও না। বলে রঞ্জিতা।

তারপর বীরবলের দিকে ফিরে বলে - নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার যা করণীয় কর। আমি থাকতে চিন্তা করো না। তোমার বেটি তো তোমার কাছ থেকেই সব শিক্ষা পেয়েছে?

—একি! নদীর পাড়ে এই গভীর রাত্রে কে কেমন করে সশব্দে কাপড় কাচছে আর বিকৃত সুরে গান গাইছে?

চমকে বিছানার ওপর উঠে বসলেন সম্রাট। পাশে শুয়েছিলেন নুরুন্নিসা বেগম। ভয়ে তিনি সম্রাটকে জড়িয়ে ধরলেন।

...এদিকে বিকৃত সুরে গান আর ওদিকে বিকট কাপড় কাচার আওয়াজ। জেগে উঠল রাজপ্রাসাদের সকলে।

প্রচণ্ড রেগে উঠলেন সম্রাট। তক্ষুণি তাঁর নির্দেশে পাহারওয়ালা দু'জন নদীর ধারে ছুটে গেল।

চাঁদের আলোয় ভরে গেছে চারদিক। তার মধ্যে নদীর তীরে বসে একটি সুশ্রী মেয়ে কাপড় কাচছে। পাশে রয়েছে একটি বিরাট বোঁচকা।

—কে তুমি? ওখানে কি করছ? প্রশ্ন করে একজন পাহারাওয়ালা।

—কেন তোমার কি চোখ নেই? চাঁদের আলোয় আমাকে দেখে বুঝছ না আমি একটি মেয়েছেলে, ময়লা কাপড় চোপড় পরিষ্কার করছি।

—এই কি তোমার কাপড় কাচার সময়? প্রশ্ন করে আরেকজন।

—কি করব? যখন সময় পাব তখন কাচব তো?

—এই গভীর রাতে এই রকম বিশ্রীভাবে গান করে আর সশব্দে কাপড় কেচে কেন মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত করছ ?

—এই ! একটা অবলা মেয়েছেলের ওপর দুজন পুরুষমানুষ হামলা করছ, লজ্জা করছে না তোমাদের ?

—তুমি হামলা করাতে বাধ্য করছ তাই করছি। এটা কি গান গেয়ে কাপড় কাচার সময় ? বলল একজন।

—দেখতে তো মনে হচ্ছে বেশ সুন্দরী, কিন্তু গানের গলাটা এত বিশ্রী কেন ? বল্‌ল আরেকজন।

—তোর তাতে কি রে মিন্‌সে ? তোকে এ সমালোচনা করবার অধিকার কে দিয়েছে ? রেগে চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটি।

—তোমাকে এত রাতে কাপড় আমরা কিছুতেই কাচতে দেব না। আর যদি একান্তই কাচতে হয় তবে মানুষের যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

—ওরে, কে রে তোরা আমাকে হুকুম করছিস ? আমাকে চিনিস না ? জানিস কাপড়ের বদলে হয়ত তোদেরই আছড়িয়ে ফেলতে পারি ? ভাল চাস তো জান নিয়ে কেটে পড়। এই বলে আবার বিকৃত স্বরে গান ধরে কাপড় আছড়ে কাচতে থাকে।

—এতো আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল ! বল্‌ল একজন।

—এই ! তোমাকে সম্রাটের কাছে যেতে হবে। বল্‌ল অপরজন।

—কেন ? ভ্রূ কুঁচকে যায় মেয়েটির।

—আমরা তাঁর হুকুমের চাকর। তিনি যা বারণ করেছেন সেইটে যদি কর তবে তোমার তো শাস্তি হবেই, আর আমাদেরও তিনি চাকরীর অনুপযুক্ত মনে করে পদচ্যুত করে দেবেন। তবে যে না খেয়ে থাকতে হবে আমাদের। বল্‌ল প্রথম জন।

কিন্তু আর যেতে হল না সম্রাটের কাছে। দেখা গেল কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে তিনি নিজেই আসছেন।

—সর্বনাশ ! সম্রাট খুব রেগে গেছেন মনে হচ্ছে ? বল্‌ল প্রথম প্রহরী।

—মনে হয় মেয়েটিকে বন্দী করতে আসছেন। কেন মিথ্যে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলে ? বল্‌ল অপরজন।

সম্রাট এলেন। এসে সব শুনলেন প্রহরীদের কাছে। তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—এই মেয়ে ! কে তুমি ?

সম্রাটকে দেখেই সে মাথার কাপড় অনেকটা টেনে দিয়েছিল। এখন

ঘোমটার অন্তরাল থেকেই উত্তর দিল—আমি আমার বাপের মেয়ে।

—কে তোমার বাবা? রেগে ওঠেন সম্রাট।

—আমার মায়ের স্বামী। নির্ভীক স্বর মেয়েটির কণ্ঠে।

—তুমি দেখছি কোন কথার সোজাসুজি উত্তর দেবে না। এক্ষুণি তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। এবার মেয়েটি উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠল।

—এই মেয়ে কাঁদছ কেন? কি হয়েছে, বলবে তো? অস্থির হয়ে ওঠেন সম্রাট। সকলে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে তার পানে।

—হুজুর! আবার হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে মেয়েটি।

—দেখো, আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। কেন এত রাত্রে এরকম বিকৃত স্বরে গান গেয়ে লোকের অসুবিধা করছ তার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে তোমায়। তা নয়তো রক্ষা নেই।

—শুনুন জাহাঁপনা, গান জিনিসটা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা। আর ছোট-বেলা থেকে আমার এমন বদ্ অভ্যাস যে কাপড় কাচার সময় গান না গাইলে ভাল কাচা হয় না। কিন্তু এদিকে ভগবান সে প্রতিভা থেকে আমায় বঞ্চিত করেছেন। এর জন্য আমার দোষ কোথায়?

—গলা তোমার মিষ্টি, কিন্তু অত চেঁচিয়ে আর বেসুরো করে গাও কেন?

—ওই রকম করেই তো বরাবর গাই। এ অভ্যাস ছাড়ব কেমন করে?

—বেশ মানলাম। কিন্তু এই গভীর রাতে কাপড় কাচতে এসেছ কেন?

—এত রাতে আসা ছাড়া উপায় ছিলনা।

—কেন?

—সে কথা আপনাকে বলা যাবে না। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলে সে।

—বলতেই হবে।

—সেসব কথা আপনার শোনার নয়। আমি মেয়ে হয়ে কি করে সে লজ্জার কথা বলি?

—তোমার কোন কথা বুঝতে পারছি না। তোমার মা কি আজ কোন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন? তা এজন্য লজ্জা পাবার কি আছে?

—না না মা'র ব্যাপার হলে তো লজ্জার কোন কারণই ছিল না।

—তবে! তবে কার ব্যাপার? আবার অধৈর্য হন সম্রাট।

—আমার বাবার। লজ্জায় ঝুঁকে পড়ে মেয়ে।

—কি বলছ তুমি?

—জাহাঁপনা, সত্যি, ব্যাপারটা বড় লজ্জার। আমার বাবা আজ দুপুরে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। সারাদিন এত ব্যস্ত ছিলাম বলার নয়।

তাঁর তো আর বাড়তি জামা নেই, তাই ছেঁড়া চাদর দিয়ে সমস্ত শরীরটা ঢেকে দিয়ে এগুলো কাচতে নিয়ে এলাম।

—এই মেয়ে! তুমি জান আমি কে? তোমার স্পর্ধাতো কম নয় যে তুমি আমার সঙ্গে মস্করা করতে আস? পুরুষমানুষ সন্তান প্রসব করেছে এ কথা কে কবে শুনেছে?

—সত্যি, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু আমাদের শহরে আজকাল এ ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।

—মানে! খুলে বলতো ব্যাপারটা!

—মানে হল ষাঁড়ের দুধ পাওয়া যায়, বলদ বাছুরের জন্ম দেয় এই রকম আর কি...।

—এসব কি বলছ? কবে কোথায় এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে?

—নিশ্চয় ঘটেছে। তা নয়তো বিশ্ববরেণ্য সম্রাট যেখানে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর ওষুধ সেবনের জন্য ষাঁড়ের দুধের প্রয়োজন, সেখানে তিনি তো আর না জেনে পাগলের মত কথা বলেননি? ওঁার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তিতো আর বিবেচনা না করে কিছু বলেন না!

আকবর স্তম্ভিত হয়ে অবগুণ্ঠনবতীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর সে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

—শোন, তুমি কি বীরবলের আত্মীয়া? এতক্ষণে সুর নরম হয় সম্রাটের।

—জী। আমি তাঁর কন্যা। এবার উঠে এসে কুর্নিশ জানায় সে। মুখখানা প্রসন্নতায় ভরে যায় সম্রাটের। বলেন—তোমার বাবাকে বল গিয়ে, তোমার মারফৎ তিনি যে ষাঁড়ের দুধ পাঠালেন তা আমি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আগামীকাল সভায় আসতে পারেন। তুমি শুধু বীরবলের নয় আমারও বেটি। তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আমাদের দেশের গৌরব। এবার তুমি বাড়ী যাও। এই বলে গলার মুক্তোর মালাটি খুলে উপহার দেন তাকে।

—প্রহরী, পাল্কি নিয়ে এস। এক্ষুণি একে সসম্মানে বাড়ী পৌঁছে দাও। নির্দেশ দেন সম্রাট।

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী কুর্নিশ জানিয়ে পাল্কির ব্যবস্থা করতে চলে যায়।

—আমি কিন্তু শুধু হাতে বাড়ী যাব না। বলে রঞ্জিতা।

—মানে?

—মানে আপনি যে ষাঁড়ের দুধ পেলেন তার একটা রসিদ দিতে হবে। আমার বাপুজী সেটা নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মণ চিকিৎসকের হাতে দেবেন।

প্রথমটা বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন সম্রাট। তারপর হাঃ হাঃ করে প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। হেসে উঠলেন অন্যান্য মন্ত্রীরা।

—সাবাস বেটি! বুদ্ধিমত্তায় তুমি যে তোমার বাবাকেও অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছ! এক্ষুণি তোমার কথা মত রসিদের ব্যবস্থা করছি। ওই যে পাল্কি আসছে তুমি উঠে বস। সস্নেহে কথা কয়টি বলেন সম্রাট।

আনন্দে বার বার সম্রাটকে কুর্নিশ জানায় বীরবল কন্যা রঞ্জিতা।

—বীরবল আমাকে বাঁচাও ভাই। একমাত্র তুমিই পার আমাকে রক্ষা করতে। গভীর রাতে পোঁটলাপুঁটলি সহ লক্ষ্মণ কবিরাজকে তাঁর বাড়ী আসতে দেখে বীরবল অবাক।

—কেন কি হয়েছে? গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন বীরবল।

—ভাই, একবার তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেও আমার মনের শয়তানটার শিক্ষা হয়নি, আজ আবার সে সম্রাটকে উসকানি দিতে গিয়েছিল। কিন্তু তার জানা ছিল না, এবার আর সম্রাটকে বাগে আনা এত সহজ নয়। তার ফল হাতে হাতে পেয়েছি। সম্রাট আমাকে কাল ভোরের মধ্যেই তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে যেতে বলেছেন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কবিরাজী করেই আমার দিন চলে। দেশে আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা রয়েছে। এখানে আমি প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসার জন্য কত লোক আসে আমার কাছে। অন্য কোথাও চলে গেলে কে চিনবে আমায়?

—বুঝলাম। আপাদমস্তক তাকে নিরীক্ষণ করলেন বীরবল।

—বাঃ চমৎকার! আমার প্রতি বিরাগ-ভাজন করতে গেলে সম্রাটকে, অথচ শাস্তি পাবার পর আবার আমারই দ্বারস্থ হলে? মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলেন বীরবল।

—জানি আমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য, তবু জানি এই ক্ষমাই মানব জীবনের পরম ধর্ম। তাই বড় আশা নিয়ে এসেছি। আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়, আমার প্রতি কৃপা কর।

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে লক্ষ্মণ চিকিৎসক।

—শোন, এত রাতে এমন করে কেঁদ না। আগে বল এবার সম্রাটকে আমার বিরুদ্ধে কি উসকানি দিতে গিয়েছিলে?

একটু ইতস্ততঃ করে লক্ষ্মণ। তারপর বলে, সম্রাটকে বলেছিলাম প্রতিদিন সকালে একটা করে যদি ঘোড়ার ডিম খেতে পারেন তবে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন। আরো বলেছিলাম, এই ঘোড়ার ডিম বীরবলই আনতে

পারবে। তখন সম্রাট বলেছিলেন, যদি না আনতে পারে কি শাস্তি দেব তাকে বলতো? প্রশ্ন শুনে খুব খুশী হয়ে বলেছিলাম, স্রেফ শূলে চড়িয়ে দেবেন। এই কথা শোনার পর রাগে লাফ দিয়ে উঠলেন সম্রাট। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন আর বলে দিলেন, আমার মুখ দেখতে চান না তিনি। তাই কাল ভোরেই যেন রাজ্য ছেড়ে চলে যাই।

—আপাততঃ আমার বাড়ীতে থাক কয়েকদিন তারপর দেখা যাবে।

—তোমার বাড়ীতে! এ কথা লোক মারফৎ যদি জানাজানি হয়ে যায়?

—হবে না। আমি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ীর ভেতরকার কথা বাইরে ছড়াবে না। তবে এই এক মাস তুমি বাড়ী থেকে একদম বার হবে না। এমন কি আমার বাড়ীর সামনের বাগানেও যাবে না। তারপর সুযোগমত আমি শিখিয়ে দেব কি করতে হবে।

—ভাই, তোমার ওপর একদিন আমার প্রচণ্ড রাগ ছিল। খালি সুযোগ খুঁজতাম কি করে এ দুনিয়া থেকে তোমাকে সরানো যায়। আর আজ অনুশোচনায় মনটা পুড়ে যাচ্ছে। সম্রাটের নির্দেশ পাবার পর দেখা করলাম কয়েকজন মন্ত্রী ও আমীর ওমরাহের সঙ্গে, দেখা করলাম তোমার অন্যান্য শত্রুদের সঙ্গে কিন্তু স্থান দেওয়া তো দূরে থাক, কোন পরামর্শই তো দিলেন না কেউ। কেউ কেউ তো দেখাই করলেন না। শুধু মহামান্য আবুল ফজল ফিরিয়ে দিলেন না। এত রাত্রেও তিনি মন দিয়ে শুনলেন সব কথা। তারপর বললেন, মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু খাওয়া হয়নি? কথাটা যে মিথ্যে নয় সে কথা স্বীকার করলাম। তিনি নিজেই তখন আমার জন্য থালা ভরে মেঠাই নিয়ে এলেন। সামনে বসিয়ে জোর করে খাওয়ালেন, তারপর বললেন, এই চরম বিপদ থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র রসিক-রাজ বীরবল। যদিও তাঁকেই কোতলের ব্যবস্থা করেছিলেন আপনি। ভোরের আলো ফুটে গেলে সম্রাটের নির্দেশে তোমাকে রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। তোমার নিজের গ্রামে ফিরে গেলেও রেহাই পাবে না। সম্রাট সেখানেও লোক পাঠাবেন। কাজেই একমাত্র ত্রাণকর্তা ওই বীরবলই।

— বুঝলাম। রাত শেষ হতে বড় বাকী নেই। কাজেই আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। তোমার শয্যাও প্রস্তুত। মাথা গরম না করে ঘুমোবার চেষ্টা কর।

কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন বীরবল।

কুর্নিশ জানিয়ে কয়েকজন লোক দাঁড়াল মঞ্চের কাছে।

— কি ব্যাপার ! কার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে এসেছ ?

—ঠিক নালিশ নয় হুজুর। বল্‌ল একজন।

—তবে ? কৌতূহলী হন সম্রাট।

—হুজুর ! ভোরবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একদলা থুথু পড়ল আমার মাথার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখি রাস্তার পাশে যে জামরুল গাছটা আছে সেখানে ডালে কে যেন বসে রয়েছে। আমি তখন রেগে তাকে গালাগালি করলাম। সে কাতরকণ্ঠে বল্‌লে—ওরে জগা ! আমাকে গালি দিস না বাপ। আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। গলা শুনে বুঝতে পারছি তুই জগা। আমি তখন বিস্মিত হয়ে তাকালাম লোকটির দিকে। দেখি তিনি আর কেউ নন স্বয়ং লক্ষ্মণ কবিরাজ।

—লক্ষ্মণ কবিরাজ ! সে ওখানে কিসের জন্য ? আমি না তাকে আমার রাজ্য ছেড়ে যেতে বলেছি ? রেগে উঠলেন সম্রাট।

—আজ্ঞে রাজ্য ছেড়েই চলে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দু'দিন ধরে চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। তাই হাঁটতে হাঁটতে আবার এখানেই ফিরে এসেছেন। বল্‌ল লোকটি।

—তা তোমার সঙ্গের লোকেরা কি বলতে চায় ? প্রশ্ন করলেন সম্রাট।

—আজ্ঞে সকলেই দেখেছে অন্ধ কবিরাজকে গাছের ডালে বসে থাকতে। তাই সকলের ভয় কোন সময়ে হাত ফস্‌কে অত উঁচু থেকে পড়ে যান তিনি।

—ওর মত ব্যক্তির ওভাবে মৃত্যুই উপযুক্ত শাস্তি! তবুও আমার প্রশ্ন ও গাছের ডালে উঠে বসে আছ কেন ?

—জানি না হুজুর। কতবার জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর দেননা। শুধু কাঁদেন।

—আজ্ঞে হুজুর, কথাটা একেবারেই সত্য। বল্‌ল বাকী চারজন।

—হুজুর ! আবার ভয়ে ভয়ে সম্বোধন জানাল প্রথম ব্যক্তিটি।

—বল।

—হাত ফসকে তো মরতেই পারে। আবার না খেয়ে খেয়েও মৃত্যু হতে পারে। আপনি আমাদের চোখে ঈশ্বর, আপনার রাজ্যে এরকমটি ঘটবে ?

—বটে ! মনে হচ্ছে তুমি লক্ষ্মণ কবিরাজের কেউ ?

—আজ্ঞে না। অনেক সময়ে অসুখে বিসুখে তাঁর কাছে এসে ওষুধ নিয়েছি। মানুষটা খুব অর্থ পিশাচ। ঠিকমত ওষুধের দাম দিতে না পারলে ঘরের থালা বাটি পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। কিন্তু আজ তাঁর অবস্থা দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাই এলাম আপনার কাছে।

—বেশ আমি নিজেই দেখতে চাই ব্যাপারটা। মানসিংহ ও বীরবলকে সঙ্গে নিচ্ছি। তালি বাজালেন আকবর। সঙ্গে সঙ্গে বান্দা হাজির হয়ে কুর্নিশ জানায়।

—ঘোড়া প্রস্তুত কর।

—জো হুকুম। কুর্নিশ জানিয়ে চলে যায় সে।

—লক্ষ্মণ, আমি জানতে চাই কোন স্পর্ধায় তুমি এখনও আমার রাজ্যে বাস করছ?

—হুজুর আমি তো আপনার নির্দেশ পাবার পর রাজধানী ছেড়ে চলেই গিয়েছিলাম।

—কিন্তু আমি তো শুধু রাজধানীর কথা বলিনি, বলেছি আমার রাজ্য ছেড়েই চলে যেতে হবে তোমাকে।

—জী তাইতো যাচ্ছিলাম। কিন্তু দু'দিন ধরে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তাই ভুল করে আবার রাজধানীতেই ফিরে এসেছি। এটা আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়।

—বুঝলাম, কিন্তু এতদিনের মধ্যে তো আমার রাজ্যের সীমানা পার হওয়া তোমার উচিত ছিল?

—তা উচিত ছিল, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়াতেই সে কাজ হল না।

—তাও মানলাম, কিন্তু তুমি গাছের ডালে উঠে বসে আছ কেন? দৃষ্টি-শক্তি ছাড়া উঠলেই বা কেমন করে?

—আমি নিজে উঠিনি। আমার মুখে সব কথা শুনে একজন পথিক আমাকে এই গাছের ডালে বসিয়ে দিয়েছেন। কেন না ভূমিতে আমাকে দর্শন করলেই আপনি কোতলের নির্দেশ দিতেন।

—কিন্তু কতদিন গাছের ডালে বসে দিন কাটবে তোমার?

—যে পর্যন্ত না শূণ্যলোকে যেতে পারি। কেন না পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব; পা দেব কোনখানে? কাঁদতে কাঁদতে বলে লক্ষ্মণ।

—তা তোমাকে যদি মার্জনা করে দেই, তবে পারবে কি সকলের সামনে বীরবলের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে? যদি তাই কর, তবে শুধু রাজধানীতে বাস নয়, পূর্ব প্রতিষ্ঠায় ফিরে যেতে পারবে তুমি।

—এক্ষুণি আমি মহামান্য বীরবলের পায়ে পড়ছি। বলে লাফ দিয়ে গাছ থেকে পড়ে বীরবলের পায়ে পড়ে।

সকলে বিস্মিত হয়ে তাকান তার দিকে।

—একি, তুমি না অন্ধ হয়ে গেছ? তবে এমন লাফ দিয়ে বীরবলের পায়ে পড়লে কেমন করে? সন্দিগ্ধ হন সম্রাট।

—কসুর মার্জনা করে দিন জাহাঁপনা। এটুকু অভিনয় না করলে আপনি শীতল হতেন না। এবার সম্রাটের পায়ে পড়ে সে।

সম্রাট বীরবলের দিকে তাকালেন।

—ব্যাপারটার মধ্যে যেন বীরবলী বীরবলী গন্ধ পাচ্ছি। ওহে! সত্য করে বলতো, কে এই কৌশলটি শিখিয়েছে?

—মিথ্যে বলব না। হুজুর, এ কৌশলটির মধ্যে যাঁর বুদ্ধির ছোঁয়া রয়েছে তিনি আপনার প্রিয় পরামর্শদাতা বীরবল। এই একমাস তিনিই আশ্রয় দিয়েছেন আমায়। তিনি স্থান না দিলে আমার ভবিষ্যৎ যে কি হত ভাবতেও পারছি না।

—ও সেই জন্যই এত সহজে বীরবলের পায়ে গিয়ে পড়েছিলে?

—পারলাম আর কই। তিনি ত দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

—তোমার আমার বয়সের ব্যবধানটা ভুল না। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলেন বীরবল।

—কিন্তু বীরবল এটা মোটেই তোমার ঠিক কাজ হয়নি। আমি যখন এক-জনকে সাজা দিয়েছি, তখন তোমার কোন অধিকার নেই তাকে আশ্রয় দেওয়ার। অসন্তোষ প্রকাশ পায় সম্রাটের কণ্ঠে।

—সেজন্য যে কোন শাস্তি মাথায় তুলে নিতে রাজী। বলেন বীরবল।

—এত সহজে কথা কয়টি বলতে পারছ, কারণ তোমার ধারণা কোন শাস্তি দিতে পারি না তোমায়, তাই না?

—কেন দেবেন না? যদি আপনার বিবেচনায় মনে হয় শাস্তি আমার প্রাপ্য অবশ্যই দেবেন। হাসতে হাসতে বলেন বীরবল।

হঠাৎ চট্ করে রেগে ওঠেন সম্রাট। বলেন—বেশ! এই মুহূর্তে তুমি রাজধানী ছেড়ে চলে যাও। তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না। বিস্মিত হয়ে যান সকলে। বিস্মিত হন স্বয়ং বীরবল তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে আসেন সম্রাটের কাছে।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য। এক্ষুণি আমি রাজধানী থেকে চলে যাচ্ছি। শুধু আমার বাড়ীতে একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন।

কুর্নিশ জানিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন বীরবল।

—মানসিংহ। ডাকলেন আকবর।

কুর্নিশ জানালেন তিনি।

—আপনি দু'জন সৈন্যকে নিয়ে ওর পেছনে অনুসরণ করুন। ফতেপুর সিক্রি, দিল্লী ও আগ্রার ধারে কাছে ও যেন থাকতে না পারে।

—জো হুকুম। সম্রাটের নির্দেশমত দু'জন সৈন্যকে নিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন মানসিংহ।

বীরবলের পেছু পেছু তিনটি ঘোড়া চারিদিক ধূলিময় করে ছুটে চল্‌ল। বিস্মিত জনতা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু কারো সাহস হয় না এ বিষয়ে কোন কথা বলতে। সম্রাট সগর্বে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে প্রাসাদ অভিমুখে রওনা হন।

—অপরাধ নেবেন না জাহাঁপনা। শুনলাম, আজকাল আপনি নাকি একদম হাসতে ভুলে গেছেন? খাওয়া দাওয়া তো সেরকম করছেন না, চোখে ঘুমও নেই, এরকম করলে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বেন।

বড়ি বেগমসাহেবার কথায় সম্রাট তাকালেন তার দিকে। দু'চোখ জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

—আপনি কাঁদছেন সম্রাট?

—হাঁা বেগম। আর আমি বীরবলকে ছেড়ে থাকতে পারছি না। দেখতে দেখতে ছয়টি মাস কেটে গেল! এর মধ্যে আমার রাজ্যের সর্বত্র তার খোঁজ করেছি, লোককে পুরস্কারের কথাও বলেছি, কিন্তু কেউ পারল না আমার বীরবলের সংবাদ আনতে। দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন সম্রাট। বেদনায় বিধুর হয়ে গেল বড়ি বেগমসাহেবার সুন্দর মুখখানি।

—ওঁর বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে খবরাখবর নিচ্ছেন তো?

—নিজে যাচ্ছি বেগম। কিন্তু প্রতিবারই হতাশ হয়ে ফিরে আসছি। তারা কেউ কোন সংবাদ দিতে পারছে না।

—বেগমসাহেবা! বীরবল কন্যা এসেছেন। তিনি আপনার দর্শন চান। বাঁদী কুর্নিশ জানিয়ে কথা কয়টি বলে।

—বীরবল কন্যা!! আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন দু'জনে।

—এক্ষুণি নিয়ে এস তাকে। বলেন বেগমসাহেবা।

—সম্রাট! এবার কিন্তু আপনাকে চিকের আড়ালে যেতে হবে।

—আমাকে! কেন?

—ও নিশ্চয় আপনার সম্মুখে কিছু বলতে চায় না।

—ঠিক ঠিক। সম্রাট তক্ষুণি চিকের আড়ালে চলে গেলেন। বাঁদীর সঙ্গে সুশ্রী রঞ্জিতা এল। বেগমকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁর নির্দেশমত

মখমলের গালিচাতে বসল।

—ফিরোজা! শিরী সরবত আর মেঠাই নিয়ে আয়।

কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেল বাঁদী।

—বল বেটি, কি সংবাদ তোমার বাপুজীর?

—এখনও কোন সংবাদ পাইনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঞ্জিতা।

—ও! পাওনি? আমি ভেবেছিলাম তাঁর সংবাদ জানাতেই বুঝি এসেছ? হতাশা প্রকাশ পায় বেগমের কণ্ঠে।

—খবর পাইনি ঠিকই। কিন্তু একটা ব্যাপারে এসেছিলাম।

—বল বল নিঃসঙ্কোচে।

—অপরাধ নেবেন না তো?

—একেবারেই নয়। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। স্বয়ং সম্রাটও তোমাকে খুব স্নেহ করেন।

—সেটা জানি বলেই আপনার কাছে এলাম একটা পরামর্শ দেবার জন্য।

—বল বল কি পরামর্শ? আবার উৎসাহ প্রকাশ পায় বেগমের কণ্ঠে।

—বলছিলাম, স্বয়ং সম্রাটকে ঘোষণা করে দিতে হবে—তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন নগর ও গ্রামের প্রধানদের এখানে সমবেত হতে হবে। কিন্তু রাজপ্রাসাদের আধমাইল আগে থেকে প্রত্যেককে এমনভাবে পায়ে হেঁটে আসতে হবে, যাতে তার অর্ধেক শরীর থাকে রোদে, অর্ধেক ছায়ায়।

—সেকি। সেটা সম্ভব হবে কি করে?

—হবে বেগমসাহেবা। আমার বাপুজীর মাথা থেকে ঠিক বুদ্ধি বার হবে।

—বাপুজীর মাথা থেকে! তাঁকে পাব কেমন করে? তুমি যে বললে নগর আর গ্রামের প্রধানেরাই শুধু আসবে?

এমন সময় বাঁদী রূপার থালায় মেঠাই আর সাদা পাথরের গ্লাসে সরবত নিয়ে আসে।

—খাও বেটি খাও।

বেগমের ইঙ্গিতে কুর্নিশ জানিয়ে চলে যায় বাঁদী।

—হ্যাঁ খাচ্ছি। আগে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেই আপনাকে। স্মিত হাসি হাসে রঞ্জিতা।

—শুনুন, সম্রাটের এই নির্দেশে সকলে ঘাবড়ে গেলেও একমাত্র ঘাবড়াবেন না সেই নগর বা গ্রামের প্রতিনিধি, যেখানে আমার বাপুজী আছেন। তিনিই উপযুক্ত বুদ্ধি দিয়ে দেবেন।

—সাবাস্ বেটি। এবার আর অন্তরালে থাকতে পারলেন না সম্রাট।

—খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছ। আমি ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বেগমের মুখ।

—বেটি, কি বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব ভাবতে পারছি না।

—স্বয়ং সম্রাট বলেছেন আমি শুধু বীরবল কন্যা নই, আমি আপনাদের সকলের কন্যা।

—সত্যি তাই! আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরলেন বেগমসাহেবা।

—আমি আসছি। তুমি তোমার বেটিকে আদর করছ, কিন্তু খাবার-গুলো কি এভাবেই সামনে পড়ে থাকবে? বললেন সম্রাট।

—সত্যি তো? লজ্জা পেয়ে তাকে খাওয়াতে বসলেন বেগমসাহেবা। সেদিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল চিত্তে বার হয়ে গেলেন সম্রাট।

নির্দিষ্ট দিনে মধ্যাহ্নে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং সম্রাট এবং আরো বিশিষ্ট- কয়েকজন মন্ত্রী। প্রচুর ব্যক্তি আসছে, বেশীরভাগ লোকের মাথায় ছাতা, কেউ বা বস্তা মাথায় দিয়ে আসছে। সম্রাট নির্দেশ দিয়েছেন এমনভাবে আসতে হবে যাতে শরীরের অর্ধেক থাকে রোদে, বাকী অর্ধেক ছায়ায়। কাউকে দেখেই সম্রাট সন্তুষ্ট হলেন না। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল একটি লোক খাটিয়া মাথায় দিয়ে আসছে। খাটিয়ার অর্ধেকটা জমাট বুনোট, বাকী অর্ধেকটা জালি বুনোট। তাকে দেখে সম্রাট এবং মন্ত্রীদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তালি বাজালেন আকবর। বান্দা কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়াল।

—এক্ষুণি ওই ব্যক্তিকে নিয়ে এস। আর বাকীদের যেমন নির্দিষ্ট স্থানে বসবার ব্যবস্থা হয়েছে তারা সেইভাবেই বসবে।

বান্দা কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেল।

—আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয় তবে ওকে আটকে রেখে বাকীদের মেঠাই খাইয়ে বিদায় করে দেবেন।

একজন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কথা কয়টি বললেন সম্রাট।

এমন সময় বান্দা লোকটিকে নিয়ে এল। ভীত চোখে এসে সে কুর্নিশ জানাল সম্রাটকে।

—তোমার নাম কী?

—গুলসন মেহেতা।

—কোথায় থাক?

—হাসিনা গ্রামে।

—তুমিই গ্রামের প্রধান ?

—জী।

—অর্ধেক ছায়া আর অর্ধেক রোদে শরীর রাখবার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তার জন্য ও ধরণের খাটিয়া ব্যবহারের কৌশল তোমায় কে শিখিয়ে দিল ?

—ও'কে গ্রামের সকলে আমরা 'হাসি খুশী বাবা' বলে ডাকি।

—কেন, তার কি কোন নাম নেই ?

—আছে।

—তবে ?

—সেটা বলতে মানা।

—তোমাকে বলতেই হবে।

—সে পারব না।

—ভাল চাও তো বল—তা নয়তো শূলে চড়াব।

—ওরে বাবা এক্ষুণি বলছি। আজ্ঞে তাঁর নাম বীরবল। তিনি আপনার দরবারের অন্যতম রত্ন।

—হুঁ, ঠিকই অনুমান করেছি। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সম্রাটের মুখ।

—শোন, পাল্কির ব্যবস্থা করছি। তোমাকে নিয়ে আমি নিজে বীরবলকে আনতে যাবো। আর তোমার জন্য বহুত ইনামের ব্যবস্থা করছি। এখন তুমি শ্রান্ত। হাত মুখ ধুয়ে ভোজনালয় বস গিয়ে। তোমার পেটভরে খাবার ব্যবস্থা করছি।

সমাদরে বীরবলকে নিয়ে আসা হল। তাঁর অনুপস্থিতিতে ত'ার পরিবারের কোন অসুবিধা এতটুকুও হয়নি। মাসান্তে সম্রাট ঠিকমত বেতন পাঠিয়ে দিয়েছেন সুনয়নার হাতে। সুনয়না জানত, সম্রাট যেমন বীরবলকে ছেড়ে থাকতে পারেন না, বীরবলও তেমন তাঁর চোখের আড়ালে বেশীদিন থাকতে পারেন না। শুধু রগড় করবার জন্যই আত্মগোপন করে আছেন। হাসিনা গ্রামের এক বিশ্বস্ত মুড়িওয়ালীর মারফৎ বীরবল নিজের খবর সুনয়নাকে পাঠাত।

বীরবলের একান্ত অনুরোধে একমাত্র কন্যা রঞ্জিতা ছাড়া আর কারো কাছে একথা বলেনি সে।

বীরবলকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে সম্রাট সাতদিন ধরে উৎসব অনু-

ষ্ঠানের আয়োজন করলেন। তানসেন এবং অন্যান্য বড় বড় গায়কদের গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সম্রাটের শুকিয়ে যাওয়া চেহারা আবার সতেজ হয়ে উঠল।

এই সময়ে একদিন একটি লোক দরবারে এসে সম্রাটকে কুর্নিশ জানাল।

—কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? প্রশ্ন করলেন সম্রাট।

—সে তখন আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, চীনা এবং ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে দিল।

সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সে নিজেই তখন বুঝিয়ে দিল তার বক্তব্য। সে সব ভাষাতেই পারদর্শী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মাতৃভাষা কোনটি তা সাম্রাটের মন্ত্রী বীরবলকে বলতে হবে। সেটি করতে না পারলে তিনি বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে পারেন না।

বীরবল এতক্ষণ তার নানাধরণের ভাষার ব্যবহার শুনছিলেন। এবার সম্রাটকে কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেল সে। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে বীরবল সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বার হয়ে এলেন এবং বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। বীরবল ফিরে এলেন সভায়।

গভীর রাত। চারিদিক থম্‌থম্ করছে। বীরবলের ঘোড়া শহর ছাড়িয়ে একটা পাকা বাড়ীর সামনে থামল।

—এই সেই বাড়ী। আমি নিজে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাছের ওপর বসে লক্ষ্য করেছি এটি ছাড়া আর কোথাও আস্তানা নেই তার।

—ঠিক আছে, তুই এখানে দাঁড়া। আমি জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছি। তাড়াতাড়ি মুখোস পরে নিলেন বীরবল।

জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন বীরবল। দেখলেন একটি খাটে সে শুয়ে আছে। বীরবল সন্তর্পণে নামলেন ঘরের ভেতর। বেশ নাক ডাকছে।

খুব ভাল করে দেখে নিলেন তিনি। তারপর তৈরী করে আনা পাকানো কাগজ ধীরে ধীরে তার নাকের গর্তে ঢুকিয়ে দিলেন। দিয়েই খাটের তলায় ঢুকে পড়লেন।

লোকটা যেন কি বলে উঠল।

বীরবল এ ভাষার সঙ্গে পরিচিত। শুধু এ ভাষা কেন আরো

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভাষা তাঁর জানা আছে। অথচ লোকটি সভাকে অন্য ভাষা ব্যবহার করেছিল।

আরো দু' মিনিট পর লোকটার আবার নাক ডাকা শুরু হল। বীরবল খাটের তলায় বসে রইলেন। অবশেষে যখন বুঝলেন গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে গেছে সে, তখন সন্তর্পণে বার হয়ে এলেন।

—জাহাঁপনা। আমি এসে গেছি। কুর্নিশ জানাল সেই লোকটি।

—বীরবল তুমি প্রস্তুত? প্রশ্ন করলেন সম্রাট।

—জী। কুর্নিশ জানালেন বীরবল।

—বল তবে? আগ্রহ প্রকাশ পায় সম্রাটের কণ্ঠে।

—হুজুর এই ব্যক্তির মাতৃভাষা গুজরাটি।

দারুণ চমকে উঠল সে। তারপর বলে—

—তুমি কেমন করে জানলে?

—ঠিক বলিনি কি?

—হুঁ। হ্যাঁ সম্পূর্ণ ঠিক। আমি তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা আমার জানা আছে। কিন্তু মাতৃভাষা আমার গুজরাটি। স্বয়ং সম্রাটের সামনে জয়ের মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম। এই বলে নিজের গলার সোনার হারখানি পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। হতভম্ব হলেও আলিঙ্গন করতে ভোলে না সে বীরবলকে।

—এটা কি করে সম্ভব হল! একেবারে ঠিক ঠিক উত্তর দিলে? লোকটি সভাকক্ষ ত্যাগ করে গেলে সম্রাট প্রশ্ন করলেন বীরবলকে।

—মানুষ ঘুমের মধ্যে চমকে উঠলে তার মুখ দিয়ে সাধারণত মাতৃভাষাই বার হয়। এই বলে আগের রাত্রের সব কথাই বললেন।

—ওরে বাবাঃ, তুমি তো সাংঘাতিক! যদি জেগে গিয়ে চোর বলে তোমাকে পেটাত?

—সত্যি যখন চুরি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি তখন আর ভয় কিসের? এ ছাড়া উপযুক্ত ব্যবস্থা, করেই ভেতরে গিয়েছিলাম। হাসতে হাসতে বললেন বীরবল।

—এমন মানুষকে আমি রাগের বশে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলাম? সত্যি বীরবল, আর কিছুদিন তোমায় না দেখতে পেলে পাগল হয়ে যেতাম আমি।

কথাটা শুনে বেশীর ভাগ মানুষ আনন্দে হেসে উঠল। কিন্তু কয়েক জনের মুখ কালো হয়ে গেল।

—সহ্য হয় না। বলল একজন।

—কী? প্রশ্ন করে অপরজন।

—বীরবলকে নিয়ে সম্রাটের এই আদিখ্যেতা।

—ঠিক বলেছিস ভাই। আমারও সেই মত।

নিম্নস্বরে কথা বলার জন্য আর কেউ শুনতে পেল না সে-কথা।

—এস এস বীরবল, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। মিঞা তানসেন অসুস্থ। তাই সান্ধ্য মজলিশ যেন জমছে না।

বীরবল এসে সম্রাটের পাশে বসলেন।

—জান আজ একটা কাণ্ড করেছি।

—সেটা কী জাহাঁপনা?

—দিবানিদ্রা ভঙ্গের পর অলিন্দে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আরব ব্যবসায়ী একটা খুব ভাল জাতের ঘোড়া নিয়ে ফটকের কাছে এল। বান্দার মারফৎ খবর পেলাম ঘোড়াটা সে বিক্রী করতে চায়। আমি নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, সত্যিই ভাল জাতের ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। সে তখন আমাকে বলল, এ ধরণের আরো একশোটা ঘোড়া তার কাছে আছে। আমি যদি তাকে একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দেই তবে আরব থেকে সে ওগুলো নিয়ে আসবে।

—তা আপনি কি করলেন?

—আমি ওর কথামতই কাজ করলাম।

—সেকি! একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছেন?

—হ্যাঁ দিয়েছি, কেন ভুল করেছি?

—তা নয়, তবে নাম ঠিকানা সব টুকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন তো?

—না তো! অবাক হন সম্রাট।

বীরবল একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন: জাহাঁপনা, আমি বেশ কয়েকদিন ধরে দুটো নামের তালিকা তৈরী করছি। প্রথমটিতে জগতের চালাক লোকদের নাম দিচ্ছি, আর দ্বিতীয়টিতে বোকাদের।

—তা আমার নাম কোন তালিকায় দিয়েছ?

—দ্বিতীয়টিতে। বেশ গম্ভীর ভাবে বলেন বীরবল।

—বুঝতে পেরেছি, কেন একথা বলছ। কিন্তু যদি সে সত্যি সত্যি একশো

ঘোড়া নিয়ে আসে তখন কি বলবে তুমি ?

—বলব না কিছুই। শুধু দ্বিতীয় তালিকা থেকে আপনার নাম কেটে ওই স্থানে আরব সওদাগরের নাম বসাব।

বীরবলের কথার ধরণ দেখে শিশুর মত হেসে গড়িয়ে পড়লেন সম্রাট।

—কে এমন করে লোহার শেকলটা নাড়া দিচ্ছে ? সভা ভঙ্গ করে সবে অন্দর মহলের দিকে পা বাড়িয়েছেন সম্রাট, এমন সময় একি বিপত্তি ?

সম্রাটের নির্দেশে বান্দা দেখতে গেল ব্যাপারটা।

—লোহার শেকলটা ভাল মন নিয়েই প্রসাদের চূড়া থেকে ঝুলিয়ে ছিলেন জাহাঁপনা, কিন্তু এর ফলে দেখছি একদম আর বিশ্রাম মিলছে না আপনার। দিনরাত অভিযোগকারীরা অভিযোগ নিয়ে আসছে।

—তাতে কি হয়েছে মানসিংহ ? অসময়ে এলে একটু বিরক্ত লাগে ঠিকই। কিন্তু আমাকেতো ভুলে গেলে চলবে না যে, আমি সমগ্র প্রজাসাধারণের পিতা, তাদের ত্রাণকর্তা। অসুবিধায় পড়ে বলেইতো তারা ছুটে আসে।

—সভা যখন বসে তখন অভিযোগগুলো শুনে তার বিচার করা একরকম, কিন্তু দৈনন্দিন কর্তব্যগুলো যখন করেন তখন অভিযোগগুলো নিয়ে এলে অন্য সমস্ত কাজ কর্ম বানচাল হয়ে যায়।

—সব অভিযোগ দরবারে আনা সম্ভব হয় না সকলের পক্ষে। তারপর এ জন্য অপেক্ষাও করতে হয় তাদের। অথচ ব্যাপারটা আশু জানানো দরকার আমাকে। বুঝতে পারছ মানসিংহ, অনেক চিন্তা ভাবনা করেই এই লোহার শেকল ঝুলিয়ে দিয়েছি।

এমন সময় হাসি হাসি মুখে বান্দা এসে কুর্নিশ জানায়।

—কে অভিযোগ নিয়ে এসেছে ? প্রশ্ন করেন সম্রাট।

—হুজুর কেউ আসেনি। একটা ষাঁড় এক অদ্ভুত কায়দায় মাথা দিয়ে শেকলটা নাড়াচ্ছিল। তাই আওয়াজ হচ্ছিল।

কথাটা শুনে সম্রাটের সঙ্গে বীরবল, ফৈজি, আবুল ফজল, মানসিংহও এক চোট হেসে উঠলেন।

—ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। হাসতে হাসতে বলে বান্দা।

অন্দর মহলে এলেন সম্রাট। বড়ি বেগমসাহেবার বাঁদী সরবত নিয়ে এল। আরেকজন বাতাস করতে লাগল।

—বেগম, অনেকদিন দাবা খেলিনা।

—আজ খেলবেন ? আগ্রহ প্রকাশ পায় বেগমের কণ্ঠে। ঠিক সেই সময়

আবার লোহার শেকল বেজে উঠল। বাঁদী বার হয়ে গেল।

দু'মিনিট পর হাসতে হাসতে ফিরে এল।

—কিরে হাসছিস কেন? প্রশ্ন করেন বেগম।

—প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখলাম একটা ষাঁড়......বলে আবার হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—ষাঁড়! কি বলছিস তুই? প্রশ্ন করেন বেগম।

সম্রাট অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন—ওকে কি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?

—জী। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা লাঠি নিয়ে ছুটে গেছে।

—শোন। বীরবলকে একবার ডেকে পাঠাও। আমার নাম করে বল এক্ষুণি সে যেন চলে আসে।

—কেন জাহাঁপনা? এইতো কিছুক্ষণ আগে সভার কাজ শেষ হল। বেচারার হয়ত নাওয়া-খাওয়া হয়নি। বীরবলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পায় বড়ি বেগমসাহেবার।

—একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে।

—তবে দাবা খেলার কি হবে?

—নাঃ। আজ আর খেলব না।

আবার শেকল বেজে উঠল। এবার স্বয়ং সম্রাট নিজে উঠে গেলেন। দাঁড়ালেন প্রাসাদের অলিন্দে।

—কি আশ্চর্য। আবার এসেছে ষাঁড়টা?

তালি বাজালেন সম্রাট। সঙ্গে সঙ্গে বান্দা হাজির।

—শোন। প্রহরীদের বলে দাও কেউ যেন ওকে না তাড়ায়।

বান্দা অবাক হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে চলে যায়। এর মধ্যে বীরবল হন্তদন্ত হয়ে আসেন।

ষাঁড় কিন্তু ঘন্টা বাজানো থামিয়ে প্রাসাদের অলিন্দের দিকে মুখ করে ডাকতে আরম্ভ করেছে। বীরবল সব শুনলেন।

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ষাঁড়টা কোন অভিযোগ নিয়ে এসেছে। বললেন সম্রাট।

—হ্যাঁ, আমারও সেরকম মনে হচ্ছে। এক্ষুণি ষাঁড়ের মালিককে ধরে আনবার নির্দেশ দিন।

সম্রাটের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে চারজন বান্দা প্রাসাদ থেকে বার হয়ে গেল।

—এই পশুপাখি ঈশ্বরের সৃষ্ট এক আশ্চর্য প্রাণী। এদের অনুভূতি আছে

অথচ কোন ভাষা নেই। বলেন বীরবল।

—এটাই বড় দুঃখের। ওদের ভাষা যদি আমরা বুঝতাম তবে অনেক সমস্যার সমাধানই করতে পারতাম।

ষাঁড় এবার ডাক থামিয়ে দিয়েছে। বীরবলের নির্দেশে তার সামনে ধরা হয়েছে একগাদা খড় বিচালি ইত্যাদি। সে পরম আনন্দে চোখ বুজে খাচ্ছে।

ষাঁড়ের মালিককে ধরে আনা হলে সম্রাট এবং বীরবল নীচে নেমে এলেন।

—বীরবল, এর মালিককে যা জিজ্ঞাসা করবার তুমিই করবে। বললেন সম্রাট।

—জো হুকুম, হুজুর। উত্তর দিলেন বীরবল।

—তোমার নাম কী?

—রহিম।

—এই ষাঁড়টা কী তোমার?

—জী।

—তা একে এভাবে ছেড়ে দিয়েছ কেন?

—জী, একসময় একে খুবই প্রয়োজন হত আমার। কিন্তু এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাই কোন কাজ লাগে না আর। আমি তাই দূর করে দিয়েছি ওকে।

—কেন?

—কাজ করতে পারে না, খাওয়া কেন?

—তা ঠিক, তা ঠিক।

তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন বীরবল।

—তোমার বয়স কত রহিম?

—তা পঞ্চাশ হবে।

—কয়টি ছেলেমেয়ে তোমার?

—চার ছেলে। দুই মেয়েও আছে তাদের সাদি হয়ে গেছে।

—ছেলেরা কি করে?

—ওরা ক্ষেত খামারের কাজে আমাকে সাহায্য করে।

—তোমার রোজগার, কেমন?

—তা আপনাদের আশীর্বাদে তিনটে ধানের ক্ষেত, বাগান, পুকুর সবই আছে আমার।

—বাড়ীতে আর কে কে আছে তোমার?

—আশি বছরের বৃদ্ধ আব্বা, ষাট বছরের দুই আম্মা আর তিন বিবি। আমার নিজের আম্মা আমার জন্মের পরেই মারা গেছেন।

—তা তোমার বাবাও কি ক্ষেত খামারের কাজে তোমায় সাহায্য করেন?

—তোবা, তোবা। তিনি বৃদ্ধ মানুষ, কেমন করে খাটবেন?

—তোমার ষাট বছরের দুই মা নিশ্চয় সংসারের কাজে সাহায্য করেন?

—জী নেহি। একজনের সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। আরেকজন বড় দুর্বল। আর কাজের দরকারই বা কী? কাজের জন্য আমার তিন বিবিই তো আছে।

—তাহলে ওই তিনজনের কাছ থেকে তুমি যখন কোন কাজ পাওনা তখন ওদের তাড়িয়ে দিলেই তো পার? কি দরকার বেকার একগাদা টাকা কড়ি খরচ করার?

—হুজুর, এ আপনি কি বলছেন? ছোটবেলায় গতর দিয়ে খেটে তারা আমাকে আর আমার ভাইবোনদের বড় করে তুলেছিলেন। আজ আমার একটি ভাইও বেঁচে নেই। আমি তাড়িয়ে দিলে তাঁরা যাবেন কোথায়?

—তাহলে ষাঁড়টাকে তাড়ালে কেন?

—বাঃ! আমার আব্বা আর আম্মার সঙ্গে ষাঁড়ের তুলনা করছেন?

—কেন করব না? এ ষাঁড়টা নিশ্চয় একসময় তোমার খুব কাজে লাগত?

—সে কথা কোনমতেই অস্বীকার করব না।

—তাহলে যেহেতু সে পশু সেহেতু তার এই শোচনীয় পরিণাম হবে? তুমি তাকে খেতে দাওনা, তাড়িয়ে দিয়েছ তাই সে আজ অভিযোগ জানাতে এসেছিল। সেজন্য যদি নিজে জানে বাঁচতে চাও তবে ওকে পেটপুরে দু'বেলা খেতে দিতে হবে তোমায়। সাবধান! আর কোনদিনও যেন অভিযোগ জানাতে না আসে ও।

—অভিযোগ জানাতে এসেছিল ও? বিস্মিত হয় রহিম।

—হাঁ। তা নয়তো সব জানলাম কেমন করে? এত স্বচ্ছল অবস্থা তোমার অথচ কতখানি চশমখোর তুমি।

—হুজুর! মাপ করে দিন আমায়। এবার থেকে আর কোনদিনও এমন হবে না। সত্যি, একদিন ওর কাছ থেকে কাজ অনেক পেয়েছি, তার তুলনা নেই। আমি সত্যি খুব অন্যায় করেছি। কাঁদতে কাঁদতে সে একবার

সম্রাটের পায়ে পড়ে, একবার বীরবলের।

—বেশ যাও। ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে কাজ করবে। তুমিও একদিন বৃদ্ধ হবে একথা ভুলো না।

—না হুজুর আর ভুল হবে না।

ষাঁড় নিয়ে চলে গেল সে। আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন সম্রাট। সঙ্গে যোগ দিল অন্যান্য সকলে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বেশ আরো কয়েকটা বছর। আজ বিশেষভাবে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। স্বয়ং সম্রাট নিজের হাতে বীরবলের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ভূষিত করলেন। বীরবলের জয়গানে সমস্ত সভাস্থল মুখরিত উঠল। চিকের আড়ালে বেগমদের সঙ্গে বীরবল পত্নী-সুনয়না ও তাঁর কন্যা ইঙ্গিতার মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—বীরবল! তুমি আমার দরবারের শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাই পরম আনন্দে আমি ইউসুফজাই—বিদ্রোহ-দমন করবার ভার তোমার ওপর দিলাম। পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে যাবে তুমি। আমি জানি, এ অভিযান ব্যর্থ হবে না।

গদগদ স্বরে বলেন সম্রাট।

—সত্যি একজন মানুষের ভেতর কতগুণ থাকতে পারে তা এই বীরবলকে না দেখলে বোঝা যায় না। নুরুন্নিসার কানে কানে কথাটি বললেন বড়ি বেগমসাহেবা।

—সত্যি তাই! যেমন দক্ষ প্রশাসক ইনি তেমন দক্ষ বিদূষক। বললেন নুরুন্নিসা।

—সেকি! শুধু এটুকুই বলছিস? তিনি যে কবি সে কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন? আর কত বড় একজন যোদ্ধা অনুমান করতে পারছিস না?

—পারছি। তা নয়তো সম্রাট এই বিদ্রোহ দমনের ভার তাঁর ওপর দেবেন কেন? বড়ি বেগমসাহেবার কথার উত্তর দেন নুরুন্নিসা।

সেজন্যই তো সম্রাট নিজমুখে সর্বসমক্ষে তাঁকে তাঁর সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলে স্বীকার করে নিলেন। খুশীতে ঝলমল করে বেগমসাহেবার মুখখানি।

—এতে কিন্তু সকলেই খুব খুশী। এমন একজন মানুষ যাঁর জনপ্রিয়তার তুলনা নেই। সকলেই ভালবাসেন তাঁকে। তিনি যে

সকলের স্নেহভালবাসা আদায় করে নিতে জানেন। বড়ি বেগমের কথায় অন্তরের সায় প্রকাশ পায় নুরুন্নিসা বেগমের কণ্ঠে।

—শত্রু অবশ্য নেই যে এঁর তা নয়। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে যাঁর জন্ম তাঁর কাছে কেন দাঁড়াতে পারবে তারা? বলেন বড়ি বেগমসাহেবা।

এ কথায় একটু লজ্জা পায় নুরুন্নিসা বেগম। তাই এর জন্য তিনি নিজেও তো বীরবলের পেছনে কম লাগেননি!

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর ঈশ্বর করেন আরেক। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বীরবলের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাল।

সংবাদটা শোনামাত্র সম্রাট জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সমগ্র রাজ্যের লোক কেঁদে উঠল। শোকে থম্‌থম্‌ করতে লাগল চারিদিক...। অবশ্য আফগানিস্তানের এ অভিযোগ ব্যর্থ হয়নি। সম্রাটের আয়ত্তে এসেছিল বিদ্রোহী রাজা। কিন্তু মনে প্রাণে ভেঙ্গে পড়লেন সম্রাট।

—সম্রাট যদি অভয় দেন, একটা কথা বলি।

যমুনার তীরে বসে থাকা সম্রাটের পাশে এসে বসলেন। মানসিংহ। পেছনে এসে বসলেন ফৈজি ও আবুল ফজল। উদাস নয়নে সম্রাট আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। জয়ী হয়েছেন সম্রাট, তবুও রাজপুরীতে কোন আনন্দ উৎসব নেই। সান্ধ্য মজলিশেরও নেই আয়োজন। ভগ্নমনা সম্রাটকে না শান্তি করতে পারছেন তাঁর বেগমেরা, না পারছেন তাঁর দরবারী অগণ্য রত্নগুলি।

—সম্রাট একটা কথা বলব?

—বল। উদাস ভাবে উত্তর দেন সম্রাট।

—কিছু সংখ্যক প্রজার ধারণা বীরবলের এ মৃত্যুর জন্য দায়ী ওই বিরাট দলেরই মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন।

—সেকি! যুদ্ধক্ষেত্রেই তো তার মৃত্যু ঘটেছে?

—তা ঘটেছে। কিন্তু কয়েকজন সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এ ঘটেছে। নইলে এ ভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটত না।

—এ কথা জেনেও তুমি চুপ করে আছ মানসিংহ?

—এটা জনশ্রুতি। এর সত্যতা কেমন করে যাচাই করব মালিক?

চুপ করে রইলেন সম্রাট। তারপর বললেন—জীবনের সব বাসনা ফুরিয়ে গেছে আমার। আমি নিজেও বৃদ্ধ হয়েছি, ইহলোকের সাধ

আমার মিটেছে। জানি না, কবে ডাক আসবে আমার ?

চুপ করে রইলেন সকলে। সকলেরই মুখ বেদনায় বিধুর।

—যে মানুষটা চিরদিন মানুষের আপদে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যার কাছে মানুষ জটিল সমস্যার সমাধানে জন্য বার বার ছুটে গেছে তারও যে শত্রু থাকতে পারে ভাবতে পারি না। নেমকহারাম দুনিয়া। দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন সম্রাট।

—জাহাঁপনা! শত্রু থাকতে পারে বলে কেন এত বিস্ময় প্রকাশ করছেন? আপনি নিজে বহুবার প্রমাণ পেয়েছেন বীরবলকে কতবার অপদস্ত করতে, এমনকি তাঁকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে ফেলবারও চেষ্টা করেছে তারা। কিন্তু বারবার বুদ্ধির কৌশলে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। বল্‌লেন আবুল ফজল।

—হ্যাঁ সে কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু যারা শত্রুতাচারণ করেছিল সকলেই নতি স্বীকার করেছে তাঁর কাছে. সে প্রমাণও ত সকলেই পেয়েছেন? তাই ধারণা ছিল জনপ্রিয়তার এত শীর্ষে যার অবস্থান তার প্রতি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। মনে হয় 'রাজা' উপাধি দিয়ে এত বড় সেনাদলের ভার অর্পণ করাতেই নূতন করে মানুষের মনে ঈর্ষা জেগে ছিল।

—শান্ত হোন জাহাঁপনা। বল্‌লেন ফৈজি।

—কি করে শান্ত হব আপনি বলুন? আমি লেখাপড়া জানি না। বীরবল কত বড় একজন কবি ছিলেন। কত সময় কত কবিতা আবৃত্তি শুনিয়েছে আমায়। তাই একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম—তোমার বিচ্ছেদে আমার মধ্যে যে বেদনারস জমবে তার ফলে আমি একটা কবিতাই লিখে ফেলতে পারব। কিন্তু কোথায় পারছি? গুণের পূজারী আমি, কিন্তু আমার মধ্যে গুণ কোথায়? সাধ জাগে বীরবলকে উদ্দেশ্য করে লিখি—বীরবল, তুমি অসহায়রে কোন ক্ষতি করোনি কখনো, তোমার যা ছিল সবই দিয়ে দিয়েছ তাদের, কিন্তু আজ আমার মত অসহায়কে কি দিয়ে শান্ত করবে তুমি? কিন্তু আমার লেখার ক্ষমতা নেই। অব্যক্ত বেদনা শুধু জীবনভোর বয়ে বেড়াবো।

কান্না জড়িত স্বর আকবরের।

—আমাকে আজ রাতটা সময় দিন। আগামী কালই আমি আপনার মনের ব্যথাকে ভাষায় রূপ দেব।

ধীরে ধীরে কথা কয়টি বলেন ফৈজি।

হ্যাঁ সত্যি-সত্যি ফৈজি তারপর দিন সম্রাটের হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা রাশি রূপ দিয়েছিলেন ভাষায়। তিনি লিখেছিলেন —

"বীরবল তুমি দুখীর বন্ধু,
দিয়েছ তাদের যা কিছু তোমার
উজাড় করে,
আমি তো এখন অসহায় সখা,
তবু উদাসীন, কিছু তো রাখোনি
আমার তরে।"